রাজনীতিতে জামায়াতে ইসলামী

এ. কে. এম. নাজির আহমদ

www.pathagar.com

www.pathagar.com

রাজনীতিতে
জামায়াতে ইসলামী

এ.কে.এম. নাজির আহমদ

দি ইনডিপেনডেন্ট স্টাডি ফোরাম
ঢাকা

www.pathagar.com

প্রকাশক
আবুল আসাদ
চেয়ারম্যান, দি ইনডিপেনডেন্ট স্টাডি ফোরাম
৭৮ আউটার সার্কুলার রোড
মগবাজার, ঢাকা-১২১৭।

গ্রন্থস্বত্ব : লেখকের
প্রথম প্রকাশ : জুন, ২০১৩

মুদ্রণ ঃ
আল-ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস
৪২৩ এলিফ্যান্ট রোড, বড়মগবাজার
ঢাকা-১২১৭।

বিনিময় : একশত টাকা

Rajnitite Jamaate Islami : Written by AKM Nazir Ahmad and Published by Abul Asad Chairman The Independent Study Forum 78 Outer Circular Road Moghbazar Dhaka-1217 First Edition June 2013 Price Taka 100.00 only.

www.pathagar.com

প্রারম্ভিক কথা

জামায়াতে ইসলামীর রয়েছে একটি দীর্ঘ ও সমৃদ্ধ ইতিহাস। অনেক চড়াই উতরাই পেরিয়ে জামায়াতে ইসলামী বর্তমান মানযিলে এসে পৌঁছেছে। বহুসংখ্যক ব্যক্তির মেধা, শ্রম, সময় ও অর্থ নিয়োজিত হয়েছে এর গতিময়তা নিশ্চিত করার প্রয়োজনে। একগুচ্ছ সুন্দর মানুষকে প্রাণ দিতে হয়েছে এর পতাকা সমুন্নত রাখার জন্য। আহত হয়েছে বহুসংখ্যক মানুষ।

ইসলামের আইনী ও রাজনৈতিক ভূমিকারবিরোধী সরকার এবং অনুরূপ রাজনৈতিক দলগুলোর চক্ষুশূল জামায়াতে ইসলামী। ফলে জামায়াতে ইসলামী হামলা, মামলা ও অপবাদের শিকার হয়েছে। কিন্তু এতোসব করেও ইসলামের এই বিরোধীরা সত্যের আলোকে নিভিয়ে দিতে পারেনি।

ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ও সৌন্দর্য দেশের গণমানুষের সামনে তুলে ধরার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে দলটি। রাজনৈতিক অংগনে একটি ব্যতিক্রম এবং সুস্থ ও সুন্দর ধারা সৃষ্টির প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে জামায়াতে ইসলামী।

দীর্ঘ পথ-পরিক্রমায় বহুবিধ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্পাদন করেছে এই সংগঠন। এই বইটিতে জামায়াতে ইসলামীর বিপুল রাজনৈতিক কাজের একটি সংক্ষিপ্তচিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। আশা করি, সম্মানিত পাঠকবৃন্দ এই সংক্ষিপ্তচিত্রে তাঁদের চিন্তার প্রয়োজনীয় উপকরণ খুঁজে পাবেন।

আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন আমাদের সহায় হোন!

এ.কে.এম. নাজির আহমদ

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সূচিপত্র

- ❐ জামায়াতে ইসলামী গঠন ॥ ১১
- ❐ জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান ও জামায়াতে ইসলামী হিন্দ ॥ ১২
- ❐ ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের সূচনা ॥ ১২
- ❐ 'ইসলামী শাসনতন্ত্রের ২২ দফা মূলনীতি' প্রণয়ন ॥ ১৩
- ❐ কাদিয়ানীদেরকে অমুসলিম ঘোষণার আন্দোলন ॥ ১৫
- ❐ ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের গতি বৃদ্ধি ॥ ১৬
- ❐ জনগণের ভোটাধিকার পুনর্বহাল দাবিতে আন্দোলন ॥ ১৭
- ❐ 'কম্বাইন্ড অপোজিশন পার্টিজ'-এর শরীক দল হিসেবে ভূমিকা পালন ॥ ১৯
- ❐ যুদ্ধকালে জাতীয় ঐক্যের ডাকে সাড়াদান ॥ ২০
- ❐ 'পাকিস্তান ডিমোক্রেটিক মুভমেন্ট'-এর শরীক দল হিসেবে ভূমিকা পালন ॥ ২১
- ❐ 'ডিমোক্রেটিক এ্যাকশন কমিটি'-র শরীক দল হিসেবে ভূমিকা পালন ॥ ২৫
- ❐ প্রেসিডেন্ট আইউব খান কর্তৃক আহূত জাতীয় সংলাপে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন ॥ ২৭
- ❐ আবার সামরিক শাসন ও জাতীয় নির্বাচন ॥ ৩০
- ❐ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান ও স্থগিতকরণ ॥ ৩৩
- ❐ প্রেসিডেন্ট ইয়াহইয়া খান ও শেখ মুজিবুর রহমান সংলাপ ॥ ৪৪
- ❐ ১৯৭১ সনের ২৫শে মার্চের আর্মি এ্যাকশন ॥ ৫১
- ❐ ভারতের পার্লামেন্টে প্রস্তাব গ্রহণ ॥ ৫৩
- ❐ মুক্তিযুদ্ধের সূচনা ॥ ৫৫
  - (ক) মুক্তিবাহিনী গঠন ॥ ৫৬
  - (খ) মুজিববাহিনী গঠন ॥ ৬০
  - (গ) প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার গঠন ॥ ৬০
- ❐ কাদেরিয়া বাহিনী গঠন ॥ ৬১
- ❐ পাকিস্তানের অখণ্ডতায় বিশ্বাসী ব্যক্তিদের উভয় সংকট ॥ ৬১
- ❐ 'শান্তি কমিটি' গঠন ॥ ৬৩

www.pathagar.com

- ❐ 'রেযাকার বাহিনী' গঠন ॥ ৬৬
- ❐ ভারত-সোভিয়েত ইউনিয়ন মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষর ॥ ৬৯
- ❐ পূর্ব পাকিস্তানে বেসামরিক সরকার গঠন ॥ ৭০
- ❐ ভারতের সাথে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর ॥ ৭১
- ❐ পাকিস্তানের অখণ্ডতায় বিশ্বাসী ব্যক্তিদের ভারতভীতির কারণ ॥ ৭৩
  (ক) কংগ্রেস কর্তৃক পাকিস্তান সৃষ্টির বিরোধিতার স্মৃতি ॥ ৭৩
  (খ) ভারত কর্তৃক জম্মু-কাশমির দখল করে নেওয়ার স্মৃতি ॥ ৭৫
  (গ) ভারত কর্তৃক হায়দারাবাদ দখল করে নেওয়ার স্মৃতি ॥ ৭৬
- ❐ প্রেসিডেন্ট ইয়াহইয়া খানের সাথে অধ্যাপক গোলাম আযমের সাক্ষাত ॥ ৭৭
- ❐ মুক্তিযুদ্ধের অগ্রগতি ॥ ৭৮
- ❐ লে. জেনারেল আমীর আবদুল্লাহ খান নিয়াজীর আত্মসমর্পণ ॥ ৭৯
- ❐ প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের ঢাকা আগমন ॥ ৮১
- ❐ পাকিস্তানের অখণ্ডতায় বিশ্বাসী ব্যক্তিদের ওপর নিপীড়ন ॥ ৮১
- ❐ শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ॥ ৮২
- ❐ মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে গণহত্যা ও ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণের জন্য তদন্ত কমিটি গঠন ॥ ৮৩
- ❐ শেখ মুজিবুর রহমানের একটি বড়ো কৃতিত্ব ॥ ৮৭
- ❐ 'জাতীয় রক্ষী বাহিনী' গঠন ॥ ৮৮
- ❐ বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন ॥ ৮৯
- ❐ দালাল আইনে অভিযুক্তদের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন ॥ ৯২
- ❐ ১৯৭৩ সনের ৭ই মার্চ অনুষ্ঠিত প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামীর অনুপস্থিতি ॥ ৯৪
- ❐ ৯৩ হাজার যুদ্ধবন্দির প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন ॥ ৯৫
- ❐ আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইবুনাল) আইন প্রণয়ন ॥ ৯৫
- ❐ ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনে শেখ মুজিবুর রহমান ॥ ৯৫
- ❐ অভিযুক্ত ১৯৫ জন যুদ্ধাপরাধীর প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন ॥ ৯৬
- ❐ একদলীয় শাসন প্রবর্তন ॥ ৯৬
- ❐ শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনাবসান ॥ ৯৮
- ❐ ১৯৭৫ সনের নবেম্বর বিপ্লব ॥ ১০১
- ❐ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে সিরাতুন্নবী সম্মেলন ॥ ১০৪

www.pathagar.com

- ধর্মভিত্তিক রাজনীতির ওপর আরোপিত বিধিনিষেধ প্রত্যাহার ॥ ১০৫
- রাষ্ট্রপতি হন জিয়াউর রহমান ॥ ১০৫
- ১৯৭৭ সনের গণভোট ॥ ১০৫
- ১৯৭৮ সনের রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ॥ ১০৬
- একদলীয় শাসন ব্যবস্থার বিলুপ্তি সাধন ॥ ১০৬
- 'ইসলামিক ডিমোক্রেটিক লীগ' গঠন ॥ ১০৬
- ১৯৭৯ সনের ১৮ই ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ ॥ ১০৭
- জাতীয় সংসদ কর্তৃক সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী গ্রহণ ॥ ১০৮
- জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ ॥ ১০৮
- 'কেয়ারটেকার সরকারের রূপরেখা' প্রণয়ন ॥ ১১১
- ইসলামী বিপ্লবের ৭ দফা গণ দাবি ॥ ১১২
- ১৯৮১ সনের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন ॥ ১১৪
- সেনাপতির রাজনীতির বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ ॥ ১১৫
- গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে যুগপৎ আন্দোলন ॥ ১১৮
- হুসেইন মুহাম্মাদ এরশাদ কর্তৃক রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ ॥ ১১৯
- জেনারেল (অব.) মুহাম্মাদ আতাউল গনী ওসমানীর মৃত্যু ॥ ১১৯
- রাষ্ট্রপতি এরশাদের সাথে বিরোধী দলগুলোর সংলাপ ॥ ১২০
- রাষ্ট্রপতি এরশাদের গণভোট বর্জন ॥ ১২২
- উপজিলা চেয়ারম্যান নির্বাচন বয়কট ॥ ১২২
- সাউথ এশিয়ান এসোসিয়েশন ফর রিজিওনাল কো-অপারেশন গঠন ॥ ১২২
- ১৯৮৬ সনের ৭ই মে অনুষ্ঠিত তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ ॥ ১২৩
- ১৯৮৬ সনের রাষ্ট্রপতি নির্বাচন বর্জন ॥ ১২৪
- ১৯৮৭ সনের ৩রা ডিসেম্বর ১০ জন সংসদ সদস্যের পদত্যাগ ॥ ১২৫
- ১৯৮৮ সনের ৩রা মার্চ অনুষ্ঠিত চতুর্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচন বর্জন ॥ ১২৬
- কেয়ারটেকার সরকারের দাবিতে আবার যুগপৎ আন্দোলন ॥ ১২৭
- ১৯৯১ সনের ২৭শে ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠিত পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ ॥ ১২৮
- ১৯৯১ সনে সরকার গঠনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলকে সহযোগিতা প্রদান ॥ ১৩০
- সংসদীয় পদ্ধতিতে প্রত্যাবর্তনে ভূমিকা পালন ॥ ১৩২

www.pathagar.com

- সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা নিজামীর ওপর সন্ত্রাসী হামলা ॥ ১৩৩
- জাতীয় সংসদ কর্তৃক সংবিধানের একাদশ ও দ্বাদশ সংশোধনী গ্রহণ ॥ ১৩৪
- ১৯৯১ সনের ৮ই অকটোবর প্রেসিডেন্ট নির্বাচন ॥ ১৩৫
- আমীরে জামায়াত অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিকত্ব মামলা ॥ ১৩৬
- লালদিঘি ময়দানে জামায়াতে ইসলামীর জনসভা ॥ ১৪৬
- ১৯৯৬ সনের ১৫ই ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচন বর্জন ॥ ১৪৮
- ১৯৯৬ সনের ১২ জুন অনুষ্ঠিত সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ ॥ ১৪৯
- গ্যারান্টি ক্লজবিহীন ফারাক্কা চুক্তির প্রতিবাদ ॥ ১৫১
- ১৭ দফা দাবি নিয়ে আন্দোলন ॥ ১৫৪
- জাতিসংঘের ইসলামবিরোধী প্রস্তাবে সরকারের স্বাক্ষরদানের প্রতিবাদ ॥ ১৫৭
- ১৯৯৭ সনের ২রা ডিসেম্বর স্বাক্ষরিত তথাকথিত 'শান্তি চুক্তি'র প্রতিবাদ ॥ ১৫৭
- চারদলীয় জোটের অংশীদার রূপে ভূমিকা পালন ॥ ১৬৩
- মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী আমীরে জামায়াত নির্বাচিত হন ॥ ১৬৮
- ২০০১ সনের ১লা অকটোবর অনুষ্ঠিত অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ ॥ ১৬৯
- বাংলাদেশ সংখ্যালঘু সমিতির অভিনন্দন ॥ ১৭১
- পল্টন ময়দানে জামায়াতে ইসলামী আয়োজিত 'জাতীয় উলামা সম্মেলন' ॥ ১৭২
- আওয়ামী লীগের অপরাজনীতির কারণে অনিশ্চিত হয়ে পড়ে নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ॥ ১৭৪
- অসাংবিধানিক কেয়ারটেকার সরকার ॥ ১৭৯
- নতুন নির্বাচন কমিশন গঠন ॥ ১৮১
- 'মাইনাস টু ফর্মুলা' বাস্তবায়ন প্রয়াস ॥ ১৮১
- রাজনীতিবিদ গ্রেফতার অভিযান ॥ ১৮৫
- ২০০৮ সনে জামায়াতে ইসলামীর গণস্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযান ॥ ১৮৫
- অভিযুক্ত রাজনীতিবিদগণ আইনী লড়াই শুরু করেন ॥ ১৮৮
- রাজনৈতিক দল সংস্কার প্রয়াস ॥ ১৮৯
- জামায়াতে ইসলামীর নিবন্ধন ঠেকাবার অপপ্রয়াস ॥ ১৮৯
- প্রশ্নবিদ্ধ নির্বাচন কমিশন ॥ ১৯২
- ২০০৮ সনের ২৯শে ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ ॥ ১৯৩

www.pathagar.com

রাজনীতিতে জামায়াতে ইসলামী

জামায়াতে ইসলামী নিছক একটি রাজনৈতিক দল নয়। এটি কেবল সামাজিক ও সমাজ সেবামূলক প্রতিষ্ঠানও নয়। এটি একটি পূর্ণাংগ ইসলামী আন্দোলন। ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রকে আলকুরআন ও আস্‌সুন্নাহর আলোকে গড়ে তোলার জন্য চার দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে কাজ করছে জামায়াতে ইসলামী। এই চার দফা কর্মসূচীর সর্বশেষ তথা চতুর্থ দফাটিই কেবল রাজনৈতিক। চার দফার কাজ যুগপৎ এগিয়ে নেওয়ার জন্যই অন্য তিনটি দফার সাথে জামায়াতে ইসলামী রাজনৈতিক ময়দানেও সাধ্যমত ভূমিকা পালন করে এসেছে। এই লেখাটিতে সামগ্রিক কর্মকাণ্ড নয়, শুধু রাজনীতির ক্ষেত্রে জামায়াতে ইসলামী যেই দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করেছে তারই সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরা হলো। প্রেক্ষাপট বুঝার প্রয়োজনে আনুসঙ্গিক কিছু তথ্যও সন্নিবেশিত করা হলো।

জামায়াতে ইসলামী গঠন

১৯৪১ সনের ২৬শে অগাস্ট বৃটিশশাসিত দক্ষিণ এশিয়া উপমহাদেশের লাহোর সিটিতে গঠিত হয় জামায়াতে ইসলামী। প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন ৭৫ জন। সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী আমীরে জামায়াত নির্বাচিত হন।

প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণের একাংশে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী বলেন,

> 'জামায়াতে ইসলামীতে যাঁরা যোগদান করবেন তাঁদেরকে এই কথা ভালোভাবে বুঝে নিতে হবে যে, জামায়াতে ইসলামীর সামনে যেই কাজ রয়েছে তা কোন সাধারণ কাজ নয়। দুনিয়ার গোটা ব্যবস্থা তাঁদেরকে পাল্টে দিতে হবে। দুনিয়ার নীতিনৈতিকতা, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, সভ্যতা-সংস্কৃতি– সবকিছু পরিবর্তন করে দিতে হবে। দুনিয়ায়

www.pathagar.com

আল্লাহদ্রোহিতার ওপর যেই ব্যবস্থা কায়েম রয়েছে তা পরিবর্তন করে আল্লাহর আনুগত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।'[১]

জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান ও জামায়াতে ইসলামী হিন্দ

১৯৪৭ সনের ১৪ ও ১৫ই অগাস্টের মধ্যবর্তী রাতে দিল্লীতে বসে বৃটিশশাসিত দক্ষিণ এশিয়া উপমহাদেশের সর্বশেষ ভাইসরয় লর্ড লুই মাউন্টব্যাটেন পাকিস্তান ও ভারতের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। তখন গোটা উপমহাদেশে জামায়াতে ইসলামীর সদস্য সংখ্যা ছিলো ৬২৫ জন। দেশ ভাগ হলে জামায়াতে ইসলামীও ভাগ হয়। মোট ২৪০ জন সদস্য নিয়ে জামায়াতে ইসলামী হিন্দ এবং ৩৮৫ জন সদস্য নিয়ে জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান কাজ শুরু করে।

ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের সূচনা

পাকিস্তান আন্দোলনের সময় মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দ ওয়াদা করেছিলেন যে একটি স্বাধীন দেশ হাতে পেলে তাঁরা দেশটিকে একটি ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করবেন। পাকিস্তান অর্জিত হওয়ার পর তাঁরা সেইসব কথা বেমালুম ভুলে যান। শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করতে গিয়ে তাঁরা আলোচনা শুরু করেন পাকিস্তানের জন্য বৃটিশ পার্লামেন্টারি সিস্টেম উপযোগী, না আমেরিকান প্রেসিডেনশ্যাল সিস্টেম, তা নিয়ে।

১৯৪৮ সনের এপ্রিল মাসে করাচির জাহাংগীর পার্কে জামায়াতে ইসলামীর প্রথম রাজনৈতিক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান বক্তা ছিলেন জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী। তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক-নির্দেশনামূলক বক্তব্য পেশ করেন। বক্তব্যে তিনি পাকিস্তানের জন্য শাসনতন্ত্র প্রণয়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত গণপরিষদের প্রতি চারটি দফার ভিত্তিতে 'আদর্শ প্রস্তাব' (Objectives Resolution) গ্রহণ করার উদাত্ত আহ্বান জানান।

---

১. আব্বাস আলী খান, জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাস, পৃষ্ঠা-৮৭।

www.pathagar.com

দফাগুলো হচ্ছে–

- ❑ সার্বভৌমত্ব আল্লাহর।
  সরকার আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে দেশ শাসন করবে।
- ❑ ইসলামী শারীয়াহ হবে দেশের মৌলিক আইন।
- ❑ ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক আইনগুলো ক্রমান্বয়ে পরিবর্তিত করে ইসলামের সাথে সংগতিশীল করা হবে।
- ❑ ক্ষমতা প্রয়োগ করতে গিয়ে রাষ্ট্র কোন অবস্থাতেই শারীয়াহর সীমা লংঘন করবে না।[২]

  এইভাবে জামায়াতে ইসলামী ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন শুরু করে।

'ইসলামী শাসনতন্ত্রের ২২ দফা মূলনীতি' প্রণয়ন

১৯৪৮ সনের ১১ই সেপ্টেম্বর পাকিস্তানের স্থপতি মি. মুহাম্মাদ আলী জিন্নাহ মৃত্যুবরণ করেন। গভর্ণর জেনারেল হন ঢাকার নওয়াব পরিবারের সন্তান খাজা নাজিমুদ্দিন। প্রধানমন্ত্রী পদে বহাল থাকেন লিয়াকত আলী খান। লিয়াকত আলী খান সরকার ১৯৪৮ সনের ৪ঠা অকটোবর ইসলামী শাসনতন্ত্রের অন্যতম বলিষ্ঠ কণ্ঠ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীকে নিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার করে। প্রায় ২০ মাস জেলে রাখার পর ১৯৫০ সনের ২৮শে মে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়।

১৯৫০ সনের শেষের দিকে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেন যে দেশের আলিম সমাজ যদি সর্বসম্মতভাবে কোন শাসনতান্ত্রিক প্রস্তাব উপস্থাপন করে, গণপরিষদ তা বিবেচনা করে দেখবে।

প্রধানমন্ত্রী আস্থাশীল ছিলেন যে বহুধাবিভক্ত আলিম সমাজ এই জটিল বিষয়ে কখনো একমত হতে পারবে না এবং কোন সর্বসম্মত প্রস্তাবও পেশ করতে পারবে না।

---

২. প্রফেসর মাসুদুল হাসান, মাওলানা মওদূদী এন্ড হিজ থট, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৫২।

www.pathagar.com

১৯৫১ সনের জানুয়ারি মাসে জামায়াতে ইসলামীর উদ্যোগে করাচিতে সারা দেশের সকল মত ও পথের ৩১ জন শীর্ষ আলিম একটি গুরুত্বপূর্ণ মিটিংয়ে একত্রিত হন। সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ সাইয়েদ সুলাইমান নদবী। সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী একটি খসড়া পেশ করেন। আলাপ-আলোচনার পর চূড়ান্ত হয় একটি মূল্যবান দলীল– "ইসলামী শাসনতন্ত্রের ২২ দফা মূলনীতি।"

দফাগুলো ছিলো নিম্নরূপ ঃ

১. দেশের সার্বভৌমত্বের মালিক আল্লাহ।
২. দেশের আইন আলকুরআন ও আস্‌সুন্নাহর ভিত্তিতে রচিত হবে।
৩. রাষ্ট্র ইসলামী আদর্শ ও নীতিমালার উপর সংস্থাপিত হবে।
৪. রাষ্ট্র মা'রুফ প্রতিষ্ঠা করবে এবং মুনকার উচ্ছেদ করবে।
৫. রাষ্ট্র মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর সাথে ভ্রাতৃত্ব ও ঐক্য সম্পর্ক মজবুত করবে।
৬. রাষ্ট্র সকল নাগরিকের মৌলিক প্রয়োজন পূরণের গ্যারান্টি দেবে।
৭. রাষ্ট্র শারীয়াহর নিরিখে নাগরিকদের সকল অধিকার নিশ্চিত করবে।
৮. আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়ে কাউকে শাস্তি দেওয়া যাবে না।
৯. স্বীকৃত মাযহাবগুলো আইনের আওতায় পরিপূর্ণ দীনী স্বাধীনতা ভোগ করবে।
১০. অমুসলিম নাগরিকগণ আইনের আওতায় পার্সোনাল ল' সংরক্ষণ ও পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করবে।
১১. রাষ্ট্র শারীয়াহ কর্তৃক নির্ধারিত অমুসলিমদের অধিকারগুলো নিশ্চিত করবে।
১২. রাষ্ট্রপ্রধান হবেন একজন মুসলিম পুরুষ।
১৩. রাষ্ট্রপ্রধানের হাতে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব অর্পিত হবে।
১৪. রাষ্ট্রপ্রধানকে পরামর্শ প্রদানের জন্য একটি মাজলিসে শূরা থাকবে।
১৫. রাষ্ট্রপ্রধান দেশের শাসনতন্ত্র সাসপেন্ড করতে পারবেন না।
১৬. সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে রাষ্ট্রপ্রধানকে পদচ্যুত করা যাবে।

www.pathagar.com

১৭. রাষ্ট্রপ্রধান তাঁর কাজের জন্য মাজলিসে শূরার নিকট দায়ী থাকবেন এবং তিনি আইনের ঊর্ধ্বে হবেন না।
১৮. বিচার বিভাগ নির্বাহী বিভাগ থেকে স্বাধীন হবে।
১৯. সরকারী ও প্রাইভেট সকল নাগরিক একই আইনের অধীন হবে।
২০. ইসলামবিরোধী মতবাদের প্রচারণা নিষিদ্ধ হবে।
২১. দেশের বিভিন্ন অঞ্চল একই দেশের বিভিন্ন প্রশাসনিক ইউনিট বলে গণ্য হবে।
২২. আলকুরআন ও আস্‌সুন্নাহর পরিপন্থী শাসনতন্ত্রের যেই কোন ব্যাখ্যা বাতিল বলে গণ্য হবে।[৩]

এই নীতিমালা বিপুল সংখ্যায় মুদ্রণ করে সারা দেশে ছড়ানো হয়। এর পক্ষে জনমত সৃষ্টির জন্য সারা দেশে বহুসংখ্যক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। ইসলামী শাসনতন্ত্রের পক্ষে প্রবল জনমত সৃষ্টি হতে থাকে।

কাদিয়ানীদেরকে অমুসলিম ঘোষণার আন্দোলন

ইতোমধ্যে কাদিয়ানী ইস্যুটি সামনে আসে। ১৯৫৩ সনের জানুয়ারি মাসে জামায়াতে ইসলামী, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম, মাজলিসে আহরার, জমিয়তে আহলে হাদীস, মুসলিম লীগ, আনজুমানে তাহাফ্‌ফুযে হুকুকে শিয়া প্রভৃতি দল করাচিতে একটি সম্মেলনে মিলিত হয়। জামায়াতে ইসলামী প্রস্তাব করে যে কাদিয়ানী ইস্যুটিকে ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত করে নেওয়া হোক। সেই সম্মেলনে এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হলো না।

চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য ফেব্রুয়ারি মাসে করাচিতে সর্বদলীয় নির্বাহী পরিষদের মিটিং ডাকা হয়। এই মিটিংয়ে সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে 'ডাইরেক্ট এ্যাকশনের' পক্ষে প্রবল মত প্রকাশ পায়। জামায়াতে ইসলামী গোড়া থেকেই শান্তিপূর্ণ ও নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে বিশ্বাসী ছিলো বিধায় 'ডাইরেক্ট এ্যাকশনের' সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে সর্বদলীয় নির্বাহী পরিষদ থেকে বেরিয়ে আসে।

---

৩. প্রফেসর মাসুদুল হাসান, মাওলানা মওদূদী এন্ড হিজ থট, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪২৫।

www.pathagar.com

ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের গতি বৃদ্ধি

১৯৫৩ সনের মার্চ মাসে কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে কতিপয় দলের ডাইরেক্ট এ্যাকশনের ফলে আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটে। এই অবনতি পাঞ্জাবেই ঘটেছিলো বেশি। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য মার্শাল ল' ঘোষণা করা হয়। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এসে যায়।

বিস্ময়ের ব্যাপার, উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপিয়ে ১৯৫৩ সনের ২৮শে মার্চ মার্শাল ল' কর্তৃপক্ষ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী ও আরো কয়েকজন শীর্ষ নেতাকে গ্রেফতার করে। আরো বিস্ময়ের ব্যাপার, সামরিক ট্রাইব্যুনাল ১৯৫৩ সনের ৮ই মে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীকে ফাঁসির হুকুম দেয়। জামায়াতে ইসলামীর জনশক্তি এবং সকল শ্রেণীর ইসলামী ব্যক্তিত্ব এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে নিয়মতান্ত্রিক ও বলিষ্ঠ আন্দোলনে নেমে পড়ে। ফলে সরকার মৃত্যুদণ্ড রহিত করে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর চৌদ্দ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের কথা ঘোষণা করে।

তবে দুই বছর একমাস জেলে থাকার পর ১৯৫৫ সনের ২৯শে এপ্রিল সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী মুক্তি লাভ করেন।

তাঁকে মেরে ফেলার চক্রান্তের আসল লক্ষ্য ছিলো ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের বলিষ্ঠতম কণ্ঠটিকে স্তব্ধ করে দেওয়া। কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের ইচ্ছা ছিলো ভিন্ন।
তিনি মুক্তি পান।

আর ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন বহুগুণ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। গণদাবির মুখে গণপরিষদ ১৯৫৬ সনের ২৯শে ফেব্রুয়ারি একটি শাসনতন্ত্র পাস করে।

পুরোপুরি ইসলামী না হলেও ১৯৫৬ সনের শাসনতন্ত্রে ইসলামের যথেষ্ট প্রতিফলন ছিলো। ঐ বছরের ২৩শে মার্চ পাকিস্তানের তৃতীয় গভর্ণর জেনারেল মালিক গোলাম মুহাম্মাদকে অব্যাহতি দিয়ে প্রণীত শাসনতন্ত্রের ভিত্তিতে ইসলামিক রিপাবলিক অব পাকিস্তানের প্রথম প্রেসিডেন্ট বানানো হয় মেজর জেনারেল ইস্‌কানদার আলী মির্যাকে।

www.pathagar.com

জনগণের ভোটাধিকার পুনর্বহাল দাবিতে আন্দোলন

কথা ছিলো ১৯৫৯ সনে নতুন শাসনতন্ত্রের ভিত্তিতে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

ইতোপূর্বে ১৯৫৪ সনে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক, মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বাধীন যুক্তফ্রন্ট ৩০৯টি আসনের মধ্যে ৩০০টি আসনে বিজয়ী হয়। মাত্র ৯টি আসন পায় মুসলিম লীগ।

কিন্তু যুক্তফ্রন্টের দলগুলোর আন্তকলহের ফলে প্রাদেশিক সরকারে ভাংগা ও গড়া চলতে থাকে।

১৯৫৮ সনের ২০শে সেপ্টেম্বর আতাউর রহমান খান সরকারের প্রতি আস্থা ভোটের জন্য পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের অধিবেশন বসে। অধিবেশনে স্পিকার আবদুল হামিদের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব পাস হয়। স্পিকারের দায়িত্ব লাভ করেন ডেপুটি স্পিকার শাহেদ আলী পাটোয়ারী। পরিষদে হট্টগোল চলতে থাকে। উত্তেজিত সদস্যদের আঘাতে শাহেদ আলী পাটোয়ারী মারাত্মক আহত হন। তাঁকে হাসপাতালে নেওয়া হয়। তিনি হাসপাতালে মারা যান।

১৯৫৮ সনের ৭ই অকটোবর প্রেসিডেন্ট ইস্কানদার আলী মির্যা দেশে সামরিক শাসন জারি করেন। জাতীয় পরিষদ, প্রাদেশিক পরিষদসমূহ, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা ও প্রাদেশিক মন্ত্রীসভাগুলো ভেংগে দেন। নয় বছরের চেষ্টাসাধনার ফসল শাসনতন্ত্রটি বাতিল করে দেন।

প্রধান সামরিক প্রশাসক নিযুক্ত হন সেনাপ্রধান জেনারেল মুহাম্মাদ আইউব খান। ২৭শে অকটোবর আইউব খান প্রেসিডেন্ট পদটিও দখল করেন। চলতে থাকে এক ব্যক্তির স্বৈরশাসন।

১৯৬২ সনের ১লা মার্চ প্রেসিডেন্ট আইউব খান দেশের জন্য একটি নতুন শাসনতন্ত্র জারি করেন। এটি না ছিলো ইসলামিক, না ছিলো গণতান্ত্রিক।

www.pathagar.com

এতে বিধান রাখা হয়, দেশের প্রেসিডেন্ট, জাতীয় পরিষদের সদস্যগণ এবং প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যগণ 'মৌলিক গণতন্ত্রী'দের (Basic Democrats) দ্বারা নির্বাচিত হবেন। আর 'মৌলিক গণতন্ত্রী' হবেন পূর্ব পাকিস্তানের ইউনিয়ন পরিষদসমূহের চেয়ারম্যান ও মেম্বার মিলে ৪০ হাজার জন এবং পশ্চিম পাকিস্তানের ইউনিয়ন পরিষদসমূহের চেয়ারম্যান ও মেম্বার মিলে ৪০ হাজার জন। অর্থাৎ ৮০ হাজার ব্যক্তি ছাড়া দেশের কোটি কোটি মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া হয়।

এই আজগুবী শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম আওয়াজ তোলে জামায়াতে ইসলামী।

১৯৬২ সনে রাওয়ালপিন্ডির লিয়াকতবাগ ময়দানে অনুষ্ঠিত জনসভায় সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী এই স্বৈরতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রের সমালোচনা করে বক্তব্য রাখেন এবং জনগণের ভোটাধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি জানান।

এতে প্রেসিডেন্ট আইউব খান ক্ষেপে যান। তাঁরই নির্দেশে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান সরকার এবং পশ্চিম পাকিস্তান সরকার ১৯৬৪ সনের ৬ই জানুয়ারি জামায়াতে ইসলামীকে বেআইনী ঘোষণা করে। আমীরে জামায়াত সহ মোট ৬০ জন শীর্ষ নেতাকে গ্রেফতার করা হয়।

বন্দিদের মধ্যে ছিলেন- আমীরে জামায়াত সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, মিয়া তুফাইল মুহাম্মাদ, নাঈম সিদ্দিকী, নাসরুল্লাহ খান আযিয, চৌধুরী গোলাম মুহাম্মাদ, মাওলানা ওয়ালীউল্লাহ, মাওলানা আবদূর রহীম, অধ্যাপক গোলাম আযম, জনাব আবদুল খালেক, ইঞ্জিনিয়ার খুররম জাহ মুরাদ, অধ্যাপক হেলালুদ্দীন, মাস্টার শফিকুল্লাহ, মাওলানা এ.কিউ.এম. ছিফাতুল্লাহ, অধ্যাপক ওসমান রময্, মাস্টার আবদুল ওয়াহিদ (যশোর), আবদুর রহমান ফকির, জনাব শামসুল হক, মাওলানা মীম ফজলুর রহমান প্রমুখ।

জনাব আব্বাস আলী খান, জনাব শামসুর রহমান ও মাওলানা এ.কে.এম. ইউসুফ জাতীয় পরিষদের সদস্য ছিলেন বিধায় গ্রেফতার হননি।

www.pathagar.com

এবারও জামায়াতে ইসলামীর জনশক্তি উচ্চমানের ধৈর্যের উদাহরণ পেশ করেন।

জামায়াতে ইসলামী সরকারের অন্যায় পদক্ষেপের বিরুদ্ধে আইনী লড়াই চালানোর সিদ্ধান্ত নেয়। স্বনামধন্য আইনজীবী মি. এ.কে. ব্রোহীর নেতৃত্বে একটি টিম মামলা পরিচালনা করে। পশ্চিম পাকিস্তান হাইকোর্ট জামায়াতে ইসলামীর বিপক্ষে এবং পূর্ব পাকিস্তান হাইকোর্ট জামায়াতে ইসলামীর পক্ষে রায় দেয়। চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য মামলাটি সুপ্রিম কোর্টে যায়। সুপ্রিম কোর্ট জামায়াতে ইসলামীর পক্ষে রায় দেয়।

১৯৬৪ সনের ৯ই অকটোবর জামায়াতে ইসলামীর নেতৃবৃন্দ কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করেন।

'কম্বাইন্ড অপোজিশন পার্টিজ'-এর শরীক দল হিসেবে ভূমিকা পালন

১৯৬৪ সনের ২০শে জুলাই ঢাকায় খাজা নাজিমুদ্দীনের বাসভবনে অনুষ্ঠিত বৈঠকে আইউব খানের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে একটি রাজনৈতিক জোট গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত হয়। এই জোটের নাম দেওয়া হয় 'কম্বাইন্ড অপোজিশন পার্টিজ' (C.O.P.)।

এতে শরীক ছিল কাউন্সিল মুসলিম লীগ, আওয়ামী লীগ, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি ও নেযামে ইসলাম পার্টি।

১৯৬৪ সনের সেপ্টেম্বর মাসে 'কম্বাইন্ড অপোজিশন পার্টিজ' ১৯৬৫ সনের ২রা জানুয়ারি তারিখে অনুষ্ঠিতব্য প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে আইউব খানের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য মি. মুহাম্মাদ আলী জিন্নাহর বোন মিস ফাতিমা জিন্নাহকে নমিনেশন দেয়।

এই সময় জামায়াতে ইসলামী ছিলো বেআইনী ঘোষিত। নেতৃবৃন্দ ছিলেন জেলখানায়। জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় মাজলিসে শূরার যেইসব সদস্য জেলের বাইরে ছিলেন, তাঁরা ১৯৬৪ সনের ২রা অকটোবর একটি মিটিংয়ে একত্রিত হন।

www.pathagar.com

'আলোচনান্তে মাজলিসে শূরা অভিমত ব্যক্ত করে যে স্বাভাবিক অবস্থায় একজন মহিলাকে রাষ্ট্রপ্রধান করা সমীচীন নয়। কিন্তু এখন দেশে চলছে এক অস্বাভাবিক অবস্থা। স্বৈরশাসক আইউব খানের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ক্ষেত্রে মিস ফাতিমা জিন্নাহর কোন বিকল্প নেই। এমতাবস্থায় সার্বিক অবস্থার নিরিখে জামায়াতে ইসলামী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে মিস ফাতিমা জিন্নাহকেই সমর্থন করবে।'[৪]

১৯৬৪ সনের ৯ই অকটোবর শীর্ষ নেতৃবৃন্দ জেল থেকে মুক্তি লাভ করে উক্ত সিদ্ধান্ত অনুমোদন করেন। নির্বাচনে আইউব খান পান ৪৯,৬৪৭ ভোট। মিস ফাতিমা জিন্নাহ পান ২৮,৩৪৫ ভোট।

প্রেসিডেন্ট আইউব খানের চোখরাংগানি ও নানামুখী চাপ উপেক্ষা করে ২৮ হাজারের বেশি 'মৌলিক গণতন্ত্রী' মিস ফাতিমা জিন্নাহকে ভোট দেওয়ায় স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছিলো দেশের রাজনৈতিক হাওয়া স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে বইছে। আর এই হাওয়া সৃষ্টিতে জামায়াতে ইসলামীর ভূমিকা ছিলো খুবই বলিষ্ঠ।

যুদ্ধকালে জাতীয় ঐক্যের ডাকে সাড়াদান

১৯৪৭ সনের স্বাধীনতা লাভের সময় থেকেই পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে কাশমিরকে নিয়ে বিরোধ চলে আসছিলো।

এই বিরোধের ধারাবাহিকতায় ১৯৬৫ সনের ৬ই সেপ্টেম্বর ভারত পাকিস্তান আক্রমণ করে বসে। সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী সেইদিন রাওয়ালপিন্ডি ছিলেন। যুদ্ধ শুরুর খরব শুনে তিনি লাহোরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। পথিমধ্যে তাঁকে জানানো হয় যে প্রেসিডেন্ট আইউব খান তাঁর সাথে সাক্ষাত করতে চান। মাঝপথ থেকে তিনি আবার রাওয়ালপিন্ডি পৌঁছে প্রেসিডেন্ট ভবনে যান।

সেখানে পৌঁছে তিনি অন্যান্য বিরোধী দলীয় নেতা চৌধুরী মুহাম্মাদ আলী,

৪. প্রফেসর মাসুদুল হাসান, মাওলানা মওদূদী এন্ড হিজ থট, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১৭৩।

www.pathagar.com

চৌধুরী গোলাম আব্বাস এবং নওয়াবজাদা নাসরুল্লাহ খানকে উপস্থিত দেখতে পান।

উল্লেখ্য, প্রেসিডেন্ট আইউব খান জামায়াতে ইসলামী এবং সাইয়েদ আবুল আ'লার প্রতি দারুণ বিদ্বেষ পোষণ করতেন। তাঁর কিছু সংখ্যক মন্ত্রী প্রতিদিন জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে বিষোদগার করতেন। তাঁর নির্দেশেই পূর্ব ও পশ্চিমের প্রাদেশিক সরকার দুইটি জামায়াতে ইসলামীকে বেআইনী ঘোষণা করেছিলো এবং ৬০ জন শীর্ষ নেতাকে জেলে পুরে ছিলো।

কিন্তু জাতির কঠিন বিপদের সময় প্রেসিডেন্ট আইউব খান সহযোগিতা চাইলে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী আন্তরিকতার সাথে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন।

তিনি ১৪, ১৬ ও ১৮ই সেপ্টেম্বর রেডিওর মাধ্যমে জাতির উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেন। জামায়াতে ইসলামীর কর্মীগণ যুদ্ধবিধ্বস্ত মুহাজিরদের সেবা, চিকিৎসা ও পুনর্বাসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

'পাকিস্তান ডিমোক্রেটিক মুভমেন্ট'-এর শরীক দল হিসেবে ভূমিকা পালন

১৯৬৫ সনের যুদ্ধ চলেছিলো ১৭ দিন। এই যুদ্ধে ভারতের সৈন্য সংখ্যা ছিলো পাকিস্তানের সৈন্য সংখ্যার ৬ গুণ বেশি। তবুও ভারতীয় সৈন্যরা পাকিস্তানের যতোটুকু ভূমি দখল করেছিলো তার চার গুণ বেশি ভারতীয় ভূমি দখল করেছিলো পাকিস্তানী সৈন্যরা। পাকিস্তানী সৈন্যরা ভারতের ১১০টি জংগিবিমান ভূ-পাতিত করে। ভারতীয় সৈন্যরা ধ্বংস করে পাকিস্তানের ১৬টি জংগিবিমান। পাকিস্তানী নৌবাহিনী ভারতের দ্বারকা নৌ-ঘাঁটিতে হামলা চালিয়ে একটি যুদ্ধজাহাজ ধ্বংস করে।

ভারতীয় নৌবাহিনী পাকিস্তানের কোন নৌঘাঁটির কাছে ঘেঁষতে পারেনি।

প্রত্যক্ষ যুদ্ধে বিজয় লাভ করলো পাকিস্তান। কিন্তু হেরে গেলো কূটনৈতিক যুদ্ধে।

www.pathagar.com

১৯৬৬ সনের ১০ই জানুয়ারি ভারতের মিত্র রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী কোসিগিনের মধ্যস্থতায় রাশিয়ার অন্যতম ইতিহাসপ্রসিদ্ধ শহর তাসখন্দে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট মুহাম্মাদ আইউব খান এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রী একটি শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর করেন। ভারত কৌশলে অনেক কিছুই আদায় করে নেয়। বুদ্ধির যুদ্ধে আইউব খান পরাজিত হন। যেই কাশমির নিয়ে ঘটলো এতো বড়ো যুদ্ধ, তার কোন উল্লেখই ছিলো না শান্তি চুক্তির কোথাও। ভারতীয়রা উল্লাসে ফেটে পড়ে। পাকিস্তানীরা মানসিকভাবে দারুণ আহত হয়।

১৯৬৬ সনের ১৬ই জানুয়ারি জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, চৌধুরী মুহাম্মাদ আলী, নওয়াবজাদা নাসরুল্লাহ খান, চৌধুরী মুহাম্মাদ হুসাইন চাত্তা, মালিক গোলাম জিলানী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ একত্রিত হয়ে একটি যুক্ত বিবৃতির মাধ্যমে তাসখন্দ চুক্তি প্রত্যাখ্যান করেন।

পাকিস্তানে জনপ্রতিনিধিত্বশীল সরকার ফিরিয়ে আনার বিষয়ে আলোচনা শুরু হয়।

১৯৬৭ সনের ৩০শে এপ্রিল পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকাতে জনাব আতাউর রহমান খানের বাসভবনে ন্যাশনাল ডিমোক্রেটিক ফ্রন্টের নূরুল আমীন, হামিদুল হক চৌধুরী ও আতাউর রহমান খান, কাউন্সিল মুসলিম লীগের মিয়া মুমতাজ মুহাম্মাদ খান দাওলাতানা, তোফাজ্জল আলী ও খাজা খায়েরউদ্দীন, জামায়াতে ইসলামীর মিয়া তুফাইল মুহাম্মাদ, মাওলানা আবদুর রহীম ও অধ্যাপক গোলাম আযম, আওয়ামী লীগের নওয়াবজাদা নাসরুল্লাহ খান, এডভোকেট আবদুস সালাম খান ও গোলাম মুহাম্মাদ খান লুন্দখোর, নেযামে ইসলাম পার্টির চৌধুরী মুহাম্মাদ আলী, মৌলবী ফরিদ আহমদ ও এম.আর. খান এক গুরুত্বপূর্ণ মিটিং করেন এবং 'পাকিস্তান ডিমোক্রেটিক মুভমেন্ট' (P.D.M.) নামে একটি রাজনৈতিক জোট গঠনের ঘোষণা দেন। এইভাবে নতুন করে শুরু হয় গণতন্ত্র তথা জনগণের ভোটাধিকার পুনরুদ্ধারের আন্দোলন।

www.pathagar.com

'পাকিস্তান ডিমোক্রেটিক মুভমেন্ট'-এর শরীক দল ছিলো পাঁচটি ঃ ন্যাশনাল ডিমোক্রেটিক ফ্রন্ট, কাউন্সিল মুসলিম লীগ, আওয়ামী লীগ, নেযামে ইসলাম পার্টি ও জামায়াতে ইসলামী।

উল্লেখ্য, 'পাকিস্তান ডিমোক্রেটিক মুভমেন্ট' প্রশ্নে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। মাওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ ও রাজশাহীর মুজিবুর রহমান পরিচালিত অংশটি 'পাকিস্তান ডিমোক্রেটিক মুভমেন্টে' যোগ দেয়। শেখ মুজিবুর রহমান এবং রাজশাহীর কামারুজ্জামান পরিচালিত অংশটি "ছয় দফা" ভিত্তিক আন্দোলন চালাতে থাকে।

স্বৈরশাসনের অবসানকল্পে জামায়াতে ইসলামী একনিষ্ঠভাবে 'পাাকিস্তান ডিমোক্রেটিক মুভমেন্টে' গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে থাকে।

উল্লেখ্য, 'পাকিস্তান ডিমোক্রেটিক মুভমেন্ট'-এর পূর্ব পাকিস্তান শাখার সভাপতি ছিলেন আওয়ামী লীগের এডভোকেট আবদুস সালাম খান এবং সেক্রেটারী ছিলেন জামায়াতে ইসলামীর অধ্যাপক গোলাম আযম।

'পাকিস্তান ডিমোক্রেটিক মুভমেন্ট'-এর ৮ দফা দাবি–

১. শাসনতন্ত্রে নিম্ন বিধানসমূহের ব্যবস্থা থাকবে ঃ
   ক. পার্লামেন্টারি পদ্ধতির ফেডারেল সরকার;
   খ. ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র মোতাবেক প্রাপ্তবয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত আইন পরিষদের প্রাধান্য;
   গ. পূর্ণাঙ্গ মৌলিক অধিকার;
   ঘ. সংবাদপত্রের অবাধ আজাদি;
   ঙ. বিচার বিভাগের নিশ্চিত স্বাধীনতা।
২. ফেডারেল সরকার নিম্ন বিষয়সমূহের উপর ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন ঃ
   ক. প্রতিরক্ষা (ডিফেন্স);
   খ. বৈদেশিক বিষয়;
   গ. মুদ্রা ও কেন্দ্রীয় অর্থব্যবস্থা;
   ঘ. আন্তঃপ্রাদেশিক যোগাযোগ ও বাণিজ্য এবং ঐকমত্যে নির্ধারিত অন্য যে কোন বিষয়।

www.pathagar.com

৩. পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসন কায়েম করা হবে এবং কেন্দ্রীয় বিষয় ছাড়া সরকারের অবশিষ্ট যাবতীয় ক্ষমতা শাসনতন্ত্র মোতাবেক স্থাপিত আঞ্চলিক সরকারের নিকট ন্যস্ত থাকবে।

৪. উভয় প্রদেশের মধ্যে বিরাজমান অর্থনৈতিক বৈষম্য ১০ বছরের মধ্যে দূর করা পাকিস্তান সরকারের শাসনতান্ত্রিক দায়িত্ব হবে।

ক. এই সময়ের মধ্যে দেশরক্ষা ও বৈদেশিক বিষয়ে ব্যয় এবং বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বৈদেশিক ঋণদানসহ কেন্দ্রীয় সরকারের দেনায় পূর্বপাকিস্তানে ব্যয়িত অর্থের আনুপাতিক অংশ আদায়ের পর পূর্বপাকিস্তানে অর্জিত সম্পূর্ণ মুদ্রা নিরঙ্কুশভাবে এই প্রদেশেই ব্যয় করা হবে।

খ. উভয় অঞ্চলের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা প্রাদেশিক সরকারদ্বয়ের নিরঙ্কুশ কর্তৃত্বাধীনেই থাকবে।

গ. অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর না হওয়া পর্যন্ত পাকিস্তান সরকার বৈদেশিক সাহায্য ও ঋণের ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানকে অগ্রাধিকার প্রদান করবেন এবং এমন আর্থিক নীতি গ্রহণ করবেন যাতে পূর্ব পাকিস্তান হতে মূলধন পাচার সম্পূর্ণ বন্ধ করা যায়। এই উদ্দেশ্যে ব্যাংকের মওজুদ অর্থ ও মুনাফা, বীমার প্রিমিয়াম এবং শিল্পের মুনাফা সম্পর্কে যথাসময়ে উপযুক্ত আইন প্রণয়ন করা হবে।

৫. ক. মুদ্রা, বৈদেশিক মুদ্রা ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকিং;
খ. আন্তঃআঞ্চলিক বাণিজ্য;
গ. আন্তঃআঞ্চলিক যোগাযোগ;
ঘ. বৈদেশিক বাণিজ্য।
উপরিউক্ত বিষয়সমূহের প্রত্যেকটি পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সমসংখ্যক সদস্য নিয়ে গঠিত এক একটি বোর্ড দ্বারা পরিচালিত হবে। জাতীয় পরিষদের প্রত্যেক প্রদেশের সদস্যগণ নিজ প্রদেশের জন্য উক্ত বোর্ডসমূহের সদস্যগণকে নির্বাচিত করবেন।

৬. সুপ্রিমকোর্ট এবং কূটনৈতিক বিভাগসহ কেন্দ্রীয় সরকারের সকল বিভাগ ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের

www.pathagar.com

সমসংখ্যক ব্যক্তি দ্বারা গঠিত হবে। এই সংখ্যাসাম্য অর্জনের জন্য ভবিষ্যতে এমনভাবে কর্মচারী নিয়োগ করতে হবে যাতে ১০ বছরের মধ্যে তাদের সংখ্যা উভয় প্রদেশে সমান হতে পারে।

৭. প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে কার্যকর সামরিক শক্তি ও সমরসজ্জার ব্যাপারে উভয় অঞ্চলের মধ্যে সমতা বিধান করা পাকিস্তান সরকারের শাসনতান্ত্রিক দায়িত্ব হবে। এই উদ্দেশ্যে–

ক. পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক একাডেমী, অস্ত্র নির্মাণ কারখানা, ক্যাডেট কলেজ স্থাপন করতে হবে।

খ. দেশরক্ষা বাহিনীর তিনটি বিভাগেই পূর্ব পাকিস্তান হতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক লোক নিয়োগ করতে হবে।

গ. নৌবাহিনীর সদর দপ্তর পূর্বপাকিস্তানে স্থানান্তরিত করতে হবে।

এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সমসংখ্যক সদস্য সংবলিত একটি ডিফেন্স কাউন্সিল গঠন করা হবে।

৮. এই ঘোষণায় শাসনতন্ত্র শব্দ দ্বারা ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র বুঝায়, যা অবিলম্বে জারি করা হবে। এই শাসনতন্ত্র চালু করবার ৬ মাসের মধ্যে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।[৫]

'ডিমোক্রেটিক এ্যাকশন কমিটি'-র শরীক দল হিসেবে ভূমিকা পালন

১৯৬৯ সনের শুরুতে গোটা পাকিস্তানের শিক্ষাংগন ভীষণভাবে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা রাজপথে নেমে পড়ে। রাজপথে নেমে আসে অন্যান্য পেশার লোকেরাও।

এই সময় জাতীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ঢাকাতে স্বৈরশাসন থেকে গণতন্ত্রে উত্তরণ বিষয়ে মত বিনিময় ও আলাপ-আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছিলেন।

---

৫. অধ্যাপক গোলাম আযম, জীবনে যা দেখলাম, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৬০-৬২।

www.pathagar.com

১৯৬৯ সনে ৮ই জানুয়ারি জনাব নূরুল আমীনের বাসভবনে চৌধুরী মুহাম্মাদ আলী (নেযামে ইসলাম পার্টি), নওয়াবজাদা নাসরুল্লাহ খান (পিডিএম পন্থী আওয়ামী লীগ), মিয়া তুফাইল মুহাম্মাদ (জামায়াতে ইসলামী), নূরুল আমীন (ন্যাশনাল ডিমোক্রেটিক ফ্রন্ট), মিয়া মুমতাজ মুহাম্মাদ খান দাওলাতানা (কাউন্সিল মুসলিম লীগ), সৈয়দ নজরুল ইসলাম (ছয় দফাপন্থী আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি), মুফতী মাহমুদ (জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম) এবং আমীর শাহ (ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি) 'ডিমোক্রেটিক এ্যাকশন কমিটি' (D.A.C.) গঠনের ঘোষণা দেন। 'ডিমোক্রেটিক এ্যাকশন কমিটির' কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক নির্বাচিত হন নওয়াবজাদা নাসরুল্লাহ খান। আর 'ডিমোক্রেটিক এ্যাকশন কমিটির' পূর্ব পাকিস্তান শাখার আহ্বায়কের দায়িত্ব পান খন্দকার মুশতাক আহমদ।

'ডিমোক্রেটিক এ্যাকশন কমিটি'র ৮ দফা দাবি–

১. ফেডারেল পার্লামেন্টারি সরকার প্রবর্তন।

২. প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে প্রত্যক্ষ নির্বাচন।

৩. অবিলম্বে জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার।

৪. নাগরিক অধিকার বহাল ও সকল কালাকানুন বাতিল।

৫. শেখ মুজিবুর রহমান, খান আবদুল ওয়ালী খান ও জুলফিকার আলী ভূট্টোসহ সকল রাজনৈতিক বন্দিকে মুক্তিদান ও মামলা বাতিলকরণ।

৬. ১৪৪ ধারার আওতায় সকল প্রকার আদেশ প্রত্যাহার।

৭. শ্রমিকদের ধর্মঘট করার অধিকার বহালকরণ।

৮. সংবাদপত্রের ওপর আরোপিত বিধি-নিষেধ প্রত্যাহার এবং বাজেয়াপ্তকৃত সকল প্রেস ও পত্রিকা পুনর্বহাল করণ।[৬]

১৯৬৯ সনের ২০শে জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাংগনে আহূত ছাত্র

---

৬. অধ্যাপক গোলাম আযম, জীবনে যা দেখলাম, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৭৫।

www.pathagar.com

সমাবেশে হাজার হাজার ছাত্র উপস্থিত হয়। পুলিশ ও ইস্ট বেংগল রাইফেলস-এর জওয়ানদের লাঠিচার্জ, নিক্ষিপ্ত টিয়ার গ্যাস উপেক্ষা করে ছাত্রদের মিছিল এগুতে থাকে। মেডিকেল কলেজের সামনে এলে আইন-শৃংখলা বাহিনী গুলি ছোঁড়ে। সেন্ট্রাল ল কলেজের ছাত্র আসাদুজ্জামান গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হন। (মুহাম্মাদপুরের আসাদ গেট তাঁর স্মৃতি বহন করছে।) ২১শে জানুয়ারি হরতাল পালিত হয়। দুপুরের দিকে পল্টন ময়দানে গায়েবানা জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। ছাত্রজনতা ১৪৪ ধারা উপেক্ষা করে বিশাল শোক মিছিল বের করে।

'ডিমোক্রেটি এ্যাকশন কমিটি' ১২ই ফেব্রুয়ারি সারা পাকিস্তানে হরতালের ডাক দেয়। একই ইস্যুতে একই দিনে সারা পাকিস্তানে এটাই ছিলো প্রথম হরতাল।

'ডিমোক্রেটি এ্যাকশন কমিটি' গঠিত হওয়ার পর আন্দোলন নিখিল পাকিস্তান রূপ লাভ করে।
এইভাবে সারা দেশে গণজাগরণ সৃষ্টি হয়।

জামায়াতে ইসলামী 'ডিমোক্রেটিক এ্যাকশন কমিটি'-র শরীক দল হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রেসিডেন্ট আইউব খান কর্তৃক আহূত জাতীয় সংলাপে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন

'ডিমোক্রেটিক এ্যাকশন কমিটি'-র জনপ্রিয়তা দেখে লৌহমানব আইউব খান বুঝতে সক্ষম হন যে তাঁর পায়ের নিচে আর মাটি নেই।

১৯৬৯ সনের ২১শে ফেব্রুয়ারি প্রেসিডেন্ট আইউব খান জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত রেডিও ভাষণে বলেন যে যেহেতু জনগণ সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচন চায়, সেহেতু তিনি বিষয়টি নিয়ে সকল রাজনৈতিক দলের সাথে আলোচনা করবেন। তিনি আরো ঘোষণা করেন যে পরবর্তী নির্বাচনে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন না।

১৯৬৯ সনের ২৬শে ফেব্রুয়ারি রাওয়ালপিন্ডিতে গোল টেবিল বৈঠক শুরু

www.pathagar.com

হবে বলে স্থির হয়। গোল টেবিল বৈঠকে প্রত্যেক দল থেকে দুই জন করে প্রতিনিধি আমন্ত্রিত হন। এয়ার মার্শাল (অবসরপ্রাপ্ত) আসগর খান ও বিচারপতি মাহবুব মুর্শেদও আমন্ত্রিত হন এবং বৈঠকে যোগদান করেন। আমন্ত্রিত হয়েও রহস্যজনক কারণে জুলফিকার আলী ভূট্টো (পাকিস্তান পিপলস পার্টি) এবং মাওলানা ভাসানী (পিকিং পন্থী ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি) বৈঠকে যোগদান করা থেকে বিরত থাকেন।

গোল টেবিল বৈঠকে যোগদানের আগে নওয়াবজাদা নাসরুল্লাহ খানের সভাপতিত্বে 'ডিমোক্রেটিক এ্যাকশন কমিটি'র প্রতিনিধিদের একটি মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। এই মিটিংয়ে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন,

> "সামরিক প্রতিবিপ্লব, সশস্ত্র সংগ্রাম কিংবা রক্তঝরা গণআন্দোলন ছাড়া মিলিটারি ডিক্টেটর থেকে মুক্তি পাওয়ার কোন নযির নেই। পাকিস্তানের ওপর আল্লাহর রহমত যে নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালিত আমাদের আন্দোলন সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত। 'ডিমোক্রেটিক এ্যাকশন কমিটি'র আটটি দলের "আট দফা" দাবি বিবেচনার জন্যই প্রেসিডেন্ট আইউব খান গোল টেবিল বৈঠকে বসতে প্রস্তুত হয়েছেন।"
>
> "আমরা যদি গোল টেবিল বৈঠককে সফল করতে চাই তাহলে "আট দফার" বাইরে কোন বিষয় বৈঠকে উপস্থাপন করতে দিতে পারি না। যদি কেউ নতুন কোন দাবি তোলেন তাহলে আমাদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হবে।..... এই অবস্থায় সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে এসে আমরা গণতন্ত্র বহাল করতে ব্যর্থ হবো এবং আবার নতুন করে সামরিক শাসনের খপ্পরে পড়বো।"[৭]

১৯৬৯ সনের ২৬শে ফেব্রুয়ারি রাওয়ালপিন্ডিতে শুরু হয় গোল টেবিল বৈঠক। ঈদুল আযহার বিরতির পর ১০ই মার্চ আবার বৈঠক শুরু হয়।

ইতোমধ্যে "আগরতলা ষড়যন্ত্র" মামলার আসামী শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তি দেওয়া হয়। তিনি গোল টেবিল বৈঠকে যোগ দেন।

'ডিমোক্রেটিক এ্যাকশন কমিটি'-র আহ্বায়ক নওয়াবজাদা নাসরুল্লাহ খান আঞ্চলিক স্বায়ত্ব শাসন, ফেডারেল পার্লামেন্টারী সরকার পদ্ধতি প্রবর্তন

---

৭. অধ্যাপক গোলাম আযম, জামায়াতে ইসলামীর রাজনৈতিক ভূমিকা, পৃষ্ঠা-৪৪।

www.pathagar.com

এবং প্রাপ্তবয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ সমূহের নির্বাচনের দাবি জানিয়ে বক্তব্য রাখেন।

শেখ মুজিবুর রহমান আঞ্চলিক স্বায়ত্ব শাসন, দুই মুদ্রা প্রচলন অথবা একই মুদ্রা রেখে প্রত্যেক অঞ্চলে আলাদা রিজার্ভ ব্যাংক স্থাপন, দেশের পররাষ্ট্রনীতির নিরিখে বৈদেশিক বাণিজ্য ও বৈদেশিক সাহায্য নিগোশিয়েট করার ক্ষমতা আঞ্চলিক সরকারগুলোর হাতে অর্পণ, কর ধার্য ও আদায় করার ক্ষমতা আঞ্চলিক সরকারগুলোর হাতে প্রদান, কেন্দ্রীয় সরকারকে আঞ্চলিক সরকারগুলোর নিকট থেকে কর আদায়ের ক্ষমতাদান, পশ্চিম পাকিস্তানের এক ইউনিট বাতিল ও সাবফেডারেশন গঠন ইত্যাদি বিষয় বিশ্লেষণ করে বক্তব্য রাখেন।

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী তাঁর বক্তব্যে বলেন,

> 'পাকিস্তান অর্জিত হয়েছিলো ইসলামের নামে অথচ ইসলামী জীবন বিধান কায়েম করা হয়নি। ফলে এই দেশ অসংখ্য সমস্যার দেশে পরিণত হয়েছে। জনপ্রতিনিধিরা যদি প্রথমে মুসলিম ও পরে অন্য কিছু হতেন তাহলে সংখ্যাসাম্য, আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসন ও আনুসঙ্গিক অন্য সব বিষয়ের উদ্ভব ঘটতো না। এমনকি ফেডারেল সরকার পদ্ধতিরও প্রয়োজন হতো না। ইসলামের জীবন বিধান কায়েম হলে সামন্তবাদ ও পুঁজিবাদ- সৃষ্ট সকল অন্যায়-অবিচার বিদূরিত হতো।
>
> শাসনতন্ত্রের কয়েকটি সংশোধনী আমাদেরকে বেশি দূর নিয়ে যেতে পারবে না। প্রয়োজন আইনগত, নৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক–সামগ্রিক সংস্কার। এই লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য আমরা প্রথমে গণতন্ত্রে উত্তরণ চাই। গণতান্ত্রিক পরিবেশ বা বাকস্বাধীনতা না থাকলে জনগণকে ইসলামের আলোকে শিক্ষাদান করা কঠিন। যেইসব সমস্যা সমাজকে জর্জরিত করছে তার সমাধান একদিনে সম্ভব নয়। এর জন্য যথেষ্ট সময় প্রয়োজন। এই জন্য প্রথমে চাই প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সরাসরি নির্বাচন এবং ফেডারেল পার্লামেন্টারি সরকার পদ্ধতি প্রবর্তন।'[৮]

অপর সাতটি দলের প্রতিনিধিরা শেখ মুজিবুর রহমানের "ছয় দফা" সমর্থন না করায় তিনি অসন্তুষ্ট হয়ে 'ডিমোক্রেটিক এ্যাকশন কমিটি'র সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন।

---

৮. প্রফেসর মাসুদুল হাসান, মাওলানা মওদূদী এন্ড হিজ থট, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩০০-৩০১।

www.pathagar.com

১৯৬৯ সনের ১৩ই মার্চ প্রেসিডেন্ট আইউব খান গোলটেবিল বৈঠক-এর সমাপ্তিকালে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে জনপ্রতিনিধি নির্বাচন এবং ফেডারেল পার্লামেন্টারি পদ্ধতি প্রবর্তনের দাবি মেনে নেওয়ার ঘোষণা দেন।

উল্লেখ্য, গণতন্ত্রে উত্তরণের লক্ষ্যে সকল রাজনৈতিক দলের ঐক্য গড়ন, ঘোষিত দফাগুলোর পক্ষে জনমত গঠন এবং গোল টেবিল বৈঠককে সফল করার জন্য জামায়াতে ইসলামীর ভূমিকা ছিলো বলিষ্ঠ ও দায়িত্বশীল।

আবার সামরিক শাসন ও জাতীয় নির্বাচন

স্বৈরশাসন থেকে গণতান্ত্রিক শাসনের দিকে এগুচ্ছিলো দেশ। উগ্রপন্থীরা এই উজ্জ্বল সম্ভাবনা বিনাশ করে দেয়।

দেশের সর্বত্র ঘেরাও আন্দোলন চলতে থাকে। চলতে থাকে জ্বালাও পোড়াও অভিযান। হত্যা, আগুন লাগানো নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। ভিন্ন মতাবলম্বী রাজনীতিবিদদের ওপর হামলা চালানো হয়। প্রশাসন ভেংগে পড়ে। আইন শৃংখলার চরম অবনতি ঘটে। সর্বত্র আতংক ছড়িয়ে পড়ে। দেশে কোন সরকার আছে বলে মনে হচ্ছিলো না।

১৯৬৯ সনের ২৪শে মার্চ প্রেসিডেন্ট আইউব খান সেনাপ্রধান জেনারেল আগা মুহাম্মাদ ইয়াহইয়া খানকে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করতে অনুরোধ জানান। ২৫শে মার্চ সেনাপ্রধান দেশে সামরিক শাসন জারি করেন। তিনি শাসনতন্ত্র বাতিল করেন। জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদগুলো ভেংগে দেন।

৩১শে মার্চের এক ঘোষণা অনুযায়ী সেনাপ্রধান আগা মুহাম্মাদ ইয়াহইয়া খান প্রেসিডেন্টের ক্ষমতাও নিজের হাতে তুলে নেন।

জেনারেল আগা মুহাম্মাদ ইয়াহইয়া খান উপলব্ধি করতে সক্ষম হন যে জাতীয় নির্বাচন না দিয়ে দেশের চলমান উত্তপ্ত রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে না।

১৯৭০ সনের ৩০শে মার্চ ইয়াহইয়া খান ৪৮টি ধারা ও বহু উপধারা

www.pathagar.com

সম্বলিত "লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক" জারি করেন। দেশের জন্য একটি নতুন শাসনতন্ত্র প্রণয়ন বিষয়ে উক্ত আইন কাঠামোতে নিম্নরূপ দিকনির্দেশনা ছিলো ঃ

'এক. পাকিস্তান হবে একটি ফেডারেল প্রজাতন্ত্র যার নাম হবে ইসলামী প্রজাতন্ত্র পাকিস্তান।

দুই. পাকিস্তান সৃষ্টির বুনিয়াদ ইসলামী আদর্শ সংরক্ষিত থাকবে।

রাষ্ট্রপ্রধান হবেন একজন মুসলিম।

তিন. গণতন্ত্রের মূলনীতি অনুসারে এবং জনসংখ্যার ভিত্তিতে নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদগুলোর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

চার. আইনগত, প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক সরকারগুলোর মধ্যে এমনভাবে বণ্টিত হবে যাতে প্রদেশগুলো সর্বাধিক আইনগত, প্রশাসনিক ও আর্থিক অধিকার ভোগ করতে পারে, আবার অন্য দিকে কেন্দ্রীয় সরকার যাতে আইনগত, প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বিষয়াবলী পরিচালনায় এবং রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও আঞ্চলিক অখণ্ডতা রক্ষায় যথেষ্ট শক্তিশালী হয় তার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

পাঁচ. পাকিস্তানের সকল অঞ্চলের মানুষ জাতীয় সকল কর্মকাণ্ডে পূর্ণভাবে অংশগ্রহণ করতে পারবে এবং একটি প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যকার অর্থনৈতিকসহ সকল বৈষম্যের অবসান নিশ্চিত করতে হবে।'

১৯৭০ সনের ৭ই ডিসেম্বর জাতীয় পরিষদের নির্বাচনের দিন ধার্য হয়।

ঘোষিত "লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক" মেনে নিয়ে বিভিন্ন দল নিজস্ব নির্বাচনী মেনিফেস্টো নিয়ে নির্বাচনে নেমে পড়ে।

শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর "ছয় দফা" বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জনমত সৃষ্টির জন্য পূর্ব পাকিস্তান চষে বেড়াতে থাকেন।

www.pathagar.com

মস্কোপন্থী ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির খান আবদুল ওয়ালী খান ও অধ্যাপক মুজাফফর আহমদ "সমাজতন্ত্রের" পক্ষে জনসমর্থন আদায়ের চেষ্টা চালাতে থাকেন।

পশ্চিম পাকিস্তানে পিপলস পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভূট্টো নির্বাচনী জনসভায় জোরেসোরে বলতে থাকেন, পাকিস্তানে "ইসলামী সমাজতন্ত্র" কায়েম করতে হবে।

পিকিংপন্থী ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির নেতা আবদুল হামিদ খান ভাসানী নির্বাচন বর্জন করেন, কিন্তু "ইসলামী সমাজতন্ত্র" কায়েমের জন্য উত্তপ্ত বক্তব্য দিতে থাকেন।

সরদার আবদুল কাইউম খান, মিয়া মুমতাজ মুহাম্মাদ খান দাওলাতানা প্রমুখ "মুসলিম জাতীয়তাবাদ"-এর পতাকাবাহী রূপে প্রচার কাজ চালাতে থাকেন।

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর নেতৃত্বে জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানকে "ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্রে" পরিণত করার লক্ষ্যে জনমত গঠন করার চেষ্টা চালাতে থাকে।

নির্বাচনের পূর্বে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ রেডিও ও টেলিভিশনে বক্তৃতা করেন। ১৯৭০ সনের ৩রা নবেম্বর সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রেডিও ও টেলিভিশনের মাধ্যমে জামায়াতে ইসলামীর নির্বাচনী মেনিফেস্টো ঘোষণা করেন।

১৯৭০ সনের ৭ই ডিসেম্বর জাতীয় পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

জনসংখ্যার ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দকৃত ১৬২ আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ পায় ১৬০টি আসন। আওয়ামী লীগের বাইরে ন্যাশনাল ডিমোক্রেটিক ফ্রন্টের নূরুল আমীন এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে স্বতন্ত্র প্রার্থী রূপে চাকমা রাজা ত্রিদিব রায় নির্বাচিত হন।

পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দকৃত ১৩৮টি আসনের মধ্যে জুলফিকার আলী ভুট্টোর পিপলস পার্টি ৮৩টি আসনে বিজয়ী হয়। জামায়াতে ইসলামী ৪টি আসনে বিজয়ী হয়। পূর্ব পাকিস্তানে জামায়াতে ইসলামী ৬৩টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে, কিন্তু কোন আসনে বিজয়ী হয়নি।

www.pathagar.com

এই নির্বাচনে প্রশাসন একেবারেই নির্বিকার ছিলো। এই নির্বাচনে একদিকে আবেগ, অন্যদিকে পেশী শক্তির বিরাট ভূমিকা ছিলো। তবুও এই কথা সত্য যে পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটার আওয়ামী লীগের প্রতিই আস্থা স্থাপন করেছিলেন।

এমতাবস্থায় প্রেসিডেন্ট আগা মুহাম্মাদ ইয়াহইয়া খানের কর্তব্য ছিলো সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজয়ী দলের নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করা এবং তাঁর ওপর নতুন শাসনতন্ত্র প্রণয়নের দায়িত্ব অর্পণ করা।

পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম একটি প্রেস স্টেটমেন্টের মাধ্যমে শেখ মুজিবুর রহমানের হাতে ক্ষমতা অর্পণের জন্য প্রেসিডেন্ট আগা মুহাম্মাদ ইয়াহইয়া খানের প্রতি আহ্বান জানান।

জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান ও স্থগিতকরণ

১৯৭০ সনের নির্বাচনের ফলাফলের ভিত্তিতে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার গঠনের ক্ষমতা শেখ মুজিবুর রহমানের হাতেই আসার কথা ছিলো। আর 'লিডার অব দি অপোজিশন' হওয়ার কথা পাকিস্তান পিপলস পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভূট্টোর।

আওয়ামী লীগ পশ্চিম পাকিস্তানে একটি আসন না পেলেও গোটা পাকিস্তানের ৩০০টি আসনের মধ্যে ১৬০টি আসন লাভ করে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দলে পরিণত হয়েছিলো। এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসেবে শেখ মুজিবুর রহমান প্রধানমন্ত্রী হওয়ার হকদার ছিলেন।

পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সর্বজনাব মিয়া মুমতাজ মুহাম্মাদ খান দাওলাতানা (কাউন্সিল মুসলিম লীগ), খান আবদুল ওয়ালী খান (ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি), মুফতী মাহমুদ (জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম) এবং শাহ আহমাদ নূরানী (জমিয়তে উলামায়ে পাকিস্তান) ঢাকায় এসে শেখ মুজিবুর রহমানকে পশ্চিম পাকিস্তান যাওয়ার দাওয়াত দেন এবং তাঁর সাথে মিলে সরকার গঠনের ইচ্ছাও ব্যক্ত করেন। তাঁরা শেখ মুজিবুর রহমানকে অবহিত করেন যে তাঁদের দল থেকে যেইসব নমিনি জাতীয় পরিষদে নির্বাচিত হয়েছেন তাঁরা সকলেই জুলফিকার আলী ভূট্টোর বিরোধী।

www.pathagar.com

কিন্তু শেখ মুজিবুর রহমান উগ্র বামপন্থী এবং আওয়ামী লীগ ঘরানার কিছু লোকের বাধার কারণে পশ্চিম পাকিস্তান যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি। এই সময় জুলফিকার আলী ভূট্টো দাবি করেন যে শেখ মুজিবুর রহমানের আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল আর তাঁর দল পশ্চিম পাকিস্তানে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল। অথচ একই সময়ে একটি দেশে দুইটি সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হতে পারে না। তদুপরি শেখ মুজিবুর রহমানের উদ্দেশ্যে উচ্চারিত "এধার হাম, ওধার তুম" উক্তির মাধ্যমে তিনি স্পষ্টত পাকিস্তানকে বিভক্ত করারই উদ্যোগ নিলেন।

পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম বারবার জুলফিকার আলী ভূট্টোর অযৌক্তিক দাবির বিরুদ্ধে বিবৃতি দিতে থাকেন এবং শেখ মুজিবুর রহমানের হাতে ক্ষমতা তুলে দেবার জন্য দাবি জানাতে থাকেন।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহইয়া খান ১৯৭১ সনের ৩রা মার্চ ঢাকাতে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করেন। জুলফিকার আলী ভূট্টো ঘোষণা দিলেন যে শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে বুঝাপড়ার আগে তিনি জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগদান করবেন না। এমনকি তিনি হুমকি দিলেন যে পশ্চিম পাকিস্তানের কোন সদস্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগদানের উদ্দেশ্যে ঢাকা রওয়ানা হলে করাচি বিমান বন্দরে তাঁর পা ভেংগে দেওয়া হবে।

জুলফিকার আলী ভূট্টো কর্তৃক উত্থাপিত জাতীয় পরিষদের বাইরে বুঝাপড়ার দাবির প্রেক্ষিতে আমীরে জামায়াত সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী বলেন,

> 'জাতীয় পরিষদের বাইরে শাসনতান্ত্রিক সমস্যার সমাধান করতে চাওয়া এবং পরিষদের অধিবেশনে যোগদানে অস্বীকৃতির মাধ্যমে এই সন্ধিক্ষণে একটি শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা সৃষ্টির উদ্যোগ ভুল পদক্ষেপ। সঠিক পন্থা হচ্ছে, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা পরিষদের অধিবেশনে অংশগ্রহণ করবেন। তবে সংখ্যালঘিষ্ঠ দলগুলো পরিষদে তাদের নিজস্ব শাসনতান্ত্রিক খসড়া পেশ করবেন না। পরিষদে শুধু সংখ্যাগরিষ্ঠ দলই শাসনতান্ত্রিক খসড়া উপস্থাপন করবেন এবং শাসনতান্ত্রিক খসড়ার যেইসব অংশ রাষ্ট্রের ইসলামী চরিত্র, দেশের ঐক্য ও সংহতি, গণতান্ত্রিক মূলনীতি, মৌলিক অধিকার এবং প্রতিটি অঞ্চলের সমানাধিকার ও অর্থনৈতিক সুবিচারের মূলনীতির অনুকূল, সেইগুলো গ্রহণ করতে হবে এবং যেইসব অংশ এই সব মূলনীতির অনুকূল নয়,

www.pathagar.com

সেইগুলোর অবশ্যই বিরোধিতা করতে হবে। এর পরও যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ দল শুধু এর সংখ্যাধিক্যের জোরেই তা গ্রহণ করার চাপ প্রদান করে, তাহলে এই ধরনের শাসনতন্ত্র গৃহীত হলেও তা সাফল্যজনক কিছু হবে না এবং এর পরিণতি সম্পর্কে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলই সম্পূর্ণ দায়ী থাকবে।'[৯]

পশ্চিম পাকিস্তান থেকে জাতীয় পরিষদে নির্বাচিত কাউন্সিল মুসলিম লীগ, জমিয়তে উলামা পাকিস্তান, ন্যাশনাল অওয়ামী পার্টি, কনভেনশন মুসলিম লীগ ও জামায়াতে ইসলামীর সদস্যগণ এবং স্বতন্ত্রভাবে নির্বাচিত সদস্যগণ অর্থাৎ মোট ৪৬ জন সদস্য ৩রা মার্চ ঢাকাতে অনুষ্ঠিতব্য অধিবেশনে যোগদান করবেন বলে ঘোষণা দেন।

জুলফিকার আলী ভূট্টোর পাকিস্তান পিপলস পার্টি থেকে জাতীয় পরিষদে নির্বাচিত ৮৩ জন সদস্য এবং কাইউম মুসলিম লীগের ৯ জন সদস্য অর্থাৎ ৯২ জন সদস্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগদান করতে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। অপর দিকে অধিবেশনে যোগদানের জন্য প্রস্তুত ছিলেন পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের ২০৮ জন সদস্য।

এতদসত্ত্বেও ১৯৭১ সনের ১লা মার্চ বিকেল ১টা ৫ মিনিটে রেডিও মারফত প্রেসিডেন্ট ইয়াহইয়া খান ৩রা মার্চে অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় পরিষদের অবিবেশন স্থগিতকরণের ঘোষণা দেন। এই অযৌক্তিক পদক্ষেপের ফলে পাকিস্তান এক মহাসংকটের আবর্তে নিক্ষিপ্ত হয়।

জাতীয় পরিষদের অধিবেশন মুলতবীর ঘোষণা শুনে ঢাকার মানুষ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে।

ছাত্ররা রাস্তায় নেমে আসে। মিছিল বের করে হাইকোর্ট বার এসোসিয়েশন এবং ঢাকা ডিস্ট্রিক্ট বার এসোসিয়েশন। বিভিন্ন শিল্প এলাকা থেকে মিছিল করে শ্রমিকরা আসতে থাকে ঢাকার দিকে। বিক্ষোভ মিছিলের স্রোত হোটেল পূর্বাণীর দিকে অগ্রসর হয়। হোটেল পূর্বাণীতে তখন চলছিলো আওয়ামী লীগের পার্লামেন্টারী পার্টির মিটিং।

এই বিক্ষুব্ধ পরিবেশে হোটেল পূর্বাণী থেকে শেখ মুজিবুর রহমান পল্টন

৯. দৈনিক সংগ্রাম, ১৭ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১।

www.pathagar.com

ময়দানে আসেন। উপস্থিত জনতার উদ্দেশ্যে তিনি বলেন,

> 'গত দুই সপ্তাহ ধরে আমি ও আমার দলীয় নেতৃবৃন্দ জাতীয় পরিষদে পেশ করার জন্য সংবিধানের খসড়া প্রণয়নের কাজে নিয়োজিত ছিলাম। জাতীয় ঐক্য ও নিরাপত্তা সংহত রেখেও কী ব্যবস্থার মাধ্যমে পাকিস্তানের সংবিধান প্রণয়ন করা যায় তার জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন উপায় আমরা নির্ধারণ করেছি। কিছুক্ষণ আগে প্রস্তাবিত জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বাতিল করার ঘোষণা আমাদের প্রচেষ্টাকে বানচাল করার গভীর ষড়যন্ত্রের ফলশ্রুতি বলে মনে করি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস সকল বাঙালী এই ষড়যন্ত্রকে জীবন দিয়ে হলেও প্রতিহত করবে।'[১০]

অতপর তিনি ২রা মার্চ রাজধানী ঢাকাতে এবং ৩রা মার্চ সারাদেশে সাধারণ হরতাল পালন এবং ৭ই মার্চ রেসকোর্সে গণসমাবেশ অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেন।

পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম জাতীয় পরিষদের অধিবেশন মুলতবী ঘোষণার তীব্র নিন্দা করে বলেন,

> 'এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক যে দেশ যখন একটি গণতান্ত্রিক সরকারের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে, ঠিক তখনই গণতন্ত্রের স্বাভাবিক পদ্ধতিতে বাধা সৃষ্টি করা হয়েছে। গত কয়েক দিনের ঘটনা প্রবাহ থেকে এটা অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে ভূট্টোর যোগসাজশে পশ্চিম পাকিস্তানের কতিপয় বিশেষ শক্তিশালী মহল দেশের ঐক্য ও সংহতি বিনষ্ট করার অপচেষ্টা করছে।'[১১]

২রা মার্চের বিবৃতিতে শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা করলেন যে ৬ই মার্চ পর্যন্ত প্রতিদিন সকাল ৬টা থেকে বিকেল ২টা পর্যন্ত হরতাল চলবে। ঐদিন জনতার ওপর গুলিবর্ষণের ঘটনা ঘটে। ছয় ব্যক্তি নিহত হয়। উত্তেজনা বাড়তে থাকে। সন্ধ্যায় কারফিউ জারি করা হয়।

৩রা মার্চ পালিত হয় শোক দিবস। ছাত্রলীগ ও শ্রমিক লীগ আহূত শোক সভায় বক্তব্য রাখেন শেখ মুজিবুর রহমান। বক্তব্যের এক পর্যায়ে তিনি সরকারের নিকট 'সেনাবাহিনী প্রত্যাহার এবং নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি জানান। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত যাবতীয়

---

১০. এম. এ. ওয়াজেদ মিয়া, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ঘিরে কিছু ঘটনা ও বাংলাদেশ, পৃষ্ঠা-৭৩।

১১. দৈনিক সংগ্রাম, ২রা মার্চ, ১৯৭১।

www.pathagar.com

ট্যাকস দেওয়া থেকে বিরত থাকার জন্য তিনি জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।'

৩রা মার্চ পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম এক বিবৃতিতে সামরিক আইন প্রত্যাহার করে জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করার জন্য প্রেসিডেন্টের প্রতি আহ্বান জানান।

১৯৭১ সনের ১লা মার্চ সার্জেন্ট জহুরুল হক হলে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র লীগের সভাপতি নূরে আলম সিদ্দিকী, সাধারণ সম্পাদক শাহজাহান সিরাজ, ডাকসুর সহসভাপতি আ.স.ম. আবদুর রব এবং সাধারণ সম্পাদক আবদুল কুদ্দুস মাখন সমন্বয়ে 'স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠিত' হয়।[১২]

২রা মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাংগনে অনুষ্ঠিত এক ছাত্র জমায়েতে 'স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' 'স্বাধীন বাংলাদেশ'-এর পতাকা উত্তোলন করে।

৩রা মার্চ তারিখে "স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ" 'পাকিস্তান উপনিবেশবাদের কবল থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা, শোষণহীন সমাজ কায়েমের জন্য সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি ও নির্ভেজাল গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে স্বাধীন বাংলাদেশে কৃষক শ্রমিক রাজ কায়েমের শপথ গ্রহণ করে। ঐ দিনই "স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ" "স্বাধীন বাংলাদেশের ঘোষণা ও কর্মসূচী" শীর্ষক এক নাম্বার ইশতাহার প্রকাশ করে।

এইভাবে শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক পরিচালিত আন্দোলনের মূল ধারার বাইরে ভিন্ন দৃষ্টিভংগি নিয়ে সৃষ্টি হয় একটি স্বতন্ত্র ধারা।

উল্লেখ্য, অসহযোগ আন্দোলনের নির্দেশ দেওয়া হতো শেখ মুজিবুর রহমানের ধানমন্ডির বাড়ি থেকে। কিন্তু স্বেচ্ছাসেবকগণ কাজের নির্দেশ পেতো সার্জেন্ট জহুরুল হক হল থেকে। ছাত্ররা যদিও শেখ মুজিবুর

---

১২. আবুল আসাদ, কালো পঁচিশের আগে ও পরে, পৃষ্ঠা-৬৮।

www.pathagar.com

রহমানকে আন্দোলনের প্রধান ব্যক্তিত্ব বলে মনে করতো, কিন্তু তারা অনুসরণ করতো তাদের নিজস্ব কর্মপদ্ধতি।

২রা মার্চ থেকে বিভিন্ন স্থানে সৈন্য মুতায়েনের পর গুলি বর্ষণে প্রায় দেড় শতাধিক মানুষ নিহত এবং বহু সংখ্যক মানুষ আহত হয়।
৫ই মার্চ পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম এবং সাধারণ সম্পাদক আবদুল খালেক এক বিবৃতিতে নিরপরাধ মানুষ হত্যার তীব্র নিন্দা করেন, যেইসব ব্যক্তি অধিকার আদায়ের মহান সংগ্রামে জীবন দিয়েছে তাদের মাগফিরাত কামনা করেন এবং অবিলম্বে জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি জানান। তাঁরা জামায়াত কর্মীদেরকে নিজ নিজ এলাকায় শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রেখে জনসাধারণের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের শাসন কায়েমের সংগ্রাম চালিয়ে যাবার নির্দেশ দেন।
শেখ মুজিবুর রহমান ৭ই মার্চের ভাষণের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। অন্যদিকে 'স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' ইস্ট বেংগল রেজিমেন্ট, ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস, পুলিশবাহিনী এবং আনসার বাহিনীর সাথে যোগাযোগ স্থাপন করছিলো। 'স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' চাচ্ছিলো এমন একটি পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে যাতে শেখ মুজিবুর রহমান ৭ই মার্চের ভাষণে স্বাধীনতার ঘোষণা দিতে বাধ্য হন।

৬ই মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহইয়া খান নতুন করে ২৫শে মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করেন। যেই কারণ দেখিয়ে তিনি ৩রা মার্চে অনুষ্ঠিতব্য অধিবেশন মুলতবী করেছিলেন সেই কারণ তো তখনো দূর হয়নি। অথচ ইতোমধ্যে শেখ মুজিবুর রহমান ও জুলফিকার আলী ভূট্টোর মধ্যকার দূরত্ব আরো বেড়ে যায় এবং শেখ মুজিবুর রহমান কঠোরতর অবস্থানে এসে দাঁড়ান।

www.pathagar.com

১৯৭১ সনের ৭ই মার্চ।

রেসকোর্সে লাখো জনতার উত্তাল ঢেউ। বিকেল আড়াইটায় শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর ভাষণ শুরু করেন। তিনি বলেন,

"আজ দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আপনারা সকলেই জানেন এবং বোঝেন আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুরে আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে। আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ অধিকার চায়। কি অন্যায় করেছিলাম? নির্বাচনে বাংলাদেশের মানুষ সম্পূর্ণভাবে আমাকে ও আওয়ামী লীগকে ভোট দেন। আমাদের ন্যাশনাল এসেম্বলী বসবে, আমরা সেখানে শাসনতন্ত্র তৈরি করবো এবং এদেশের ইতিহাসকে আমরা গড়ে তুলবো। এদেশের মানুষ অর্থনীতি, রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক মুক্তি পাবেন। কিন্তু দুঃখের সংগে বলছি বাংলাদেশের করুণ ইতিহাস, বাংলার মানুষের রক্তের ইতিহাস– এই রক্তের ইতিহাস মুমূর্ষু মানুষের করুণ আর্তনাদ– এ দেশের করুণ ইতিহাস, এদেশের মানুষের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস।

১৯৫২ সালে আমরা রক্ত দিয়েছি। ১৯৫৪ সালে নির্বাচনে জয়লাভ করেও আমরা গদিতে বসতে পারিনাই। ১৯৫৮ সালে আয়ুব খাঁ মার্শাল-ল' জারি করে ১০ বছর আমাদের গোলাম করে রেখেছে। ১৯৬৬ সালে ৬ দফা আন্দোলনের সময় আমাদের ছেলেদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। ১৯৬৯ সালের আন্দোলনে আয়ুব খাঁর পতনের পরে ইয়াহইয়া এলেন। ইয়াহইয়া খান সাহেব বললেন, দেশে শাসনতন্ত্র দেবেন–আমরা মেনে নিলাম। তারপর অনেক ইতিহাস হয়ে গেল, নির্বাচন হল। প্রেসিডেন্ট ইয়াহইয়া খান সাহেবের সংগে দেখা করেছি। আমি, শুধু বাংলার নয়, পাকিস্তানের মেজরিটি পার্টির নেতা হিসাবে তাঁকে অনুরোধ করেছিলাম, ১৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখে আমাদের জাতীয় পরিষদের অধিবেশন দিন। তিনি আমার কথা রাখলেন না, রাখলেন ভূট্টো সাহেবের কথা। তিনি বললেন, মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে সভা হবে। আমি বললাম ঠিক আছে, আমরা এসেম্বলিতে বসবো। আমি বললাম, এসেম্বলির মধ্যে আলোচনা করবো– এমনকি এ পর্যন্তও বললাম, যদি কেউ ন্যায্য কথা বলে, আমরা সংখ্যায় বেশি হলেও একজনের মতও যদি তা ন্যায্য কথা হয়, আমরা মেনে নেব।

ভূট্টো সাহেব এখানে ঢাকায় এসেছিলেন, আলোচনা করলেন। বলে গেলেন, আলোচনার দরজা বন্ধ নয়, আরো আলোচনা হবে। তারপর অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে আমরা আলোচনা করলাম–আলাপ করে শাসনতন্ত্র তৈরি করবো–সবাই আসুন বসুন। আমরা আলাপ করে শাসনতন্ত্র তৈরি করবো।

www.pathagar.com

তিনি বললেন, পশ্চিম পাকিস্তানের মেম্বার যদি আসে তাহলে কসাইখানা হবে এসেম্বলি। তিনি বললেন, যে যে যাবে তাদের মেরে ফেলে দেয়া হবে, যদি কেউ এসেম্বলিতে আসে পেশোয়ার থেকে করাচি পর্যন্ত সব জোর করে বন্ধ করা হবে। আমি বললাম, এসেম্বলি চলবে। আর হঠাৎ মার্চের ১ তারিখ এসেম্বলি বন্ধ করে দেয়া হলো।

ইয়াহইয়া খান প্রেসিডেন্ট হিসেবে এসেম্বলি ডেকেছিলেন। আমি বললাম, আমি যাব। ভূট্টো বললেন, যাব না। ৩৫ জন সদস্য পশ্চিম পাকিস্তান থেকে এলেন। তারপর হঠাৎ করে বন্ধ করে দেয়া হলো, দোষ দেয়া হলো বাংলার মানুষের, দোষ দেয়া হলো আমাকে। দেশের মানুষ প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠল।

আমি বললাম, আপনারা শান্তিপূর্ণভাবে হরতাল পালন করুন। আমি বললাম, আপনারা কলকারখানা সব কিছু বন্ধ করে দেন। জনগণ সাড়া দিল। আপন ইচ্ছায় জনগণ রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল, সংগ্রাম চালিয়ে যাবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলো। আমি বললাম, আমরা জামা কেনার পয়সা দিয়ে অস্ত্র পেয়েছি বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করবার জন্য, আজ সেই অস্ত্র আমার দেশের গরীব-দুঃখী মানুষের বিরুদ্ধে–তার বুকের উপর হচ্ছে গুলি। আমরা পাকিস্তানে সংখ্যাগুরু, আমরা বাঙালীরা যখনই ক্ষমতায় যাবার চেষ্টা করেছি, তখনই তারা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

আমি বলেছিলাম, জেনারেল ইয়াহইয়া খান সাহেব, আপনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট, দেখে যান কিভাবে আমার গরীবের উপর, আমার বাংলার মানুষের বুকের উপর গুলি করা হয়েছে। কিভাবে আমার মায়ের কোল খালি করা হয়েছে, কি করে মানুষকে হত্যা করা হয়েছে, আপনি আসুন, আপনি দেখুন। তিনি বললেন, আমি ১০ তারিখে রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স ডাকবো।

আমি বলেছি, কিসের এসেম্বলি বসবে। কার সঙ্গে কথা বলবো। আপনারা যারা আমার মানুষের বুকের রক্ত নিয়েছেন, তাদের সঙ্গে কথা বলবো? পাঁচ ঘন্টার গোপন বৈঠকে সমস্ত দোষ তারা আমাদের উপর, বাংলার মানুষের উপর দিয়েছেন। দায়ী আমরা!

২৫ তারিখে এসেম্বলি ডেকেছে! রক্তের দাগ শুকায় নাই। ৬ তারিখে বলেছি, রক্তে পাড়া দিয়ে, শহীদের উপর পাড়া দিয়ে এসেম্বলি খোলা চলবে না। সামরিক আইন মার্শাল ল' withdraw করতে হবে। সমস্ত সামরিক বাহিনীর লোকদের ব্যারাকের ভেতর ঢুকাতে হবে। যে ভাইদের হত্যা করা হয়েছে, তার তদন্ত করতে হবে। আর জনগণের প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। তারপর বিবেচনা করে দেখব আমরা এসেম্বলিতে বসতে পারবো কি পারবো না। এর পূর্বে এসেম্বলিতে আমরা বসতে পারি না।

আমি প্রধানমন্ত্রীত্ব চাই না। দেশের মানুষের অধিকার চাই। আমি পরিষ্কার

www.pathagar.com

অক্ষরে বলে দিবার চাই যে, আজ থেকে এই বাংলাদেশে কোর্ট-কাচারী, আদালত- ফৌজদারী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ থাকবে। গরীবের যাতে কষ্ট না হয়, যাতে আমার মানুষ কষ্ট না করে সে জন্য যে সমস্ত অন্যান্য জিনিসগুলি আছে, সেগুলির হরতাল কাল থেকে চলবে না। রিকশা, গরুর গাড়ী, রেল চলবে-শুধু সেক্রেটারিয়েট, সুপ্রিম কোর্ট, হাইকোর্ট, জজকোর্ট, সেমি গভর্নমেন্ট দপ্তর, ওয়াপদা– কোন কিছু চলবে না। ২৮ তারিখে কর্মচারীরা গিয়ে বেতন নিয়ে আসবেন। এরপর যদি বেতন না দেয়া হয়, এরপর যদি ১টি গুলি চলে, এরপর যদি আমার লোককে হত্যা করা হয়– তোমাদের কাছে অনুরোধ রইল, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মুকাবিলা করতে হবে এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সবকিছু, আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি, তোমরা বন্ধ করে দেবে। আমরা ভাতে মারবো, আমরা পানিতে মারবো। সৈন্যরা, তোমরা আমার ভাই, তোমরা ব্যারাকে থাক, তোমাদের কেউ কিছু বলবে না। কিন্তু আর তোমরা গুলি করবার চেষ্টা করো না। সাত কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না। আমরা যখন মরতে শিখেছি, তখন কেউ আমাদের দাবায়ে রাখতে পারবা না।

আর যে সমস্ত লোক শহীদ হয়েছে, আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে, আমরা আওয়ামী লীগের থেকে যদ্দুর পারি সাহায্য করতে চেষ্টা করব। যারা পারেন আওয়ামী লীগ অফিসে সামান্য টাকা পযসা পৌঁছে দেবেন। আর ৭ দিন হরতালে শ্রমিক ভাইয়েরা যোগদান করেছে- প্রত্যেক শিল্পের মালিক তাদের বেতন পৌঁছে দেবেন। সরকারী কর্মচারীদের বলি, আমি যা বলি তা মানতে হবে। যে পর্যন্ত আমার এই দেশের মুক্তি না হচ্ছে, ততদিন ওয়াপদা ট্যাক্স বন্ধ করে দেওয়া হলো- কেউ দেবে না। শুনুন, মনে রাখুন, শত্রু পেছনে ঢুকেছে, নিজেদের মধ্যে আত্মকলহ সৃষ্টি করবে, লুটতরাজ করবে। এই বাংলায় হিন্দু-মুসলমান যারা আছে আমাদের ভাই, বাঙালী-অবাঙালী– তাদের রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের উপর, আমাদের যেন বদনাম না হয়। মনে রাখবেন, কর্মচারীরা রেডিও যদি আমাদের কথা না শুনে তাহলে কোন বাঙালী রেডিও স্টেশনে যাবে না। যদি টেলিভিশন আমাদের নিউজ না দেয়, তাহলে টেলিভিশনে যাবেন না। ২ ঘণ্টা ব্যাংক খোলা থাকবে যাতে মানুষ তাদের মাইনেপত্র নিতে পারে। পূর্ব বাংলা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে এক পয়সাও চালান হতে পারবে না। টেলিফোন, টেলিগ্রাম আমাদের এই পূর্ব বাংলায় চলবে এবং বাংলাদেশের নিউজ বাইরে পাঠানো চলবে।

এই দেশের মানুষকে খতম করার চেষ্টা চলছে। বাঙালীরা বুঝে-সুঝে কাজ

www.pathagar.com

করবেন। প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম কমিটি গড়ে তুলুন। এবং আমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকুন। রক্ত যখন দিয়েছি, আরও দেব। এই দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাআল্লাহ। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা।"[১৩]

এই ভাষণে শেখ মুজিবুর রহমান মূলত চারটি দাবি তুলে ধরেন। এক. সামরিক শাসন তুলে নিতে হবে। দুই. সামরিক বাহিনীর লোকদেরকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নিতে হবে। তিন. গুলি চালিয়ে মানুষ হত্যার বিষয়টি তদন্ত করতে হবে। চার. জনপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে।

৭ই মার্চের ভাষণের পর তীব্র অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। ৮ই মার্চ থেকে পূর্ব পাকিস্তানের ঢাকাসহ সকল শহর-গঞ্জে অফিস-আদালত, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়, স্বায়ত্বশাসিত, আধাস্বায়ত্বশাসিত, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং কলকারখানার কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। কেবল অত্যাবশ্যকীয় সেবাদানমূলক প্রতিষ্ঠান– ব্যাংক-বীমা, পানি-বিদ্যুৎ, হাসপাতাল, মেডিকেল-ক্লিনিক খোলা রাখা হয়।

৮ই মার্চ "স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ"-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় সিদ্ধান্ত হয় যে প্রত্যেক জিলা শহর থেকে প্রাথমিক শাখা পর্যন্ত শাখার সভাপতিকে আহ্বায়ক, সাধারণ সম্পাদককে সম্পাদক এবং আরো নয়জন সদস্যসহ মোট এগারো জনকে নিয়ে "স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ" গঠন করা হবে। এই সভাতেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন পরিচালনার দায়িত্ব "স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ" সদস্যদের ওপর অর্পণ করা হয়।

অতপর পাকিস্তানী সৈন্যদের সাথে লড়াই করার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের ট্রেনিং নেওয়া শুরু হয়।

পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর এডমিরাল আহসান এবং মার্শাল ল' এডমিনিস্ট্রেটর

---

১৩. এম. এ. ওয়াজেদ মিয়া, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ঘিরে কিছু ঘটনা ও বাংলাদেশ, পরিশিষ্ট-২, পৃষ্ঠা : ৪৬৫-৪৬৭।

www.pathagar.com

সাহেবজাদা ইয়াকুব খানের স্থলে গভর্ণর এবং মার্শাল ল' এডমিনিস্ট্রেটর পদে নিযুক্তি দিয়ে পাঠানো হয় লে. জেনারেল টিক্কা খানকে।

৯ই মার্চ পূর্ব পাকিস্তান হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি বি.এ. সিদ্দিকী লে. জেনারেল টিক্কা খানকে গভর্ণর হিসেবে শপথ পড়াতে অস্বীকৃতি জানান।

৯ই মার্চ পল্টন ময়দানে ছিলো মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী-এর নেতৃত্বাধীন ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির জনসভা। আবদুল হামিদ খান ভাসানী তাঁর বক্তৃতায় বলেন,

> 'সাত কোটি বাঙালীর মুক্তি ও স্বাধীনতার সংগ্রামকে কেউ দাবিয়ে রাখতে পারবে না। পূর্ব বাংলাকে একটি পৃথক রাষ্ট্র বলে স্বীকৃতি দেওয়ার মাধ্যমে দেশের দু' অঞ্চলের তিক্ততার অবসান হতে পারে। সংহতি এখন অতীতের স্মৃতি এবং কোন শক্তিই এখন বাংলার পৃথক রাষ্ট্র হিসেবে বাঁচার অধিকারকে নস্যাত করতে পারবে না। দুই পাকিস্তান হলে সৌহার্দ বৃদ্ধি পাবে, ব্যবসায় ও সাংস্কৃতিক সম্পর্কের উন্নতি হবে।.....বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের সাথে কেউ আপোস করতে পারে না। আপোসের দিন শেষ হয়ে গেছে। শেখ মুজিব বঙ্গবন্ধু বা যেই বন্ধুই হোক না কেন আপোস করতে গেলে পিঠের চামড়া খুলে ফেলবো।'[১৪]

পল্টন ময়দানে এই জনসভায় আতাউর রহমান খানও বক্তৃতা করেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, 'ভানুমতির খেলা শুরু হয়েছে। চারদিকে ষড়যন্ত্রের জাল ফেলা হয়েছে। এই ষড়যন্ত্রের জাল ভেদ করতে হবে। কাজেই আপনি পরিষদের কথা ভুলে যান এবং জাতীয় সরকার ঘোষণা করুন।'

৯ই মার্চ পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম একটি বিবৃতির মাধ্যমে বলেন,

> 'অধিবেশনের পুনঃআহ্বান স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে ব্যর্থ হয়েছে। বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থা মোটেই শাসনতন্ত্র প্রণয়নের পক্ষে অনুকূল নয়। যদি ২৩ বছর যাবত শাসনতন্ত্র ছাড়াই দেশকে পরিচালনা করা সম্ভব হয়ে থাকে, তবে আমাদের আরো কিছুকাল অপেক্ষা করা উচিত। শাসনতন্ত্র প্রণয়নের অজুহাতে ক্ষমতা হস্তান্তরে গড়িমসি করার কোন যুক্তি নেই। বর্তমানে শেখ মুজিবুর রহমানই কার্যত দেশের প্রশাসক এবং সরকারী কর্মচারীসহ সকলেই একমাত্র তাঁর নির্দেশই পালন করছে। ..... আমি অতি

---

১৪. দৈনিক পাকিস্তান, ১০ই মার্চ, ১৯৭১।

www.pathagar.com

সত্বর সামরিক আইন প্রত্যাহার এবং জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করার জন্য আমার পূর্ব দাবির পুনরুল্লেখ করছি।'[১৫]

লে. জেনারেল টিক্কা খান পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক আইন প্রশাসকের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন, কিন্তু কোন পরিবর্তন আনতে পারলেন না।

১৩ই মার্চ তিনি এক সামরিক আদেশ বলে সামরিক বিভাগে কর্মরত বেসামরিক ব্যক্তিদেরকে ১৫ই মার্চ যথারীতি কাজে যোগ দিতে নির্দেশ দেন। আদেশে আরো বলা হলো যে কাজে যোগ না দিলে কেবল চাকুরিই যাবে না, সামরিক আদালতের বিচারে সর্বোচ্চ দশ বছর সশ্রম কারাদণ্ডও দেওয়া হবে। কিন্তু এই নির্দেশে কোন ফায়দা হলো না।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহইয়া খান ও শেখ মুজিবুর রহমান সংলাপ

১৯৭০ সনের নির্বাচনে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটার শেখ মুজিবুর রহমানকে ১৬০টি আসনে বিজয়ী করে তাঁকে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার গঠন এবং গোটা দেশ পরিচালনার হকদার বানিয়ে দেয়। সংগত কারণেই শেখ মুজিবুর রহমান এই অধিকারের দাবিতে অনড় অবস্থান গ্রহণ করেন। ওদিকে আত্মম্ভরী জুলফিকার আলী ভূট্টোর পক্ষে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন সরকারে অন্যতম মন্ত্রী হওয়া কিংবা বিরোধী দলের নেতার আসনে বসা একেবারেই অসহনীয় ছিলো বলে মনে হয়।

অসহযোগ আন্দোলনের ফলে পূর্ব পাকিস্তানে কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ একেবারেই সীমাবদ্ধ হয়ে গেলো। একজন জেনারেল হয়ে প্রেসিডেন্ট ইয়াহইয়া খানের পক্ষে এই অবস্থা মেনে নেওয়া সম্ভব হচ্ছিলো না।

তারপরও পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনীতিবিদদের বিরাট অংশ জাতীয় পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজয়ী আওয়ামী লীগের নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি করায় প্রেসিডেন্ট ইয়াহইয়া খান একদিকে জুলফিকার আলী ভূট্টো, অপরদিকে শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে সংলাপের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন।

---

১৫. দৈনিক সংগ্রাম, ১০ই মার্চ, ১৯৭১।

www.pathagar.com

১৯৭১ সনের ১৫ই মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহইয়া খান ঢাকা আসেন।

১৬ই মার্চ সকাল ১১টায় প্রেসিডেন্ট ইয়াহইয়া খান ও শেখ মুজিবুর রহমানের মধ্যে প্রথম দফা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। আড়াই ঘন্টা ধরে আলোচনা চলে। আলোচনা শেষে গেটে আসলে তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন। এক সাংবাদিকের প্রশ্নের জওয়াবে তিনি বলেন, 'দেশের রাজনৈতিক ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে প্রেসিডেন্টের সাথে তাঁর আলোচনা হয়েছে। আরেক প্রশ্নের জওয়াবে তিনি বলেন, 'মেহেরবানী করে এর বেশি কিছু জিজ্ঞেস করবেন না। এটা দু'এক মিনিটের ব্যাপার নয়। এজন্য পর্যাপ্ত আলোচনার প্রয়োজন আছে।'

ঐ দিনই সকালে মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী চট্টগ্রামে বললেন, 'শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। এ ধরনের ঘোষণা সম্পর্কে জনগণের মধ্যে কোনরূপ মতানৈক্য থাকতে পারে না। ..... প্রেসিডেন্ট ইয়াহইয়া এবং শেখ মুজিবুর রহমানের মধ্যে আপোসের কোন প্রশ্ন উঠতে পারে না।'

১৭ই মার্চ সকাল ১০টা ৫মিনিট প্রেসিডেন্ট ইয়াহইয়া খান এবং শেখ মুজিবুর রহমানের মধ্যে দ্বিতীয় দফা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বাইরে এসে শেখ মুজিবুর রহমান সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন। তিনি বলেন, 'আলোচনা এখনো অব্যাহত রয়েছে এবং আমাদের মধ্যে আরো আলোচনা হতে পারে। তবে সময় নির্ধারিত হয়নি।'

১৭ই মার্চ পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম এক বিবৃতিতে বলেন,

> 'আমি পরিস্থিতি অনুধাবন করা এবং যেই দলের প্রতি জনগণ পূর্ণ আস্থা স্থাপন করেছে, সেই দলের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় কাজ সমাপ্ত করার জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহইয়ার প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। কোন শাসনতান্ত্রিক সমস্যাই ক্ষমতা হস্তান্তরকে বিলম্বিত করতে পারবে না। জনগণের সরকারের চেয়ে কেউই জাতির উত্তম সেবা করতে পারে

www.pathagar.com

না।..... আমি জনাব ভূট্টোর অসৎ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রয়াসের প্রতি প্রেসিডেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।'[১৬]

১৮ই মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহইয়া খান ও শেখ মুজিবুর রহমানের মধ্যে কোন বৈঠক হয়নি। তবে শেখ মুজিবুর রহমান একটি বিবৃতির মাধ্যমে সামরিক বাহিনী তলব করার বিষয়ে তদন্তের জন্য সামরিক সরকার কর্তৃক গঠিত কমিশন প্রত্যাখান করেন এবং কমিশনের সাথে সহযোগিতা না করার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানান। বিবৃতিতে তিনি বলেন, 'তথাকথিত কমিশন গঠনের যে ঘোষণা করা হয়েছে, তা বাংলাদেশের তরফ থেকে উত্থাপিত দাবিকে সন্তুষ্ট করতে সক্ষম হয়নি। সামরিক আইন আদেশের মাধ্যমে এর গঠন এবং সামরিক কর্তৃপক্ষের কাছে এর রিপোর্ট পেশের বিধানও অত্যন্ত আপত্তিকর। তাছাড়া কমিশনের এখতিয়ারভুক্ত বিষয়াবলীতেও সর্বাপেক্ষা মৌলিক প্রশ্নকে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে।'

এই সাথে শেখ মুজিবুর রহমান কী পরিস্থিতিতে সেনাবাহিনী কর্তৃক গুলি বর্ষণের ঘটনা ঘটেছিলো, তা সরেজমিনে তদন্ত করে রিপোর্ট দেওয়ার জন্য খন্দকার মুশতাক আহমদ, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী এবং আবিদুর রেজা খানকে চট্টগ্রামে পাঠান।

১৮ই মার্চ জুলফিকার আলী ভূট্টো করাচিতে দলের শীর্ষ নেতাদের সাথে আলোচনার পর সাংবাদিকদের জানান, প্রেসিডেন্ট ইয়াহইয়া খান শাসনতান্ত্রিক বিষয়ে আলোচনার জন্য ঢাকা সফরের যেই আহ্বান জানিয়েছেন তা তিনি রক্ষা করতে পারছেন না।..... তিনি কতিপয় বিষয়ের ব্যাখ্যা চেয়েছেন। কিন্তু এই পর্যন্ত ঢাকা থেকে কোন বক্তব্য পাওয়া যায়নি। এই অবস্থায় আগামীকাল তিনি যদি ঢাকা যান, তাতে কোন লাভ হবে বলে তিনি মনে করেন না।'

১৯শে মার্চ সকাল ১০টায় প্রেসিডেন্ট ভবনে প্রেসিডেন্ট ইয়াহইয়া খান এবং শেখ মুজিবুর রহমানের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয় তৃতীয় দফা বৈঠক। বৈঠক চলে

---

১৬. দৈনিক সংগ্রাম, ১৮ই মার্চ, ১৯৭১।

www.pathagar.com

দেড় ঘন্টা ধরে। পরে সাংবাদিকদের সাথে আলোচনাকালে শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, 'প্রেসিডেন্টের সাথে তিনি রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং তাঁদের মধ্যে আলোচনা অব্যাহত রয়েছে।'

১৯শে মার্চ সন্ধ্যায় প্রেসিডেন্ট ইয়াহইয়া খানের তিন উপদেষ্টা বিচারপতি এ.আর. কর্ণেলিয়াস, লে. জেনারেল পীরজাদা এবং কর্ণেল হাসানের সাথে শেখ মুজিবুর রহমানের তিন প্রতিনিধি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমদ ও ড. কামাল হোসেনের দুই ঘণ্টাব্যাপী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

২০ শে মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহইয়া খান এবং শেখ মুজিবুর রহমানের মধ্যে প্রথমবারের মতো তাঁদের উপদেষ্টাদেরকে নিয়ে দুই ঘণ্টা দশ মিনিট বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। প্রেসিডেন্ট ইয়াহইয়া খানের সাথে ছিলেন বিচারপতি এ.আর. কর্ণেলিয়াস, লে. জেনারেল পীরজাদা ও কর্ণেল হাসান। শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে ছিলেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমদ, খন্দকার মুশতাক আহমদ, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী, এ.এইচ. এম. কামারুজ্জামান ও ড. কামাল হোসেন।

আলোচনা শেষে বাসায় ফিরে শেখ মুজিবর রহমান অপেক্ষমান সাংবাদিকদের বলেন, 'আলোচনায় কিছু অগ্রগতি হয়েছে।'

২০শে মার্চ করাচিতে এক তড়িঘড়ি সাংবাদিক সম্মেলনে জুলফিকার আলী ভূট্টো বলেন যে গতকাল গভীর রাতে অবিলম্বে ঢাকা যাওয়ার জন্য তিনি প্রেসিডেন্টের নিকট থেকে একটি আমন্ত্রণ পেয়েছেন এবং পরদিন তিনি ঢাকা রওয়ানা হওয়ার মনস্থ করেছেন।

২০শে মার্চ শেখ মুজিবুর রহমান ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপে লিপ্ত ব্যক্তিদের ক্ষতিকর উত্তেজনা সৃষ্টির বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন এবং সুশৃংখল ও শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন চালিয়ে যাবার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।

২২শে মার্চ সকাল ১১টার দিকে প্রেসিডেন্ট ভবনে প্রেসিডেন্ট ইয়াহইয়া খান, শেখ মুজিবুর রহমান এবং জুলফিকার আলী ভূট্টোর একটি গুরুত্বপূর্ণ মিটিং হয়।

www.pathagar.com

মিটিং চলাকালেই প্রেসিডেন্টের জনসংযোগ অফিসার অপেক্ষমান সাংবাদিকদের জানান যে প্রেসিডেন্ট ২৫ শে মার্চ আহুত জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করেছেন। দেশের উভয় অংশের নেতাদের সাথে পরামর্শ করে এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মধ্যে সমঝোতার ক্ষেত্র সম্প্রসারণের সুবিধার্থে প্রেসিডেন্ট এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তিন নেতার এই বৈঠক চলে ৭৫ মিনিট ধরে।

বৈঠক শেষে বাসভবনে ফিরে শেখ মুজিবুর রহমান সাংবাদিকদের বলেন, প্রেসিডেন্টের সাথে তিনি যেইসব আলোচনা করেছেন, সেইসব প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভূট্টোকে অবহিত করেছেন। আলোচনার অগ্রগতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়ে শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, 'যদি কোন অগ্রগতি না হতো, তাহলে আমি কেন আলাপ-আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছি?'

২২শে মার্চ সন্ধায় ঢাকায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে জুলফিকার আলী ভূট্টো বলেন, 'দেশের বর্তমান দুর্ভাগ্যজনক রাজনৈতিক সংকট নিরসনের জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহইয়া খান এবং শেখ মুজিবুর রহমান ব্যাপক সমঝোতা ও মতৈক্যে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছেন। সমঝোতার শর্তগুলো তাঁর দল পরীক্ষা করে দেখছে।'

২৩শে মার্চ ছিলো পাকিস্তান দিবস। এই দিন সরকারী-বেসরকারী ভবনগুলোতে পাকিস্তানের পতাকা উড়ার কথা। কিন্তু প্রেসিডেন্ট ভবন এবং সেনা ছাউনি ছাড়া আর কোথাও পাকিস্তানের পতাকা উড়েনি।

উল্লেখ্য, ২৩শে মার্চকে শেখ মুজিবুর রহমান 'লাহোর প্রস্তাব দিবস' আর "স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ" 'প্রতিরোধ দিবস' ঘোষণা করে।

ভোরে শ্রমিক নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে ছাত্রদের দ্বারা শেখ মুজিবুর রহমানের বাসভবনে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়।

২৩শে মার্চ একটি গাড়িতে করে আওয়ামী লীগের একটি টিম প্রেসিডেন্ট ভবনে প্রবেশ করে। ঐ গাড়িতে লাগানো ছিলো বাংলাদেশের পতাকা। ঐ পতাকা ওখানে কর্মরত ব্যক্তিদের মাঝে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

"স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ"-এর আহ্বানে বৃটেন ও সোভিয়েত

www.pathagar.com

ইউনিয়নের দূতাবাস বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করে। কিন্তু ইরান, চীন, নেপাল ও ইন্দোনেশিয়ার দূতাবাস পাকিস্তানী পতাকা উত্তোলন করে। "স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ" সদস্যরা এসব দূতাবাসে গিয়ে পাকিস্তানী পতাকা নামিয়ে বাংলাদেশের পতাকা লাগিয়ে দেয়।

২৪শে মার্চ প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টা এবং শেখ মুজিবুর রহমানের উপদেষ্টাদের একটি মিটিং হয়।

মিটিং শেষে তাজউদ্দীন আহমদ সাংবাদিকদের বলেন, উক্ত মিটিংয়ে তাঁরা তাঁদের সকল মতামত ব্যক্ত করেছেন। সেই জন্য তাঁদের দিক থেকে আর কোন মিটিংয়ের প্রয়োজন নেই। তাজউদ্দিন আহমদ আরো বলেন, 'সিদ্ধান্ত ঘোষণা করতে আর কালবিলম্ব করলে অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটবে।'

২৪শে মার্চ শেখ মুজিবুর রহমানের বাসভবনে কমপক্ষে ৪০টির মতো মিছিল আসে। বাসভবনের সামনের একটি সমাবেশে তিনি বলেন,

> 'আমাদের দাবি ন্যায়সংগত এবং স্পষ্ট। এইগুলো গ্রহণ করতেই হবে। জনগণ জেগে উঠেছে এবং তারা ঐক্যবদ্ধ। পৃথিবীর কোন শক্তিই তাদের দাবি দাবিয়ে রাখতে পারবে না। ..... আমরা শান্তিপূর্ণ সমাধান চাই, কিন্তু কেউ যদি তা না চায়, তাহলে তুমি তাদের দমিয়ে দিতে পারবে না। আমি আশা করি কেউ সে চেষ্টা করবেন না। লক্ষ্য অর্জন না হওয়া পর্যন্ত আমাদের সংগ্রাম চলবে, বাংলাদেশের মানুষের মুক্তি ও তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম অব্যাহত থাকবে।'[১৭]

প্রেসিডেন্ট ইয়াহইয়া খান এবং শেখ মুজিবুর রহমানের সংলাপে কী কী বিষয় আলোচিত হচ্ছে সেই সম্পর্কে একদিকে আওয়ামী লীগ, অন্যদিকে সরকার কিছুই বলছিলো না। গোটা জাতি অন্ধকারেই থাকতে বাধ্য হয়।

পরবর্তীতে জানা যায় যে আওয়ামী লীগের উপস্থাপিত প্রস্তাবগুলোর ওপরই আলোচনা কেন্দ্রীভূত ছিলো। প্রস্তাবগুলো ছিলো : অনতিবিলম্বে সামরিক শাসন প্রত্যাহার করে কোন রকমের পরিবর্তন ছাড়াই পাঁচটি প্রদেশের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা এবং আপাতত রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে জেনারেল ইয়াহইয়া

---

১৭. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৭৮২।

www.pathagar.com

খানের নেতৃত্বে একটি কেন্দ্রীয় সরকার বহাল রাখা। শাসনতন্ত্র প্রণয়নের ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ প্রস্তাব করলো যে, গোড়াতেই জাতীয় পরিষদকে দুইটি কমিটিতে ভাগ করতে হবে। দুইটি কমিটি গঠিত হবে পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদ সদস্যদের সমন্বয়ে। কমিটি দুইটি ইসলামাবাদ ও ঢাকাতে বৈঠক করে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পৃথক পৃথক রিপোর্ট তৈরি করবে। এরপর দুইটি রিপোর্ট নিয়ে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসবে এবং রিপোর্ট দুইটির মধ্যে একটি আপোস ফর্মুলা বের করে আনার চেষ্টা করবে।

তবে এই প্রস্তাবগুলো মেনে নেওয়া মোটেই সহজ ব্যাপার ছিলো না। সামরিক আইন তুলে নিলে ইয়াহইয়া সরকারের আইনগত বৈধতা থাকতো না এবং প্রদেশগুলো স্বাধীন সত্তা দাবি করার ব্যাপারে অবাধ অধিকার লাভ করতো।

২৪ মার্চ আওয়ামী লীগ একটি নতুন প্রস্তাব নিয়ে এগিয়ে আসে। আগের শাসনতান্ত্রিক কমিটির প্রস্তাব পরিত্যাগ করে শাসনতান্ত্রিক কনভেনশনের প্রস্তাব দেয়। এই কনভেনশন পূর্ব পাকিস্তান এবং পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য পৃথক দুইটি শাসনতন্ত্র তৈরি করবে। জাতীয় পরিষদ এই দুইটি শাসনতন্ত্র নিয়ে বৈঠকে বসবে। দুইটির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে পাকিস্তানকে একটি কনফেডারেশনে পরিণত করবে।

ঐদিন সন্ধ্যায় আওয়ামী লীগের জেনারেল সেক্রেটারী তাজউদ্দিন আহমদ ঘোষণা করলেন, তাঁর দল চূড়ান্ত প্রস্তাব পেশ করেছে এবং এতে নতুন কিছু সংযোজন কিংবা সমঝোতামূলক কিছু করার নেই।

আওয়ামী লীগের সর্বশেষ উপস্থাপিত প্রস্তাবের ভিত্তিতে একটি চূড়ান্ত মিটিংয়ের প্রত্যাশা করছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। কিন্তু সেই প্রত্যাশিত মিটিংয়ের ডাক এলো না।

২৫শে মার্চ সন্ধ্যায় প্রেসিডেন্ট ইয়াহইয়া খান ঢাকা ত্যাগ করেন।

মার্চ মাসের গোড়ার দিকে আমীরে জামায়াত সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী বলেছিলেন, 'জাতীয় পরিষদের বাইরে শাসনতান্ত্রিক সমস্যার সমাধান করতে চাওয়া' একটি ভুল পদক্ষেপ।

www.pathagar.com

শেখ মুজিবুর রহমান প্রেসিডেন্ট ইয়াহইয়া খানের সংলাপের আহ্বানে সাড়া দিয়ে ভুল করেননি। কিন্তু জাতীয় পরিষদের বাইরে শাসনতান্ত্রিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি ভুল করেছেন। গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত 'জনপ্রিতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর'-এর দাবিটিতেই তাঁর অনড় থাকা উচিত ছিলো এবং প্রেসিডেন্ট ইয়াহইয়া খানের মাধ্যমে জুলফিকার আলী ভূট্টোকে জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগদানে রাজি করানো অথবা তাঁকে বাদ দিয়েই জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনুষ্ঠানের দাবিতে অনড় থাকা প্রয়োজন ছিলো। জাতীয় পরিষদের বাইরে শাসনতান্ত্রিক সদস্যার সমাধান খুঁজতে গিয়ে তিনি এমন এক আবর্তে পড়ে গেলেন যেখান থেকে উঠে আসা তাঁর পক্ষে আর সম্ভব হয়নি।

১৯৭১ সনের ২৫শে মার্চের আর্মি এ্যাকশন

২৫শে মার্চ রাত সাড়ে দশটায় ড. কামাল হোসেন শেখ মুজিবুর রহমানের কাছ থেকে বাসায় ফেরার জন্য উঠলে শেখ মুজিবুর রহমান জানতে চান প্রেসিডেন্ট ইয়াহইয়া খানের অন্যতম উপদেষ্টা লে. জেনারেল পীরজাদার কাছ থেকে তিনি কোন টেলিফোন কল পেয়েছেন কিনা। ড. কামাল হোসেন জানান যে তিনি কোন কল পাননি।

এই সময়টাতেও শেখ মুজিবুর রহমান পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে তাঁর সাথীদের কোন নির্দেশ দেননি। তাঁর পক্ষ থেকে প্রতিরোধ কিংবা মুক্তি আন্দোলনের কোন নির্দেশিকা উচ্চারিত হয়নি।

রাত সাড়ে দশটার দিকে একটি সেনা ইউনিট ঢাকা রেডিও স্টেশন ও টেলিভিশন সেন্টারের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। বিভিন্ন সেনা ইউনিট পিলখানা (ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস-এর হেড কোয়ার্টারস) এবং রাজারবাগ পুলিশ লাইনসে হামলা চালিয়ে বহুসংখ্যক লোককে হতাহত করে সেইগুলো দখল করে নেয়। ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন স্থানে হামলা চালিয়ে ত্রাস সৃষ্টি করা হয়। সার্জেন্ট জহুরুল হক হলে হামলা চালিয়ে বেশ কয়েকজন ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বাসভবনে ঢুকে এগারো জন শিক্ষককে হত্যা করা হয়। রাত এগারোটার

www.pathagar.com

পর থেকে রাজধানীর সাথে দেশের সকল অংশের টেলিযোগাযোগ বন্ধ করে দেয়া হয়। দেশের অন্যত্র ইস্ট বেংগল রেজিমেন্ট এবং ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস-এর ওপর অনুরূপ হামলা চালানো হয়।

রাত ১টা থেকে দেড়টার মধ্যে শেখ মুজিবুর রহমানকে তাঁর ধানমন্ডির বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে নিয়ে যাওয়া হয়। ভোর পাঁচটার দিকে মাইকে ঘোষণা করা হয় যে সারা শহরে কারফিউ জারি করা হয়েছে। কেউ বাইরে এলে গুলি করা হবে।

২৬শে মার্চ রেডিওর মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট ইয়াহইয়া খান জাতির উদ্দেশ্যে এক ভাষণ দেন। সেই ভাষণে তিনি বলেন,

'পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ কর্তৃক পরিচালিত অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলন মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। অবস্থার দ্রুত অবনতি হতে থাকে এবং যতোশীঘ্র সম্ভব পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে। এই লক্ষ্যেই আমি পশ্চিম পাকিস্তানের নেতাদের সাথে কথা বলি এবং ১৫ই মার্চ আমি ঢাকা যাই।

আপনারা জানেন, রাজনৈতিক অচলাবস্থা নিরসনের জন্য আমি শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে বেশ কয়েকটি মিটিং করি। পশ্চিম পাকিস্তানের নেতাদের সাথে আলোচনার পর এটা করা প্রয়োজন ছিলো যাতে মতৈক্যের ভিত্তি চিহ্নিত করা যায় এবং একটি সন্তোষজনক সমাধানে পৌঁছা যায়।.....পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থিত সেনাবাহিনী বিদ্রূপ ও অপমানের শিকার হয়।..... কয়েক সপ্তাহ আগেই আমি শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর সহযোগীদের বিরুদ্ধে এ্যাকশন নিতে পারতাম, কিন্তু শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর বিষয়ে আমার পরিকল্পনা যাতে বিঘ্নিত না হয় সেই জন্য আমি সর্বাত্মক চেষ্টা করেছি। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য আমার ঐকান্তিক আগ্রহের জন্য আমি একের পর এক সংঘটিত বেআইনী কাজ সহ্য করেছি। এবং একটি যৌক্তিক সমাধানে পৌঁছার জন্য সকল সম্ভাব্য বিকল্প বিবেচনা করেছি। শেখ মুজিবুর রহমানকে যুক্তিপূর্ণ সমাধানে আসার জন্য আমি এবং অন্যান্য রাজনৈতিক নেতৃত্ব যেই প্রয়াস চালিয়েছি তা আমি উল্লেখ করেছি। আমরা কোন প্রয়াসই বাকি রাখিনি। কিন্তু তিনি গঠনমূলকভাবে সাড়া দিতে পারেননি। তদুপরি তিনি এবং তাঁর অনুসারীরা সরকারের কর্তৃত্ব নস্যাত করে চলছিলেন, এমনকি ঢাকায় আমার অবস্থানকালেও। একটি প্রোক্লেমেশন যা তিনি প্রস্তাব আকারে পেশ করেছেন, তা একটি ফাঁদ ছাড়া আর কিছুই ছিলো না।..... তাঁর একগুঁয়েমি, অনমনীয়তা এবং যুক্তিযুক্ত কথা গ্রহণে

www.pathagar.com

অস্বীকৃতি একটি সিদ্ধান্তেই পৌঁছাতে পারে যে এই ব্যক্তি এবং তাঁর পার্টি পাকিস্তানের দুশমন এবং তাঁরা পূর্ব পাকিস্তানকে পুরোপুরি আলাদা করে নিতে চান। তিনি এই দেশের সংহতি ও অখণ্ডতার ওপর আক্রমণ চালিয়েছেন। তাঁর এই অপরাধ শাস্তি না পেয়ে পারে না।

..... তবে দেশে যে পরিস্থিতি বিরাজ করছে তার প্রেক্ষিতে সারাদেশে সকল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ ঘোষণা করছি। আর একটি রাজনৈতিক দল হিসেবে আওয়ামী লীগ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ হলো। আমি সংবাদপত্রের ওপর পূর্ণ সেন্সরশিপ আরোপের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এই সব সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে শিগগিরই বিভিন্ন সামরিক বিধান জারি করা হবে।'[১৮]

ভারতের পার্লামেন্টে প্রস্তাব গ্রহণ

১৯৭১ সনের ৩১শে মার্চ ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গানধি ভারতের পার্লামেন্টে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন যা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। প্রস্তাবটি ছিলো নিম্নরূপ ঃ

'This House expresses its deep anguish and grave concern at the recent developments in East Bengal. A massive attack by armed forces, despatched from West Pakistan, has unleashed against the entire people of East Bengal with a view to suppressing their urges and aspirations.

Instead of respecting the will of the people so unmistakably expressed through the election in Pakistan in December 1970, the Government of Pakistan has chosen to flout the mandate of the people.

The Government of Pakistan has not only refused to transfer power to legally elected representatives but has also arbitrarily prevented the National Assembly from assuming its rightful and sovereign role. The people of East Bengal are being sought to be suppressed by the naked use of force, by bayonets, machine guns, tanks, artillery and aircraft.

The Government of the people of India has always

---

১৮. আবুল আসাদ, কালো পঁচিশের আগে ও পরে, পরিশিষ্ট-৭, পৃষ্ঠা-৩৪৩।

www.pathagar.com

desired and worked for peaceful, normal and fraternal relations with Pakistan. Situated as India is and bound as the people of the sub-continent are by centuries old ties of history, culture and tradition, this House cannot remain indifferent to the macabre tragedy being enacted so close to our border.

Throughout the length and breadth of our land, our people have condemned in unmistakable terms, the atrocities now being perpetrated on an unprecedented scale upon an unarmed and innocent people.

This House expresses its profound sympathy for and solidarity with the people of East Bengal in their struggle for a democratic way of life.

Bearing in mind the permanent interests which India has in peace, committed as we are to uphold and defend human rights, this House demands immediate cessation of the use of force and the massacre of defenseless people.

This House calls upon all peoples and Governments of the world to take urgent and constructive steps to prevail upon the Government of Pakistan to put an end immediately to the systematic decimation of the people which amounts to genocide.'[১৯]

অর্থাৎ 'এই হাউস, ইস্ট বেংগলে সৃষ্ট সাম্প্রতিক ঘটনায় গভীর মর্মবেদনা ও উদ্বেগ প্রকাশ করছে। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে প্রেরিত সেনাবাহিনীকে ইস্ট বেংগল-এর জনগণের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা দমনের জন্য বড়ো আকারের হামলা চালাতে লেলিয়ে দেওয়া হয়েছে।

১৯৭০ সনের নির্বাচনে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে জনগণের যেই রায় প্রকাশ পেয়েছে, তা পাকিস্তান সরকার অবজ্ঞাভরে উড়িয়ে দিতে চাচ্ছে।

পাকিস্তান সরকার কেবল যে বৈধভাবে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে তাই নয়, তারা অযৌক্তিকভাবে জাতীয় পরিষদকে ন্যায়সংগত ও সার্বভৌম ভূমিকা পালনের পথে অন্তরায়

১৯. আবুল আসাদ, কালো পঁচিশের আগে ও পরে, পরিশিষ্ট-৯, পৃষ্ঠা-৩৪৯।

www.pathagar.com

সৃষ্টি করেছে। ইস্ট বেংগল-এর জনগণকে বেয়নেট, মেশিনগান, ট্যাংক, কামান ও বিমান ব্যবহার করে শক্তি প্রয়োগে দমন করার চেষ্টা চালানো হচ্ছে।

ভারতের জনগণের সরকার সব সময়ই কামনা করেছে এবং পাকিস্তানের সাথে শান্তিপূর্ণ, স্বাভাবিক ও ভ্রাতৃসুলভ সম্পর্ক গড়ার চেষ্টা করেছে। ভারতের অবস্থান এবং বহু শতাব্দীর ইতিহাস, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের যেই বন্ধন এই উপমহাদেশের জাতিগুলোর মধ্যে বিরাজমান, সেই প্রেক্ষিতে সীমান্তের এতো নিকটের এই ভয়ংকর শোকাবহ ঘটনার প্রতি ভারত উদাসীন থাকতে পারে না। আমাদের সারাদেশের মানুষ নিরস্ত্র-নিরীহ মানুষের ওপর যেই সীমাহীন নৃশংসতা চলছে তার তীব্র নিন্দা করছে।

এই হাউস ইস্ট বেংগল-এর মানুষের প্রতি, যারা গণতান্ত্রিক জীবন ব্যবস্থার জন্য সংগ্রাম করছে, গভীর সমবেদনা জানাচ্ছে এবং তাদের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করছে।

শান্তির প্রতি ভারতের আগ্রহ, মানবাধিকার সমুন্নত রাখার বিষয়ে ভারতের অংগীকার স্মরণে রেখে, এই হাউস অবিলম্বে শক্তি প্রয়োগ এবং নিরাপত্তাহীন মানুষ নিধন বন্ধ করার দাবি জানাচ্ছে। এই হাউস পৃথিবীর সকল জাতি ও সরকারসমূহের প্রতি দ্রুত ও গঠনমূলক পদক্ষেপ নিয়ে সুপরিকল্পিতভাবে মানুষ হত্যা, যা আসলে গণহত্যা, বন্ধ করার জন্য পাকিস্তান সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টির আহ্বান জানাচ্ছে।'

লক্ষ্য করার বিষয়, এই প্রস্তাবের তিনটি স্থানে "ইস্ট বেংগল" শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কোথাও পূর্ব পাকিস্তান শব্দ ব্যবহার করা হয়নি। এর মাধ্যমে ইস্ট বেংগলের পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্তির প্রতি দি ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের পুরোনো নেতিবাচক মনোভংগিরই প্রকাশ ঘটেছে।

মুক্তিযুদ্ধের সূচনা

আওয়ামী লীগের জেনারেল সেক্রেটারী তাজউদ্দিন আহমদ ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমানের ডান হাত। ২৫শে মার্চ সন্ধ্যার দিকে শেখ মুজিবুর রহমান তাঁকে ঢাকার কোন শহরতলীতে গিয়ে থাকতে বলেন যাতে প্রয়োজনে অল্প সময়ের মধ্যে তাঁরা একত্রিত হতে পারেন। লে. জেনারেল টিক্কা খানের উদ্যোগে আর্মি এ্যাকশন শুরু হলে এবং শেখ মুজিবুর রহমান গ্রেফতার হয়ে গেলে অন্যদের মতো তিনিও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হড়ে পড়েন। ২৭শে মার্চ তিনি ঢাকা ত্যাগ করেন। ফরিদপুর-কুষ্টিয়ার পথে অগ্রসর হয়ে

www.pathagar.com

দেশের সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে পৌঁছেন ৩০শে মার্চ সন্ধ্যায়। নিজের বুদ্ধিতেই তিনি দুইটি লক্ষ্য স্থির করে ফেলেন। এক. পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর প্রচণ্ড আঘাতের কারণে যেই পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে তার হাত থেকে বাংলাদেশের মানুষকে বাঁচানোর একমাত্র উপায় হচ্ছে সশস্ত্র প্রতিরোধ বা মুক্তির লড়াই শুরু করা। দুই. এই মুক্তি লড়াইকে সংগঠিত করার প্রয়োজনে ভারত ও অন্যান্য সহানুভূতিশীল দেশের সহযোগিতা লাভের জন্য অবিলম্বে সচেষ্ট হওয়া।

(ক) 'মুক্তিবাহিনী' গঠন

পঁচিশে মার্চ রাতে আক্রান্ত হয়ে দেশের বিভিন্ন স্থানের ইস্ট বেংগল রেজিমেন্ট, ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস, পুলিশ বাহিনী এবং আনসার বাহিনীর যেইসব সদস্য বন্দিত্ব এড়াতে পেরেছেন কোন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ও নির্দেশ ছাড়াই যে যার মতো লড়াই শুরু করেন। ২৭শে মার্চ চট্টগ্রাম থেকে মেজর জিয়াউর রহমানের স্বাধীনতা ঘোষণা তেমনি একটি স্বত:স্ফূর্ত সিদ্ধান্তের ফল।

মেজর জিয়াউর রহমানের প্রথম বেতার ঘোষণাটি ছিলো নিম্নরূপ :

> "I, Major Ziaur Rahman, Provisional President and Commander–in-Chief of Liberation Army do hereby proclaim independence of Bangladesh and appeal for joining our liberation struggle. Bangladesh is independent. We have waged war for the liberation of Bangladesh. Everybody is requested to participate in the liberation war with whatever we have. We will have to fight and liberate the country from the occupation of Pakistan Army. Inshallah, victory is ours."[20]
>
> 'আমি, মেজর জিয়াউর রহমান, বাংলাদেশের প্রভিশনাল প্রেসিডেন্ট ও লিবারেশন আর্মি চীফ হিসেবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করছি এবং যুদ্ধে অংশ গ্রহণের জন্য আবেদন জানাচ্ছি। বাংলাদেশ স্বাধীন। আমরা স্বাধীনতা যুদ্ধে নেমেছি। আপনারা যে যা পারেন সামর্থ অনুযায়ী অস্ত্র নিয়ে

২০. আরমান আমিন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা, পৃষ্ঠা-৬১।

www.pathagar.com

বেরিয়ে পড়ুন। আমাদেরকে যুদ্ধ করতে হবে এবং পাকিস্তানী বাহিনীকে দেশ ছাড়া করতে হবে। ইনশাল্লাহ, বিজয় আমাদের সুনিশ্চিত।'

৪ঠা এপ্রিল ইস্ট বেংগল রেজিমেন্টের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা কর্ণেল (অব.) মুহাম্মাদ আতাউল গনী ওসমানী, মেজর জিয়াউর রহমান, মেজর খালেদ মোশাররফ, মেজর সফিউল্লাহ, মেজর কাজী নুরুজ্জামান, মেজর নূরুল ইসলাম, মেজর মমিন চৌধুরী প্রমুখ হবিগঞ্জ জিলার মাধবপুর উপজিলার তেলিয়াপাড়া চা বাগানের ম্যানেজার বাংলোতে একটি মিটিংয়ে একত্রিত হন। আলাপ আলোচনার পর সমস্ত ইউনিটের সমন্বয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতার যুদ্ধ পরিচালনার জন্য 'মুক্তি ফৌজ' গঠন করা হয়। 'মুক্তি ফৌজের' প্রধান নির্বাচিত হন কর্ণেল (অব.) মুহাম্মাদ আতাউল গনী ওসমানী।

[চার মাস পর অর্থাৎ জুলাই মাসের শেষ ভাগে 'মুক্তি ফৌজ' নাম বদলিয়ে 'মুক্তি বাহিনী' রাখা হয়।]

"১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ সামরিক অভিযানের প্রতিক্রিয়ায় সব পূর্ব পাকিস্তানি পুলিশ, পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস, আনসার, ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট এবং সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনীর কয়েকটি নিয়মিত ইউনিটের পূর্ব পাকিস্তানী সদস্যরা সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। এসব লোক নেতৃত্বসহ মুক্তিবাহিনীর নিউক্লিয়াস গঠন করে।

২৫ মার্চ ১৯৭১-এর পর বিদ্রোহী বাঙালি সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য সংখ্যা ছিলো ১ লাখ ৬২ হাজার। ভারতীয় ও রুশরা পর্যায়ক্রমে আরো ১ লাখ ২৫ হাজার বেসামরিক লোককে প্রশিক্ষণ দেয়।

এভাবে মুক্তিবাহিনীর মোট সদস্য সংখ্যা দাঁড়ায় ২ লাখ ৮৭ হাজার ৫ শ'।"[২১]

মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য রণাংগনকে ১১টি সেক্টরে বিভক্ত করা হয়।

১ নাম্বার সেকটার

চট্টগ্রাম জিলা, পার্বত্য চট্টগ্রাম জিলা এবং ফেনী নদী পর্যন্ত অঞ্চল নিয়ে গঠিত হয় এই সেকটার।

---

২১. লে. জেনারেল এ.এ.কে. নিয়াজী, দ্যা বিট্রেয়াল অব ইস্ট পাকিস্তান, বাংলা অনুবাদ : ডা. মিজানুর রহমান কল্লোল, পৃষ্ঠা-৮৪।

www.pathagar.com

এই সেকটারের দায়িত্ব অর্পিত হয় মেজর জিয়াউর রহমান ও মেজর মুহাম্মাদ রফিকের ওপর।

২ নাম্বার সেকটার

নোয়াখালী জিলা, কুমিল্লা জিলার আখাড়উ-ভৈরব রেল লাইন পর্যন্ত ও ফরিদপুর জিলার অংশবিশেষ নিয়ে গঠিত হয় এই সেকটার। এই সেকটারের দায়িত্ব অর্পিত হয় মেজর খালেদ মোশাররফ ও মেজর এম.টি. হায়দারের ওপর।

৩ নাম্বার সেকটার

হবিগঞ্জ জিলা, ঢাকা জিলার অংশবিশেষ, কিশোরগঞ্জ এবং আখাউড়া ভৈরব রেল লাইনের পূর্ব দিকের কুমিল্লা জিলার বাকি অংশ নিয়ে এই সেকটার গঠিত হয়। এই সেকটারের দায়িত্ব অর্পিত হয় মেজর কে.এম. সফিউল্লাহ ও মেজর নুরুজ্জামানের ওপর।

৪ নাম্বার সেকটার

সিলেট জিলার পূর্বাঞ্চল, পূর্ব উত্তর দিকে সিলেট-ডাউকি রোড পর্যন্ত বিস্তৃত ছিলো এই সেকটার। এই সেকটারের দায়িত্ব অর্পিত হয় মেজর সি.আর. দত্তের ওপর।

৫ নাম্বার সেকটার

সিলেট জিলার পশ্চিমাঞ্চল ও ডাউকি-ময়মনসিংহ জিলার সীমান্ত পর্যন্ত অঞ্চল ছিলো এই সেকটারের অন্তর্ভুক্ত। এই সেকটারের দায়িত্ব অর্পিত হয় মেজর মীর শওকত আলীর ওপর।

৬ নাম্বার সেকটার

ঠাকুরগাঁও জিলা ও ব্রহ্মপুত্রের তীরাঞ্চল ছাড়া সমগ্র রংপুর জিলা নিয়ে এই সেকটার গঠিত হয়। এই সেকটারের দায়িত্ব অর্পিত হয় উইং কমান্ডার এম. বাশারের ওপর।

www.pathagar.com

৭ নাম্বার সেকটার

রাজশাহী জিলা, পাবনা জিলা, দিনাজপুর জিলা, পঞ্চগড় জিলা ও ব্রহ্মপুত্রের তীরাঞ্চল ছাড়া বগুড়া জিলা নিয়ে গঠিত হয় এই সেকটার। এই সেকটারের দায়িত্ব অর্পিত হয় মেজর কাজী নুরুজ্জামানের ওপর।

৮ নাম্বার সেকটার

কুষ্টিয়া জিলা, যশোর জিলা, ফরিদপুর জিলার অধিকাংশ নিয়ে ও খুলনা জিলার উত্তরাঞ্চল নিয়ে গঠিত হয় এই সেকটার। এই সেকটারের দায়িত্ব অর্পিত হয় মেজর আবু ওসমান চৌধুরী ও মেজর এম.এ. মঞ্জুর-এর ওপর।

৯ নাম্বার সেকটার

বৃহত্তর খুলনার দক্ষিণাঞ্চল, বরিশাল জিলা ও পটুয়াখালী জিলা নিয়ে গঠিত হয় এই সেকটার। এই সেকটারের দায়িত্ব অর্পিত হয় মেজর এম.এ. জলিলের ওপর।

১০ নাম্বার সেকটার

অভ্যন্তরীণ নদীপথ, দক্ষিণাঞ্চলের বিস্তীর্ণ নদীপথ, চট্টগ্রাম এলাকার নদীপথ নিয়ে গঠিত হয়েছিলো এই সেকটার। নদীপথে পাকিস্তানী সৈন্যদের ওপর হামলা চালাবার জন্য হেড কোয়ার্টার্সের দায়িত্বে ছিলো এটি।

১১ নাম্বার সেকটার

মোমেনশাহী জিলা, টাংগাইল জিলা, শেরপুর জিলা, জামালপুর জিলা ও যমুনা নদীর তীরাঞ্চল নিয়ে এই সেকটার গঠিত হয়। মেজর আবু তাহের ও ফ্লাইট লেফটেনেন্ট এম. হামিদুল্লাহ খানের ওপর অর্পিত হয় এই সেকটারের দায়িত্ব।[২২]

---

২২. এম.এ.ওয়াজেদ মিয়া, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ঘিরে কিছু ঘটনা ও বাংলাদেশ, পৃষ্ঠা : ১০০-১০১।

www.pathagar.com

(খ) 'মুজিব বাহিনী' গঠন

এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে কলকাতা পৌঁছেন শেখ ফজলুল হক মনি, সিরাজুল আলম খান, তোফায়েল আহমদ, আবদুর রাজ্জাক, নূরে আলম সিদ্দিকী, আবদুল কুদ্দুস মাখন, আ.স.ম. আবদুর রব ও শাহজাহান সিরাজ। তাঁদের নেতৃত্বে গড়ে ওঠে 'মুজিব বাহিনী'। ভারতীয় সেনাবাহিনীর মে. জেনারেল উবানের তত্ত্বাবধানে দেরাদুনের অদূরে চাক্‌রাতা-য় মুজিব বাহিনীর সদস্যদের ট্রেনিং শুরু হয়।

'মুজিব বাহিনী' সম্পর্কে 'মূলধারা '৭১' এর লেখক মঈদুল হাসান বলেন,

> 'মুক্তি সংগ্রামে অংশগ্রহণ করা মুজিব বাহিনীর লক্ষ্য বলে প্রচার করা হলেও এই সংগ্রামে তাদের নির্দিষ্ট ভূমিকা, কার্যক্রম ও কৌশল কি, কোন্ এলাকায় এরা নিযুক্ত হবে, মুক্তিবাহিনীর অপরাপর ইউনিটের সাথে এদের তৎপরতার কিভাবে সমন্বয় ঘটবে, কি পরিমাণ বা কোন্ শর্তে এদের অস্ত্র ও রসদের যোগান ঘটছে, কোন্ প্রশাসনের এরা নিয়ন্ত্রণাধীন, কার শক্তিতে বা কোন্ উদ্দেশ্যে এরা অস্থায়ী সরকারের বিশেষত প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধাচরণ করে চলছে, এ সমুদয় তথ্যই বাংলাদেশ সরকারের জন্য রহস্যাবৃত থেকে যায়।'[২৩]

মুজিব বাহিনীর একাংশ এই প্রচারণায় মত্ত ছিলো যে 'তাজউদ্দিনই বঙ্গবন্ধুর গ্রেফতার হওয়ার কারণ', 'তাজউদ্দিন যতোদিন প্রধানমন্ত্রী, ততোদিন ভারতের পক্ষে বাংলাদেশের স্বীকৃতি অসম্ভব', 'তাজউদ্দিন ও তাঁর মন্ত্রীসভা যতোদিন ক্ষমতায় আসীন ততোদিন বাংলাদেশের মুক্তি অর্জন সম্ভব নয়।' তাজউদ্দিন আহমদের প্রতি শেখ ফজলুল হক মণি-র মনোভাব ছিলো খুবই নেতিবাচক।

(গ) 'প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার' গঠন

১৯৭১ সনের ১৭ই এপ্রিল প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার শপথ গ্রহণ করে। অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট হন সৈয়দ নজরুল ইসলাম। প্রধানমন্ত্রী হন তাজউদ্দিন আহমদ। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব এ.এইচ.এম. কামারুজ্জামান, অর্থ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব ক্যাপ্টেন (অবসরপ্রাপ্ত) মনসুর আলী এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব খন্দকার মুশতাক আহমদের ওপর ন্যস্ত করা হয়।

---

২৩. মঈদুল হাসান, মূলধারা '৭১, পৃষ্ঠা-৭২।

www.pathagar.com

'মুক্তি বাহিনীর' মাঝে কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য কিংবা দলীয় স্বার্থ-চিন্তা ছিলো না। এটি ছিলো জাতীয় স্বার্থের প্রতীক। ফলে 'প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার' গঠিত হলে সেই সরকারের আনুগত্য করতে মুক্তিবাহিনী বিন্দুমাত্রও দ্বিধা করেনি।

পক্ষান্তরে 'মুজিব বাহিনী' বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে একটি স্বতন্ত্র ধারায় অবতীর্ণ হয়। এটি প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্যশীল ছিলো না। প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণের বাইরে থেকে মুজিব বাহিনী স্বাধীনভাবে এর তৎপরতা চালাতে থাকে।

কাদেরিয়া বাহিনী

টাংগাইল জিলার এক টগবগে তরুণ আবদুল কাদের সিদ্দিকী স্বতন্ত্রভাবে একটি মুক্তিবাহিনী গঠন করেন। এটি কাদেরিয়া বাহিনী নামে পরিচিত হয়। দেশের অভ্যন্তরে অবস্থান করে যমুনা নদীর পূর্ব তীরাঞ্চল এবং টাংগাইল জিলা ও মোমেনশাহী জিলার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকা মুক্ত করে এই বাহিনী নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে।

পাকিস্তানের অখণ্ডতায় বিশ্বাসী ব্যক্তিদের উভয় সংকট

এই সময়টিতে পাকিস্তানের অখণ্ডতায় বিশ্বাসী নেতা ও কর্মীগণ উভয় সংকটে পড়েন।

তাঁরা আওয়ামী লীগের অনুসৃত পথে যেতে পারছিলেন না। অন্য দিকে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর বর্বরতাকেও সমর্থন করতে পারছিলেন না।

এমতাবস্থায় লে. জেনারেল টিককা খানের পক্ষ থেকে ব্রিগেডিয়ার রাও ফরমান আলী খান, ন্যাশনাল ডিমোক্রেটিক ফ্রন্টের নূরুল আমীন, মুসলিম লীগের খাজা খায়েরউদ্দিন, নেযামে ইসলাম পার্টির মৌলবী ফরিদ আহমাদ এবং জামায়াতে ইসলামীর অধ্যাপক গোলাম আযমের সাথে যোগাযোগ করে তাঁদেরকে রেডিওতে বক্তৃতা করার জন্য বলেন। উভয় সংকটে নিপতিত অবস্থায় জাতির উদ্দেশ্যে কী বক্তব্য রাখবেন স্থির করা ছিলো খুবই কঠিন।

www.pathagar.com

জনাব নূরুল আমীন তাঁর ভাষণে বলেন যে '১৯৪৬ সনের নির্বাচনে বাংলার মুসলিমদের ৯৭ জন পাকিস্তানের পক্ষে ভোট দিয়েছিলেন। পাকিস্তানের জনসংখ্যা শতকরা ৫৬ ভাগ পূর্ব পাকিস্তানী। ১৯৭০ এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ১৬০টি আসনে বিজয়ী হয়ে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছে। আজ হোক কাল হোক শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হবেন। তিনি আমাদের অধিকার আদায় করতে চেয়েছিলেন। পাকিস্তান থেকে আলাদা হতে চাননি। আলাদা হতে চাইলে তিনি আত্মগোপন করে ভারতে চলে যেতেন।' ভাষণে তিনি আশা ব্যক্ত করেন যে দেশে আইন-শৃংখলা বহাল হলেই শেখ মুজিবুর রহমান জেল থেকে বেরিয়ে আসবেন এবং পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হয়ে পূর্ব পাকিস্তানের সকল দাবি পূরণ করবেন।

এরপর আসে মৌলবী ফরিদ আহমদের ভাষণ প্রদানের দিন। তিনি অত্যন্ত আবেগপূর্ণ একটি বক্তব্য রাখেন। তাঁর ভাষণ প্রধানত ভারতের বিরুদ্ধেই ছিলো। তিনি বলেন যে 'ভারতের গোলামী থেকে বাঁচার জন্যই মুসলিমগণ পাকিস্তান বানিয়েছে। আমরা আবার তাদের গোলাম হতে চাই না। ভারত থেকে আমাদেরকে সাবধান থাকতে হবে।' তিনিও তাঁর ভাষণে আওয়ামী লীগ ও শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে কিছুই বলেননি।

খাজা খায়েরউদ্দিনের ভাষণ মোটামুটি জনাব নূরুল আমীনের ভাষণের অনুরূপ ছিলো।

অতপর অধ্যাপক গোলাম আযমের ভাষণের দিন আসে।

জাতীয় পরিষদের নির্বাচনের পর প্রেসিডেন্ট ইয়াহইয়া খান জুলফিকার আলী ভূট্টোর সাথে আঁতাত করে যেই রাজনৈতিক সংকট সৃষ্টি করেছেন অধ্যাপক গোলাম আযম বারবার তার প্রতিবাদ করেছেন।

রেডিও ভাষণে তিনি আওয়ামী লীগ, শেখ মুজিবুর রহমান এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরুদ্ধে কিছুই বলেননি। তিনি তাঁর ভাষণে ভারতের মুসলিমদের দুর্দশার চিত্র তুলে ধরেছেন। চলমান রাজনৈতিক সংকটের সুযোগে বন্ধু সেজে ভারত এই দেশ দখল করতে চায় বলে তিনি সতর্ক থাকার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।

অধ্যাপক গোলাম আযমের ভাষণে লে. জেনারেল টিক্কা খান খুশি হতে

www.pathagar.com

পারেননি। অন্যদিকে আওয়ামী লীগ জামায়াতে ইসলামীকে তার শত্রু পক্ষ গণ্য করে। ফলে সারাদেশেই জামায়াতে ইসলামীর জনশক্তি আওয়ামী লীগ থেকে হুমকির সম্মুখীন হয়।

'শান্তি কমিটি' গঠন

১৯৭১ সনের এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি। কাউন্সিল মুসলিম লীগের সভাপতি খাজা খায়েরউদ্দিন এবং নেযামে ইসলাম পার্টির সেক্রেটারী জেনারেল মৌলবী ফরিদ আহমদের উদ্যোগে ন্যাশনাল ডিমোক্রেটিক ফ্রন্টের চেয়ারম্যান জনাব নূরুল আমীনের বাসভবনে একটি মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। এতে আরো উপস্থিত ছিলেন সর্বজনাব এ.কিউ.এম. শফিকুল ইসলাম (মুসলিম লীগ), মাহমুদ আলী (পাকিস্তান ডিমোক্রেটিক পার্টি), আবদুল জাব্বার খদ্দর (কৃষক শ্রমিক পার্টি), পীর মুহসিনুদ্দীন (জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম), এ.এস.এম. সুলাইমান (কৃষক শ্রমিক পার্টি), মাওলানা নূরুয্যামান (পিপলস পার্টি) প্রমুখ।

সভাপতিত্ব করেন জনাব নূরুল আমীন। মৌলবী ফরিদ আহমদ প্রথমে বক্তব্য রাখেন।

তিনি বলেন, 'আওয়ামী লীগ নেতারা সরকারের বিরুদ্ধে জনগণকে আন্দোলনে এগিয়ে দিয়ে নিজেরা ভারতে পালিয়ে গেলেন। এদিকে সরকার সেনাবাহিনীকে দিয়ে আন্দোলন দমন করতে গিয়ে যে সশস্ত্র অভিযান চালাচ্ছে তাতে নিরীহ জনগণই বেশি নির্যাতিত হচ্ছে। যারা আন্দোলনে সক্রিয় তারা সবাই আত্মগোপন করছে বা ভারতে চলে গেছে। শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে প্রশাসন, পুলিশ, ব্যাংক, আদালত সবই চলছিলো। টিক্কা খান ঐ সরকার পুনর্দখলের উদ্দেশ্যে যা কিছু করছেন তাতে নিরপরাধ লোকেরা যাতে বিপদগ্রস্ত না হয় এবং সেনাবাহিনী যেন বাড়াবাড়ি না করে এমন ব্যবস্থা হওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন। যারা বিপদগ্রস্ত হচ্ছে তারা কার কাছে আশ্রয় পাবে? আমরা যারা রাজনীতি করি জনগণ তাদের কাছেই সাহায্যের জন্য আসছে এবং আসবে। আমরা তাদেরকে কিভাবে সাহায্য

www.pathagar.com

করতে পারি সেই বিষয়ে মত বিনিময়ের উদ্দেশ্যেই আজকের এই মিটিং।'
এ.কে. রফিকুল হোসেন বলেন, 'আমরা যাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে ভারত বিভক্ত করে পাকিস্তান কায়েম করেছিলাম, সেই পাকিস্তানকে ভারত দখল করে নিক তা আমরা চাইতে পারি না। ভারত আমাদের বন্ধু হতে পারে না। আওয়ামী লীগ নেতারা এই দেশটাকে পাকিস্তান থেকে আলাদা করার জন্য ভারত সরকারের নিকট আশ্রয় নিয়েছে। আমি নিশ্চিত যে ভারত পাকিস্তানকে দ্বিখণ্ডিত করার এই মহা সুযোগ গ্রহণ করবে। আমার আশংকা যে আমরা দিল্লীর গোলামে পরিণত হতে যাচ্ছি। পাকিস্তান সেনাবাহিনী পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষার জন্য যেই চেষ্টা করছে তাতে তাদের সাথে আমাদের সহযোগিতা করা কর্তব্য। ভারতীয় কংগ্রেসের অধীনতা থেকে মুক্তির জন্যই আমরা পাকিস্তান আন্দোলন করেছিলাম। আমরা আবার সেই কংগ্রেসের অধীন হতে পারি না।'
আবদুল জাব্বার খদ্দর বলেন, 'সেনাবাহিনী পশ্চিম পাকিস্তান থেকে এসে এই দেশকে ভারতের খপ্পর থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করছে। ভারত জয়ী হলে এরা কেউ পালাতেও পারবে না। এই অবস্থায় তাদের এই প্রচেষ্টায় আমাদের সার্বিকভাবে সহযোগিতা করা কর্তব্য।'
অধ্যাপক গোলাম আযম বলেন, 'এই দেশের রাজনীতিতে আজকের সভাপতি ছাড়া আমরা কেউ গণ্য নই। গত নির্বাচনে আমাদের কারো কোন পাত্তা ছিলো না। একমাত্র নূরুল আমীন সাহেব নির্বাচিত হতে সক্ষম হন। আর সকল আসনই শেখ মুজিব পেয়েছেন। জনগণের নিকট আমাদের কতটুকু মূল্য আছে? নির্বাচনে জনগণ যাদেরকে ক্ষমতায় বসাতে চেয়েছে তাদেরকে ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করার জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহইয়া খান কেমন জঘন্য চক্রান্ত করেছেন তা জনগণ ও বিশ্ববাসী লক্ষ্য করেছে। নির্বাচনের ফলাফলকে চরম অবজ্ঞার সাথে উপেক্ষা করে, এমনকি পূর্ব পাকিস্তানের বেসামরিক সরকারকে শেখ মুজিবের আনুগত্য করতে দেখেও ইয়াহইয়া খান শেখ মুজিবের সাথে সংলাপে কোন সমঝোতায় পৌঁছাতে সক্ষম হলেন না। রাজনৈতিক মতবিরোধকে রাজনৈতিকভাবেই মিমাংসা করতে হয়। সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে তা করা যায় না। ইয়াহইয়া খান জনগণের

www.pathagar.com

নির্বাচিত প্রতিনিধিদেরকে ভারতের হাতে তুলে দিলেন। আমরা জনগণের প্রতিনিধি নই। আমরা এই সমস্যার কী সমাধান দেবো? সবচেয়ে বড়ো কথা হলো, কোন সামরিক শক্তি ১৯৪৭ সনে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান ঐক্যবদ্ধ করেনি। শুধু সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে এই ঐক্য বহাল রাখা যাবে না। আমরা কিভাবে টিককা খানের সাথে সহযোগিতা করবো? তারা যা করছেন তাতে কি আমাদের কোন পরামর্শ চেয়েছেন? তারা কি আমাদের কথা মতো চলবেন? এসব কথা বিবেচনা করেই আমাদের সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। পাকিস্তান টিকে থাকুক, আমাদের দেশ ভারতের খপ্পর থেকে বেঁচে থাকুক, এটা অবশ্যই আমাদের সবার আন্তরিক কামনা। কিন্তু এই বিষয়ে আমাদের হাতে কোন উপায় আছে বলে মনে হয় না। তাই আমি মৌলবী ফরিদ আহমদের প্রস্তাব সমর্থন করি এবং অসহায় জনগণের যতটুকু খিদমত করা সম্ভব, সেই প্রচেষ্টাই আমাদের সীমাবদ্ধ থাকা উচিত।"

আরো অনেকেই বক্তব্য রাখেন।

অবশেষে সর্বসম্মতিক্রমে 'শান্তি কমিটি' নামে একটি সংস্থা গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।[২৪]

খাজা খায়েরউদ্দিন এই কমিটির আহ্বায়ক নিযুক্ত হন। পরবর্তীতে ২১ সদস্য বিশিষ্ট একটি কার্যকরী কমিটি গঠিত হয়। কমিটির সদস্য ছিলেন- এডভোকেট এ.কিউ.এম. শফিকুল ইসলাম, অধ্যাপক গোলাম আযম, মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মাদ মাসুম, জনাব আবদুল জাব্বার খদ্দর, মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ, জনাব আবুল কাসেম, জনাব মোহন মিয়া, জনাব আবদুল মতিন, অধ্যাপক গোলাম সারওয়ার, ব্যারিস্টার আখতারউদ্দীন, পীর মুহসিনুদ্দীন, জনাব এ.এস.এম. সুলাইমান, জনাব এ.কে. রফিকুল হোসেন, জনাব নুরুজ্জামান, জনাব আতাউল হক খান, জনাব তোয়াহা বিন হাবীব, মেজর আফসারউদ্দীন, দেওয়ান ওয়ারাসাত আলী এবং হাকিম ইরতিয়াজুর রহমান।

---

২৪. অধ্যাপক গোলাম আযম, জীবনে যা দেখলাম, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৫৭।

www.pathagar.com

জনগণের জীবনে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনা এবং নিরপরাধ জনগণকে সেনাবাহিনীর যুল্‌ম থেকে বাঁচানোর জন্য শান্তি কমিটি প্রচেষ্টা চালাতে থাকে।

দেশের সকল স্তরেই মুসলিম লীগের লোক ছিলো। থানা পর্যায়েও মুসলিম লীগের লোকেরাই নেতৃত্ব লাভ করেন। মুসলিম লীগের পর আওয়ামী লীগ ছাড়া আর কোন দলেরই জিলা ও মহকুমা পর্যায়ের নিচে সংগঠন ছিলো না। জামায়াতে ইসলামীর সংগঠন তখনো মহকুমা স্তরের নিচে বিস্তার লাভ করেনি।

'রেযাকার বাহিনী' গঠন

১৯৭১ সনের ২রা অগাস্ট পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর লে. জেনারেল টিককা খান The East Pakistan Razakars Ordinance 1971 জারি করেন।

এই অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে The Ansars Act 1948 বাতিল করা হয় এবং আনসার বাহিনীর টাকা-পয়সা, রেকর্ডপত্র এবং সকল স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি Razakar বাহিনীর নিকট হস্তান্তর করা হয়।[২৫]

অর্থাৎ আনসার বাহিনীর স্থলাভিষিক্ত হয় রেযাকার বাহিনী।

এখন যাদেরকে ইউ.এন.ও. বলা হয় তখন তাদেরকে বলা হতো সার্কল অফিসার। সামরিক সরকারের নির্দেশে সার্কল অফিসারগণ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানদের মাধ্যমে হাটে বাজারে ঢোল পিটিয়ে ঘোষণা দিয়ে রেযাকার রিক্রুট করা শুরু করেন।

"স্বাধীন বাংলার অভ্যুদয়" গ্রন্থে কামরুদ্দিন আহমদ রেযাকার বাহিনীর কমপোজিশন সম্পর্কে একটি চমৎকার চিত্র তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন,

> "(ক) দেশে তখন দুর্ভিক্ষাবস্থা বিরাজ করছিলো। সরকার সে দুর্ভিক্ষের সুযোগ নিয়ে ঘোষণা করলো, যারা রাজাকার বাহিনীতে যোগ দেবে, তাদের দৈনিক নগদ তিন টাকা ও তিন সের চাউল দেওয়া হবে। এর ফলে বেশ কিছু

---

২৫. এড. মো. খায়রুল আহসান (মিন্টু), আর্মি, বিডিআর ও যুদ্ধাপরাধ সম্পর্কিত আইন ও অধ্যাদেশ, পৃষ্ঠা-১২৩।

www.pathagar.com

সংখ্যক লোক, যারা এতোদিন পশ্চিমা সেনার ভয়ে ভীত হয়ে সন্ত্রস্ত দিন কাটাচ্ছিলো, তাদের এক অংশ ঐ বাহিনীতে যোগদান করলো।
(খ) এতোদিন পাকসেনার ভয়ে গ্রামগ্রামান্তরে যারা পালিয়ে বেড়াচ্ছিলো, আত্মরক্ষার একটি মোক্ষম উপায় হিসেবে তারা রাজাকারদের দলে যোগ দিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো।
(গ) এক শ্রেণীর সুবিধাবাদী জোর করে মানুষের সম্পত্তি দখল করা এবং পৈতৃক আমলের শত্রুতার প্রতিশোধ নেয়ার সুযোগ গ্রহণের জন্যেও এ বাহিনীতে যোগ দিয়েছিলো।"

পাকিস্তানী সেনাদের গাড়ি চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি করার জন্য মুক্তিযোদ্ধারা পুল ও কালভার্ট ভেংগে দিতো। রেযাকারদেরকে পুল ও কালভার্ট পাহারা দেওয়ার কাজে লাগানো হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম যাতে নির্বিঘ্নে চলতে পারে সেই জন্য পাহারাদার হিসেবে রেযাকারদেরকে নিয়োজিত করা হয়। ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই যাতে বাধাগ্রস্ত না হয় সেই জন্য ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কেন্দ্রগুলোতে রেযাকারদেরকে পাহারাদার হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। ইত্যাদি।

একজন মুক্তিযোদ্ধার লিখিত চিঠিতে আমরা রেযাকার বাহিনী গঠন ও তাদের ভূমিকা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ বিবরণ পাই–

"অবশ্য আজকাল পাকিস্তানিরা একটা নতুন বাহিন গঠন করেছে। নাম দিয়েছে রাজাকার। এরা প্রায়ই মুসলিম লিগের লোক। অনেক জায়গায় আবার জোর করে পাকিস্তানিরা বাঙালিদের ঢুকাচ্ছে। এক এক মহল্লায় গিয়ে সেখানকার চেয়ারম্যান অথবা সরদার গোছের লোকদেরকে ভয় দেখিয়ে বলছে যে তোমাদের মহল্লা থেকে এতজন লোক রাজাকার বাহিনীতে না দিলে তোমাদের মহল্লা বা গ্রাম ধ্বংস করে দেব। এই রাজাকারদের হাতে ৩০৩ রাইফেল দেওয়া হয় আর তারা ব্রিজ, রাস্তা ইত্যাদি পাহারা দেয়, যাতে মুক্তিবাহিনী এগুলো ধ্বংস না করতে পারে। যদি কোন এলাকার Bridge ইত্যাদি ধ্বংস হয় তাহলে আশপাশের তিন-চার মাইলের মধ্যে বাড়িঘর সব জ্বালিয়ে দেয়। তাই লোকেরা ব্রিজ ধ্বংস করতে গেলে তারা... Fight করে, না হয়তো হাতে পায়ে ধরে তাদের ব্রিজ উড়াতে মানা করে। অবশ্য রাজাকাররা অনেক জায়গায় আমাদের সাহায্য করেছে, আবার অনেক জায়গায় গ্রামবাসীর ওপর খুব অত্যাচার করেছে। অবশ্য রাজাকাররা

www.pathagar.com

আমাদের খুবই ভয় করে (They are no match for us) এবং প্রায় অনেক রাজাকার Defect করে MB তে যোগ দিচ্ছে।"[২৬]

রেযাকার বাহিনীর দুইটি উইং ছিলো : আল বদর বাহিনী ও আশ্ শামস বাহিনী।

এই সম্পর্কে লে. জেনারেল এ.এ.কে. নিয়াজী বলেন,

> "Two separate wings called Al-Badr and Al-Shams were organized.Well-educated and properly motivated students from schools and madrasas were put in Al-Badr wing, where they were trained to undertake 'specialized operations', while the remainder were grouped together under Al-Shams, which was responsible for the protection of bridges, vital points and other areas."[২৭]
>
> 'আল বদর ও আশ্ শামস নামে দুইটি আলাদা 'উইং' গঠন করা হয়। স্কুল-মাদ্রাসার সুশিক্ষিত ও যথাযথভাবে উদ্বুদ্ধ ছাত্রদের সমন্বয়ে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে কার্য চালাবার জন্য আল বদর উইং গঠন করা হয় এবং পুল, গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা ও অন্যান্য স্থান পাহারা দেওয়ার জন্য অন্যদেরকে নিয়ে গঠন করা হয় আশ্ শামস উইং'।

এথেকে এটি স্পষ্ট হয় যে, 'আল বদর বাহিনী' ও 'আশ্ শামস বাহিনী' নামে স্বতন্ত্র কোন বাহিনী ছিলো না। 'আল বদর বাহিনী' ও 'আশ্ শামস বাহিনী' রেযাকার বাহিনীরই দুইটি ভাগ ছিলো মাত্র।

রেযাকার বাহিনী জামায়াতে ইসলামীর সৃষ্টি বলে যেই প্রচারণা, তা একেবারেই ভিত্তিহীন।

তদুপরি রেযাকার বাহিনীতে জামায়াতে ইসলামীর বিপুল উপস্থিতির কথাও একটি কল্পকাহিনী।

---

২৬. মুক্তিযোদ্ধা টিটো, একাত্তরের চিঠি, পৃষ্ঠা-১২২, ১২৩।

২৭. Lieutenant General (R) A.A.K. Niazi, The Betrayal of East-Pakistan, Page-78

www.pathagar.com

উল্লেখ্য, সেই সময় পূর্ব পাকিস্তানে জামায়াতে ইসলামীর সদস্য (রুকন) ছিলেন সাড়ে চারশত জন। কর্মী সংখ্যা ছিলো ছয় হাজার থেকে সাত হাজারের মধ্যে।

এই জনশক্তির উল্লেখযোগ্য অংশ ছিলেন বৃদ্ধলোক ও নারী।

ভারত-সোভিয়েত ইউনিয়ন মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষর

এই সময় পরাশক্তি ছিলো তিনটি : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন পাকিস্তানের শক্ত সমর্থক ছিলেন।

চীনের জাঁদরেল প্রধানমন্ত্রী চৌ-এন-লাই পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহইয়া খানকে লেখা এক চিঠিতে পাকিস্তানের 'জাতীয় স্বাধীনতা' এবং 'রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব' রক্ষায় চীনের দ্ব্যর্থহীন সমর্থনের কথা জানান।[২৮]

সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট পোদগর্নি প্রেসিডেন্ট ইয়াহইয়াকে লেখা চিঠিতে 'পূর্ব পাকিস্তান' ও 'পাকিস্তানের আপামর জনগণ' শব্দ ব্যবহার করেছেন। 'বাংলাদেশ' শব্দটি ব্যবহার করেননি । সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রধানমন্ত্রী এলেক্সি কোসিগিন চাচ্ছিলেন অখণ্ড পাকিস্তানের ক্ষমতাসীন সরকার হিসেবে আওয়ামী লীগকে প্রতিষ্ঠিতকরণ।

> "বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধকে সে (সোভিয়েত ইউনিয়ন) কখনই খোলাখুলি সমর্থন করেনি বা খোলাখুলিভাবে পাকিস্তানের বিরোধিতা করেনি।"[২৯]

তখন মুসলিম জাহানের শ্রেষ্ঠ নেতা ছিলেন সাউদী আরবের কিং ফায়সাল। তিনি বলিষ্ঠভাবে পাকিস্তানকে সমর্থন করতেন। তাঁকে অনুসরণ করতো মুসলিম জাহানের অন্য দেশগুলো।

ভারত চাচ্ছিলো স্বাধীন বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ সরকার। ভারত বুঝতে পেরেছিলো, বাংলাদেশকে ত্বরিৎ স্বাধীন করতে হলে যুদ্ধ প্রয়োজন। কিন্তু

---

২৮. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে পরাশক্তির ভূমিকা, পৃষ্ঠা-২৭।

২৯. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে পরাশক্তির ভূমিকা, পৃষ্ঠা-৪৫।

www.pathagar.com

দুনিয়ার সামগ্রিক পরিস্থিতির নিরিখে ভারত একাকী পাকিস্তানের সাথে যুদ্ধে নামা সমীচীন মনে করেনি। সেই জন্য 'জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনে'র প্রবক্তা হওয়া সত্ত্বেও ভারত সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।

১৯৭১ সনের ৯ই অগাস্ট 'ভারত-সোভিয়েত ইউনিয়ন মৈত্রী চুক্তি' স্বাক্ষরিত হয়। দিল্লিতে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সরদার শরণ সিং এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আঁদ্রে গ্রোমিকো এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

> 'স্বাক্ষরিত মৈত্রী চুক্তির সমূহ গুরুত্ব ছিলো এর নবম ধারায়। এই ধারা অনুযায়ী চুক্তিবদ্ধ দুই দেশের কারো বিরুদ্ধে যদি বহিরাক্রমণের বিপদ দেখা দেয়, তবে এই বিপদ অপসারণের জন্য উভয় দেশ অবিলম্বে পারস্পরিক আলোচনায় প্রবৃত্ত হবে এবং তাদের শান্তি ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার জন্য যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করবে।'[৩০]

এই চুক্তির খবর শুনে হেনরী কিসিঞ্জার এটিকে 'বারুদের স্তূপে একটি জ্বলন্ত শলাকা নিক্ষেপ' বলে উল্লেখ করেন।

পূর্ব পাকিস্তানে বেসামরিক সরকার গঠন

১৯৭১ সনের ১লা সেপ্টেম্বর প্রেসিডেন্ট ইয়াহইয়া খান কঠোর প্রকৃতির মানুষ লে. জেনারেল টিককা খানকে সরিয়ে মুসলিম লীগের ডা. আবদুল মুত্তালিব মালিককে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর এবং লে. জেনারেল আমীর আবদুল্লাহ খান নিয়াজীকে পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর অধিনায়ক নিযুক্ত করেন।

৩রা সেপ্টেম্বর ডা. আবদুল মুত্তালিব মালিক গভর্ণর হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার প্রচেষ্টা চালাবার লক্ষ্যে তিনি একটি সিভিলিয়ান মন্ত্রীসভা গঠন করেন। জনাব আবুল কাসেম অর্থ দফতর, জনাব আব্বাস আলী খান শিক্ষা দফতর, জনাব আখতার উদ্দিন বাণিজ্য ও শিল্প দফতর, জনাব এ.এস.এম. সুলাইমান শ্রম, সমাজকল্যাণ ও পরিবার

---

৩০. মঈদুল হাসান, মূলধারা '৭১, পৃষ্ঠা-৬৮।

www.pathagar.com

পরিকল্পনা দফতর, মি. অং শৈ প্রু বন, সমবায় ও মৎস্য দফতর, মাওলানা এ.কে.এম. ইউসুফ রাজস্ব দফতর, মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসিত সংস্থা বিষয়ক দফতর, জনাব নওয়াজিশ আহমদ খাদ্য ও কৃষি দফতর, জনাব মুহাম্মাদ উবাইদুল্লাহ মজুমদার স্বাস্থ্য দফতর এবং অধ্যাপক শামসুল হক সাহায্য ও পুনর্বাসন দফতরের মন্ত্রী নিযুক্ত হন। নব নিযুক্ত গভর্ণর মুসলিম লীগ, নেযামে ইসলাম পার্টি, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম, জামায়াতে ইসলামী এবং আওয়ামী লীগের পাকিস্তানের অখণ্ডতায় বিশ্বাসী নেতৃবৃন্দের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করেন।

এই সময় হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর কন্যা বেগম আখতার সুলাইমান ঢাকায় এসে আওয়ামী লীগের পাকিস্তানের অখণ্ডতায় বিশ্বাসী নেতৃবৃন্দের সাথে যোগাযোগ করেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমানের সম্পর্কে মামা এডভোকেট আবদুস সালাম খান এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর দীর্ঘকালের সহকর্মী এডভোকেট জহিরুদ্দিন।[৩১]

এটি ছিলো পূর্ব পাকিস্তানকে পাকিস্তানের সাথে সংযুক্ত রাখার সর্বশেষ প্রয়াস।

ভারতের সাথে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর

১৯৭১ সনের অকটোবর।

প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার ভারত সরকারের সাথে একটি সমঝোতা চুক্তিতে আবদ্ধ হয়।

> 'প্রশাসনিক বিষয়ে স্থির হয় যে যারা সক্রিয়ভাবে মুক্তিযুদ্ধ করছে, তারাই কেবল প্রশাসনিক কর্মকর্তা নিয়োজিত থাকতে পারবে। অন্যদেরকে চাকুরিচ্যুত করা হবে। শূন্য জায়গা পূরণ করবে ভারতীয় প্রশাসনিক কর্মকর্তাগণ।
>
> সামরিক বিষয়ে সমঝোতা হয় যে স্বাধীন হওয়ার পর বাংলাদেশে প্রয়োজনীয়

---

৩১. এম. এ. ওয়াজেদ মিয়া, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ঘিরে কিছু ঘটনা ও বাংলাদেশ, পৃষ্ঠা-১০৪।

www.pathagar.com

সংখ্যক ভারতীয় সৈন্য অবস্থান করবে। বাংলাদেশের নিজস্ব কোন সেনাবাহিনী থাকবে না।
অভ্যন্তরীণ আইন শৃংখলা রক্ষার জন্য মুক্তিবাহিনীকেন্দ্রিক একটি প্যারামিলিটারী বাহিনী গঠন করা হবে।
ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরু হলে ভারতের সেনাপ্রধান যুদ্ধে অধিনায়কত্ব করবেন, মুক্তি বাহিনীর সর্বাধিনায়ক নন।
যুদ্ধকালে মুক্তিবাহিনী ভারতীয় সেনাবাহিনীর অধীনে থাকবে।
বিদেশ বিষয়ে ভারত যা বলবে তা মেনে নিতে হবে।
সীমান্তের তিন মাইল জুড়ে খোলাবাজার চালু হবে। বছর শেষে হিসেব নিকেশ হবে। পাউন্ড স্টার্লিং দিয়েই প্রাপ্য পরিশোধ করা হবে।'[৩২]

এটি ছিলো প্রকৃত পক্ষে অধীনতামূলক মিত্রতা চুক্তি।

প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট সৈয়দ নজরুল ইসলাম এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। সমঝোতা চুক্তির ভয়াবহতা উপলব্ধি করে স্বাক্ষর দানের সাথে সাথেই তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন।[৩৩]

"১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বরে ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী চুক্তি সম্পাদনের পর অকটোবরে ভারতের সঙ্গে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার একটি সাত দফা মৈত্রী চুক্তি সম্পাদন করেছিল। একাত্তরে ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশ সরকার যে ৭ দফা মৈত্রী চুক্তি সম্পাদন করেছিল, তা ছিলো নিম্নরূপ ঃ

১। যারা সক্রিয়ভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছে শুধু তারাই প্রশাসনিক কর্মকর্তা পদে নিয়োজিত থাকতে পারবে। বাকীদের চাকুরীচ্যুত করা হবে এবং সেই শূন্যপদ পূরণ করবে ভারতীয় প্রশাসনিক কর্মকর্তারা।
২। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর প্রয়োজনীয়সংখ্যক ভারতীয় সৈন্য বাংলাদেশে অবস্থান করবে। (কতদিন অবস্থান করবে তার সময়সীমা নির্ধারণ করা হয় না।) ১৯৭২ সালের নবেম্বর মাস থেকে আরম্ভ করে প্রতি বছর এ সম্পর্কে পুনরীক্ষণের জন্য দু'দেশের মধ্যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে।
৩। বাংলাদেশের কোন নিজস্ব সেনাবাহিনী থাকবে না।
৪। অভ্যন্তরীণ আইন-শৃংখলা রক্ষার জন্য মুক্তিবাহিনীকে কেন্দ্র করে একটি প্যারামিলিটারী বাহিনী গঠন করা হবে।

---

৩২. মতিউর রহমান চৌধুরী, শেখ মুজিব চুক্তিটি অগ্রাহ্য করলেন, সাপ্তাহিক কাগজ, জানুয়ারি, ১৯৯০।
৩৩. মতিউর রহমান চৌধুরী, শেখ মুজিব চুক্তিটি অগ্রাহ্য করলেন, সাপ্তাহিক কাগজ, জানুয়ারি, ১৯৯০।

www.pathagar.com

৫। সম্ভাব্য ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে অধিনায়কত্ব দেবেন ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রধান, মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক নন এবং যুদ্ধকালীন সময়ে মুক্তিবাহিনী ভারতীয় বাহিনীর অধিনায়কত্বে থাকবে।

৬। দু'দেশের বাণিজ্য হবে খোলাবাজার (ওপেন মার্কেট) ভিত্তিক। তবে বাণিজ্যের পরিমাণ হিসাব হবে বছরওয়ারী এবং যার পাওনা, সেটা স্টার্লিং-এ পরিশোধ করা হবে।

৭। বিভিন্ন রাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্কের প্রশ্নে বাংলাদেশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলবে এবং ভারত যতদূর পারে এ ব্যাপারে বাংলাদেশকে সহায়তা দেবে।

১৯৭১ সালের অকটোবর মাসে ভারতরে সঙ্গে বাংলাদেশ সরকারের সম্পাদিত উক্ত সাত দফা গোপন চুক্তির তথ্য সাংবাদিক মাসুদুল হককে ব্যক্তিগত সাক্ষাতকারের সময় মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ের প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের দিল্লী মিশন প্রধান জনাব হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী প্রদান করেন। প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে সাত দফা গোপন চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম। চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর দানের পরপরই তিনি মুর্ছা যান।"[৩৪]

পাকিস্তানের অখণ্ডতায় বিশ্বাসী ব্যক্তিদের ভারতভীতির কারণ

(ক) কংগ্রেস কর্তৃক পাকিস্তান সৃষ্টির বিরোধিতার স্মৃতি

দি ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস ভারতীয় জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী ছিলো। এই দলের দাবি ছিলো ভারতীয়রা সকলে মিলে একটি জাতি। আর এই জাতির প্রতিনিধিত্বশীল সংগঠন হচ্ছে দি ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস। অতএব বৃটিশ সরকার দক্ষিণ এশিয়া উপমহাদেশ ছেড়ে যাবার সময় এই দলটির হাতেই ক্ষমতা হস্তান্তর করে যেতে হবে।

এই দাবির বিপরীতে অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ দাবি করলো যে উপমহাদেশে বসবাসকারী মুসলিমগণ একটি স্বতন্ত্র জাতি। অতএব মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলো নিয়ে আলাদা রাষ্ট্র গঠন করতে হবে।

কংগ্রেসের 'এক জাতি তত্বে'র বিপরীতে মুসলিম লীগের 'দ্বি-জাতি তত্ব' (two nation theory) সমর্থন করে গোটা উপমহাদেশের মুসলিম জনগোষ্ঠী পাকিস্তান আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

---

৩৪. মুক্তিযোদ্ধা মুহাম্মদ নূরুল কাদির, দুশো ছেষট্টি দিনে স্বাধীনতা, পৃষ্ঠা-৩২৫।

www.pathagar.com

দি ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস কোমর বেঁধে পাকিস্তান আন্দোলনের বিরোধিতা করতে থাকে। মি. গানধি তো বলেই ফেললেন, "ভারতের অঙ্গচ্ছেদ করার আগে আমার অঙ্গচ্ছেদ কর।"

> "যখন স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ভারত ত্যাগ করতে ব্রিটিশ মনস্থির করে ফেলেছে, তখন কংগ্রেসই যে তার একমাত্র যথার্থ ও একক উত্তরাধিকারী, এই দাবির বিরুদ্ধে সব মহল থেকেই চ্যালেঞ্জ করা হয়।
>
> ১৯৪৫-৪৬ সনের সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস সাধারণ হিন্দু নির্বাচনী এলাকায় খুবই ভালো করে, কিন্তু ভারতীয় মুসলিমদের প্রতিনিধিত্বের দাবি প্রমাণে সে ব্যর্থ হয়। কেন্দ্রীয় আইন সভার নির্বাচনে মুসলিম লীগ মোট মুসলমান ভোটের মধ্যে শতকরা ৮৬.৭ ভাগ ভোট পায়; অথচ এর বিপরীতে কংগ্রেস পায় শতকরা ১.৩ ভাগ।
>
> প্রদেশগুলোতে সব মুসলিম ভোটের মধ্যে মুসলিম লীগ ভোট পায় শতকরা ৭৪.৭ ভাগ, আর কংগ্রেস পায় শতকরা ৪.৬৭ ভাগ।"[৩৫]

উল্লেখ্য, কেন্দ্রীয় আইন সভার নির্বাচন ১৯৪৫ সনে এবং প্রাদেশিক আইন সভাগুলোর নির্বাচন ১৯৪৬ সনে অনুষ্ঠিত হয়।

দেশ ভাগ অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছে দেখে হিন্দুদের উগ্র অংশটি মারমুখো হয়ে ওঠে। তারা ভাবলো, 'ভারত মাতা'কে ভাগ করার আন্দোলন ঠেকাতে হলে মুসলিমদেরকে নির্মূল করতে হবে। এই চিন্তারই ফসল ১৯৪৬ সনের দিল্লী রায়ট। এর পর ১৯৪৬ সনের ১৬ই অগাস্ট রায়ট শুরু হয় বাংলা প্রদেশের রাজধানী কলকাতায়। কলকাতা রায়টে কমপক্ষে পাঁচ হাজার লোক নিহত হয়। নিহতদের মধ্যে মুসলিমদের সংখ্যা ছিলো বেশি।

ক্রমশ হিন্দু-মুসলিম রায়ট সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে।

১৯৪৭ সনের ১৮ই জুলাই বৃটেনের হাউস অব কমন্স-এ প্রধানমন্ত্রী অ্যাটলি উত্থাপিত The Indian Independence Act 1947 পাস হয়।

কংগ্রেস যখন দেখলো দেশ ভাগ ঠেকানো যাচ্ছে না, তখন দলটি দাবি করলো পাঞ্জাব প্রদেশ এবং বাংলা প্রদেশকে মুসলিম ও অমুসলিমদের ঘনত্বের নিরিখে দুই ভাগে বিভক্ত করতে হবে। শত চেষ্টা করেও মুসলিম লীগ পাঞ্জাব প্রদেশ ও বাংলা প্রদেশের বিভক্তি ঠেকাতে পারলো না।

---

৩৫. জয়া চ্যাটার্জি, বেঙল ডিভাইডেড ঃ হিন্দু কমিউনালিজম এন্ড পার্টিশান, বাংলা অনুবাদ ঃ আবু জাফর, বাঙলা ভাগ হল, পৃষ্ঠা-২৬২।

www.pathagar.com

বৃটিশ সরকারকে পাঞ্জাব প্রদেশ এবং বাংলা প্রদেশ ভাগ করতে সম্মত করাতে পেরে কংগ্রেস অনিচ্ছাসত্ত্বেই দেশ ভাগ মেনে নেয়। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ ভেবেছিলেন, খণ্ডিত পাঞ্জাব ও খণ্ডিত বাংলা নিয়ে পাকিস্তান হবে একটি দুর্বল রাষ্ট্র। ফলে এই রাষ্ট্র বেশিদিন টিকে থাকতে পারবে না।
সেই সময় সরদার বল্লভভাই প্যাটেল বলেছিলেন,

> 'আমি জানিনা পাকিস্তানে তাঁরা কী করতে পারবেন, তাঁদের ফিরে আসতে খুব বেশিদিন লাগবে না।"[৩৬]

জওহর লাল নেহরু তাঁর ভাইপো বি.কে. নেহরুকে বলেন,

> 'দেখা যাক কতদিন ওরা আলাদা থাকে।'[৩৭]

(খ) ভারত কর্তৃক জম্মু-কাশমির দখল করে নেওয়ার স্মৃতি

দূর অতীত থেকে শুরু করে আঠারো শতক পর্যন্ত কাশমির মুসলিমদের দ্বারা শাসিত হয়েছে। ১৮১৯ সনে পাঞ্জাবের শিখ রাজা রণজিৎ সিং দুররানী বংশের হাত থেকে কাশমির কেড়ে নেন। গুলাব সিং নামক একজন প্রশাসকের সার্ভিসে সন্তুষ্ট হয়ে রণজিৎ সিং ১৮২০ সনে তাঁকে জম্মুর রাজা বানান। ১৮৪৫ -১৮৪৬ সনে ইংরেজদের সাথে শিখদের যুদ্ধ হয়। এই সময় জম্মুর রাজা নিরপেক্ষ থাকেন। যুদ্ধের পর ইংরেজগণ ৭৫ লাখ রুপির বিনিময়ে জম্মুর রাজা গুলাব সিং-এর হাতে কাশমির তুলে দেন। গুলাব সিং-এর পর যথাক্রমে রণবীর সিং, প্রতাপ সিং এবং হরি সিং জম্মু-কাশমিরের মহারাজা হন।
বৃটিশ শাসনকালে জম্মু-কাশমির একটি গুরুত্বপূর্ণ দেশীয় রাজ্য হিসেবে অবস্থান করে।

১৯৪৭ সনে বৃটিশগণ উপমহাদেশ ছেড়ে যাবার সময় দেশীয় রাজ্যগুলোর সামনে তিনটি অপশন রেখে যায়। যথা-

---

৩৬. Jaswant Singh, Jinnah : India-Partition-Independence, বাংলা অনুবাদঃ শামছুল ইসলাম হায়দার, জিন্নাহ : ভারত-দেশভাগ-স্বাধীনতা, পৃষ্ঠা-৪০৬।

৩৭. Jaswant Singh, Jinnah : India-Partition-Independence, বাংলা অনুবাদঃ শামছুল ইসলাম হায়দার, জিন্নাহ : ভারত-দেশভাগ-স্বাধীনতা, পৃষ্ঠা-৪০৬।

www.pathagar.com

(১) রাজ্য ইচ্ছা করলে ভারতে যোগ দিতে পারবে।
(২) রাজ্য ইচ্ছা করলে পাকিস্তানে যোগ দিতে পারবে।
(৩) রাজ্য ইচ্ছা করলে স্বাধীন অস্তিত্ব বজায় রেখে স্বতন্ত্র থাকতে পারবে।
জম্মু-কাশমিরের জনগণের শতকরা ৭৭ জন ছিলেন মুসলিম। তাঁরা পাকিস্তানে যোগ দিতে আগ্রহী ছিলেন। মহারাজা হরি সিং চাচ্ছিলেন স্বাধীনভাবে অবস্থান করতে। কিন্তু জম্মু-কাশমির ছিলো দি ইনডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের নিকট অতি লোভনীয় একটি স্থান। তদুপরি ভারতের প্রধানমন্ত্রী পন্ডিত জওহরলাল নেহরু ছিলেন কাশমিরের একটি ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান। তিনি চাচ্ছিলেন জম্মু-কাশমির ভারতের অন্তর্ভুক্ত হোক। নানাভাবে চাপ সৃষ্টি করা হয় মহারাজার ওপর। এই চাপ তিনি প্রতিরোধ করতে পারেননি।
১৯৪৭ সনের ২৭শে অকটোবর মহারাজা হরি সিং Instrument of Accession to India নামক দলিলে স্বাক্ষর করতে বাধ্য হন। অতি দ্রুততার সাথে অগ্রসর হয়ে ভারতীয় সৈন্যরা গোটা জম্মু-কাশমির ছেয়ে ফেলে।
এইভাবে কেড়ে নেওয়া হয় জম্মু-কাশমিরের স্বাধীনতা।

(গ) ভারত কর্তৃক হায়দারাবাদ দখল করে নেওয়ার স্মৃতি

হায়দারাবাদ ছিলো বৃটিশ শাসিত দক্ষিণ এশিয়া উপমহাদেশে সবচে' বড়ো দেশীয় রাজ্য। আয়তনে এটি ছিলো বৃটেনের চেয়েও বড়ো।
The Indian Independece Act 1947-এ প্রদত্ত অপশন অনুযায়ী হায়দারাবাদের ঐতিহ্যবাহী বংশের নিযাম হায়দারাবাদকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র রাখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ভারত সরকারের ইচ্ছা ছিলো ভিন্ন। ১৯৪৮ সনের সেপ্টেম্বর মাসে ভারত হায়দারাবাদ আক্রমণ করে। ১৩ই সেপ্টেম্বর ভারতীয় সেনাবাহিনী পাঁচটি রুটে হায়দারাবাদের দিকে অগ্রসর হয়। নিযামের কোন শক্তিশালী সেনাবাহিনী ছিলো না। তাঁর অনুগত ব্যক্তিরা প্রধানমন্ত্রী কাসেম রিজভীর নেতৃত্বে রেযাকার বাহিনী গঠন করে ভারতের আক্রমণ প্রতিহত করার চেষ্টা করে। কিন্তু সুসজ্জিত বিশাল ভারতীয়

www.pathagar.com

সেনাবাহিনীর সাথে তারা এঁটে উঠলো না। ভারতীয় সৈন্যরা প্রাসাদে ঢুকে নিযামকে ঘিরে ফেলে। ১৮ই সেপ্টেম্বর তিনি The Instrument of Accession to India স্বাক্ষর করতে বাধ্য হন।
এইভাবে ভারত হায়দারাবাদের স্বাধীনতা কেড়ে নেয়।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহইয়া খানের সাথে অধ্যাপক গোলাম আযমের সাক্ষাত

১৯৭১ সনের ২২শে নবেম্বর অধ্যাপক গোলাম আযম জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের অধিবেশনে যোগদানের জন্য লাহোর পৌঁছেন।
কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের অধিবেশনে তিনি পূর্ব পাকিস্তানে বিরাজমান পরিস্থিতির একটি বিস্তারিত রিপোর্ট পেশ করেন। রিপোর্টের একাংশে তিনি বলেন, "সেনাবাহিনীর আচরণে জনগণের মধ্যে বিচ্ছিন্নতার মনোভাব বৃদ্ধি পাচ্ছে। তারা মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতা করছে। যারা পূর্বে বিরোধিতা করতো তারাও আর বাধা দেয় না। সীমান্ত এলাকায় রেযাকাররা মুক্তিযোদ্ধাদের মুকাবিলায় এগিয়ে আসে না। কারণ তারা আর জনসমর্থন পায় না।
"সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধাদেরকে ভারতের সেনাবাহিনী সরাসরি পেছন থেকে সাহায্য করছে। এটা জানা গেছে যে ভারত সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে শীতের মওসুমেই বাংলাদেশকে স্বাধীন করার কাজ সমাধা করতে হবে এবং প্রয়োজনে সেনাবাহিনী সরাসরি যুদ্ধ করবে।"
অধ্যাপক গোলাম আযমের রিপোর্ট শুনে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী তাঁকে রাওয়ালপিন্ডি গিয়ে প্রেসিডেন্ট ইয়াহইয়া খানের সাথে সাক্ষাত করার পরামর্শ দেন।
কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের অধিবেশন শেষ হওয়ার পর অধ্যাপক গোলাম আযম রাওয়ালপিন্ডি পৌঁছেন এবং অনেক চেষ্টার পর প্রেসিডেন্টের সাথে সাক্ষাতের সুযোগ পান। সেনাবাহিনীর সদস্যদের অন্যায় আচরণের কথা তিনি প্রেসিডেন্টকে অবহিত করেন এবং তাঁকে পূর্ব পাকিস্তান সফরে এসে সব কিছু প্রত্যক্ষ করার অনুরোধ জানান। প্রেসিডেন্ট ইয়াহইয়া খান অধ্যাপক গোলাম আযমকে বলেন,

www.pathagar.com

'আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পূর্ব পাকিস্তান সংকটের সমাধানের একটা ফর্মুলা নিয়ে কথাবার্তা চলছে। এই মুহূর্তে এই বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা দেওয়া সম্ভব নয়। একটা মিমাংসা হয়ে যাবে বলে আশা করি।'[৩৮]

মুক্তিযুদ্ধের অগ্রগতি

মুক্তি যুদ্ধের প্রথম দিকে ভারত তেমন কোন সাহায্য করেনি। ইস্ট বেংগল রেজিমেন্ট, ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস, পুলিশ বাহিনীর সদস্যগণ এবং তাদের হাতে তৈরি নতুন মুক্তিযোদ্ধারা তাদের হাতে যা ছিলো তা নিয়েই লড়াই করে। আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত পাকিস্তানী সেনাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে শহরে বন্দরে তাদের অবস্থান নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ছিলো সুকঠিন।

৩০শে এপ্রিল ভারত সরকার বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে সাহায্য করার দায়িত্ব ভারতের সশস্ত্র বাহিনীর ওপর অর্পণ করে। ৯ই মে মুক্তিযোদ্ধাদেরকে ট্রেনিং দেওয়ার দায়িত্ব তাদের হাতে দেওয়া হয়। এতে অবস্থার কিছুটা উন্নতি হলেও প্রত্যাশিত সাহায্য পাওয়া গেলো না।

ভারত তখনো বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দেয়নি। একটি রাজনৈতিক সমাধান হয়ে যায় কিনা এবং পাকিস্তানের সাথে যুদ্ধ লেগে গেলে ভারত একা পড়ে যায় কিনা ইত্যাদি চিন্তা ভারত সরকারকে দ্বিধান্বিত করছিলো।

এই প্রেক্ষাপটেই ১৯৭১ সনের ৯ই অগাস্ট 'ভারত-সোভিয়েত ইউনিয়ন মৈত্রী চুক্তি' স্বাক্ষরিত হয়। এতে ভারতের একা হয়ে পড়ার ভয় উবে যায়।

মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর ওপর অতর্কিত হামলা জোরদার করে। বিভিন্ন স্থানে মুতায়েন পাকিস্তানী সৈন্যদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইউনিটগুলো মুক্তিযোদ্ধাদের অতর্কিত হামলায় দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকে।

ইতোমধ্যে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র' একটি প্রতিবেদনে বলে,

> "এ সময়ক্ষেপন কৌশল শুধুমাত্র মুক্তিবাহিনীকে আরো সুসংঘটিত হতে অধিক সময় প্রদান করে। 'র' এর বিশ্লেষণ সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করে যে, মুক্তিবাহিনীর দিনদিন শক্তিবৃদ্ধি সত্ত্বেও পাকিস্তান বাহিনীকে দীর্ঘদিন পর্যন্ত ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব হবে না। সুতরাং 'সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণই' হচ্ছে একমাত্র সমাধান।"[৩৯]

---

৩৮. অধ্যাপক গোলাম আযম, জীবনে যা দেখলাম, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা-২০৭।

৩৯. অশোকা রায়না, ইনসাইড'র', অনুবাদ- লেঃ (অব) আবু রুশ্‌দ, পৃষ্ঠা-৭০।

www.pathagar.com

অর্থাৎ বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের দ্বারা বাংলাদেশ স্বাধীন করা সময়সাপেক্ষ বিধায় ভারতীয় সেনাবাহিনীই এই কাজটি অবিলম্বে সম্পন্ন করে ফেলা প্রয়োজন।

১৯৭১ সনের ৩রা ডিসেম্বর পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহইয়া খান ভারত আক্রমণ করে ভারতকে এই কাংখিত সুযোগ এনে দেন।

১৯৭১ সনের ৬ই ডিসেম্বর ভারত সরকার প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দেয়। অতপর ভারতীয় সেনাবাহিনীর ইস্টার্ন কমান্ডের অধিনায়ক লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার অধীনে ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় সামরিক বাহিনী ও বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনীর সমন্বয়ে "ভারত-বাংলাদেশ মিত্র বাহিনী" গঠনের ঘোষণা দেওয়া হয়।

উল্লেখ্য "ভারত-সোভিয়েত ইউনিয়ন মৈত্রী চুক্তি" স্বাক্ষরিত হওয়ার এক সপ্তাহ পরেও সোভিয়েত ইউনিয়ন ঘোষণা করে যে পাকিস্তানের প্রতি তার আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে।

কিন্তু ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর ক্রেমলিন নেতৃবৃন্দ তাঁদের পলিসিতে পরিবর্তন আনেন। এবার তাঁরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে যুদ্ধে ভারতের বিজয় নিশ্চিত করার মাধ্যমেই তাঁদের লক্ষ্য অর্জন করতে হবে।

পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হওয়ায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ভারতের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনীর কমান্ডারগণ এটি মোটেই পছন্দ করেননি।

মুক্তিযুদ্ধের ওপর নিয়ন্ত্রণ লাভ করার পর বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের চাষের ফসল নিজের গোলায় তোলার জন্য ভারতীয় সেনাবাহিনী দ্রুত ঢাকার দিকে অগ্রসর হয়।

লে. জেনারেল আমীর আবদুল্লাহ খান নিয়াজীর আত্মসমর্পণ

১৯৭১ সনের ৩রা ডিসেম্বর পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধ শুরু হয়। ৬ই ডিসেম্বর ভারতের বিমান বাহিনী ঢাকা বিমান বন্দরে বোমা ফেলে এটি অকেজো করে ফেলে।

www.pathagar.com

১৪ই ডিসেম্বর গভর্ণর ডা. আবদুল মুত্তালিব মালিক গভর্ণর হাউসে মন্ত্রীসভার মিটিং ডাকেন। খবর পেয়ে যায় ভারতীয় সামরিক বাহিনী। ভারতীয় বিমান বাহিনীর এক ঝাঁক হান্টার বিমান গভর্ণর হাউসের ওপর বোমা হামলা চালায়। গভর্ণর ডা. এ. এম. মালিক দৌড়িয়ে নেমে যান ভূ-গর্ভস্থ বাংকারে। সেখানে তিনি ছালাত আদায় করেন। কিছুক্ষণ পর বেরিয়ে এসে তিনি তাঁর মন্ত্রীসভার সদস্যগণ সমেত পদত্যাগ করে আন্তর্জাতিক রেডক্রস সোসাইটি ঘোষিত নিরপেক্ষ এলাকা হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

পরে তাঁরা ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে স্থানান্তরিত হন।

বাংলাদেশের বিভিন্ন রণাংগনে পাকিস্তানী সেনাগণ মুক্তিযোদ্ধাদের হামলায় বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। সেকটার কমান্ডারদের নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধাগণ এগিয়ে আসছিলেন ঢাকার দিকে। এইদিকে লে. জেনারেল আমীর আবদুল্লাহ খান নিয়াজী ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রধান ফিল্ড মার্শাল মানেক শ-র কাছ থেকে আত্মসমর্পণের নির্দেশ পেতে থাকেন। লে. জেনারেল নিয়াজী এবং ফিল্ড মার্শাল মানেক শ-র মাঝে কী কী বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে তার কিছুই প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার জানতো না, জানতেন না মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জেনারেল মুহাম্মাদ আতাউল গনী ওসমানীও।[৪০]

১৬ই ডিসেম্বর বিকেল দুইটার দিকে ভারতীয় সেনাবাহিনীর মেজর জেনারেল জ্যাকব তাঁর কয়েকজন উচ্চ পদস্থ সহকর্মীকে নিয়ে তিনটি সামরিক হেলিকপ্টারে করে ঢাকা আসেন। বিকেল সাড়ে তিনটার দিকে ৮/১০টি সামরিক হেলিকপ্টারে করে লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা তাঁর সহকর্মীগণকে নিয়ে ঢাকা পৌঁছেন। তাঁর সাথে এসেছিলেন গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ.কে. খন্দকার।

বিকেল চারটা ঊনিশ মিনিটে রেসকোর্সে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) লে. জেনারেল আমীর আবদুল্লাহ খান নিয়াজী লে. জেনারেল জগজিৎ সিং

---

৪০. আবুল আসাদ, কালো পঁচিশের আগে ও পরে, পৃষ্ঠা-১৭৭।

www.pathagar.com

অরোরার সম্মুখে আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষর করেন। হাজার হাজার মানুষ এবং শতাধিক দেশী-বিদেশী সাংবাদিক এই অনুষ্ঠান অবলোকন করেন।

বিস্ময়ের ব্যাপার, এতো বড়ো ঘটনায় ভারত সরকার প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের কোন মন্ত্রী এবং মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জেনারেল মুহাম্মাদ আতাউল গনী ওসমানীকে হাজির রাখার কোন প্রয়োজনীয়তাই অনুভব করেনি। এতে অবশ্যই বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের গৌরব ম্লান হয়েছে। সেই দিনই বাংলাদেশের বহুসংখ্যক মানুষের মনে নানা প্রশ্ন সৃষ্টি হয়।

প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের ঢাকা আগমন

১৯৭১ সনের ২২শে ডিসেম্বর একটি ভারতীয় বিমানে করে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এ.এইচ.এম. কামারুজ্জামান, অর্থমন্ত্রী ক্যাপ্টেন (অব.) মনসুর আলী এবং পররাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রী খন্দকার মুশতাক আহমদ ঢাকা পৌঁছেন।

পাকিস্তানের অখণ্ডতায় বিশ্বাসী ব্যক্তিদের ওপর নিপীড়ন

মুসলিম লীগ, পাকিস্তান ডিমোক্রেটিক পার্টি, নেযামে ইসলাম পার্টি, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ও জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানের অখণ্ডতায় বিশ্বাসী ছিলো। এই দলগুলোর নেতৃবৃন্দ তাঁদের বক্তৃতা-ভাষণে পাকিস্তান অখণ্ড থাকার প্রয়োজনীয়তা এবং ভারতের হস্তক্ষেপের সম্ভাব্য ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করে তোলার প্রয়াস চালাতেন। তদুপরি তাঁরা তাঁদের সাধ্য মতো সামরিক বাহিনীর যুল্‌ম থেকে জনগণকে বাঁচাবার চেষ্টা করতেন।

১৯৭১ সনের ১৬ই ডিসেম্বর লে. জেনারেল আমীর আবদুল্লাহ খান নিয়াজীর আত্মসমর্পণের পর পূর্বপাকিস্তান যুগের সমাপ্তি ঘটে। অভ্যুদয় ঘটে 'বাংলাদেশ রাষ্ট্রের'।

যেইসব রাজনৈতিক নেতা পাকিস্তানের অখণ্ডতায় বিশ্বাসী ছিলেন তাঁদের এবং তাঁদের অনুসারীদের ওপর নিপীড়ন শুরু হয়। বিভিন্ন স্থানে অনেকেই

www.pathagar.com

নিহত হন। অনেককেই গ্রেফতার করে বিভিন্ন ক্যাম্পে আটক রাখা হয়। পরে তাঁদেরকে জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

উল্লেখ্য, ডিসেম্বরের শেষ ভাগে লে. জেনারেল আমীর আবদুল্লাহ খান নিয়াজী, রাও ফরমান আলী খান প্রমুখকে হেলিকপ্টারে করে কলকাতা নিয়ে ফোর্ট উইলিয়ামে বন্দি করে রাখা হয়। অন্যান্য যুদ্ধবন্দিদেরকেও ভারতে নিয়ে যাওয়া হয়। যুদ্ধবন্দিদেরকে ভারতে স্থানান্তর ১৯৭২ সনের ১৮ই জানুয়ারির মধ্যেই সম্পন্ন হয়।

আর স্থল পথে ভারতে নিয়ে যাওয়া হয় পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর হাজার হাজার কোটি টাকার অস্ত্র ও বহুবিধ সামরিক সরঞ্জাম।

শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন

ভারতের সাথে যুদ্ধে পাকিস্তান হেরে যাওয়ায় এবং পূর্ব পাকিস্তান রক্ষা করতে না পারায় পাকিস্তানের জনগণ প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহইয়া খানের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। উপায়ান্তর না দেখে প্রেসিডেন্ট পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নেন। ১৯শে ডিসেম্বর জুলফিকার আলী ভূট্টো আমেরিকা থেকে পাকিস্তান পৌঁছে দেশের প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক শাসক পদে অধিষ্ঠিত হন।

১৯৭২ সনের ৩রা জানুয়ারি করাচির এক জনসভায় জুলফিকার আলী ভূট্টো শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তিদানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন।

৭ই জানুয়ারি দিবাগত রাতে একটি চার্টার্ড বিমানে করে তাঁকে লন্ডনের পথে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। স্থানীয় সময় সকাল সাড়ে ছয়টায় তিনি পৌঁছেন হিথরো বিমান বন্দরে। বৃটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী বিমান বন্দরে তাঁকে রিসিভ করেন। তিনি ওঠেন হোটেল ক্ল্যারিজে। সন্ধ্যায় তিনি ১০ নাম্বার ডাউনিং স্ট্রিটে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হীথের সংগে সাক্ষাত করেন।

১৯৭২ সনের ১০ই জানুয়ারি বৃটিশ রাজকীয় বিমানবাহিনীর বিশেষ বিমান 'কমেট' শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়ে দিল্লীর পালাম বিমান বন্দরে অবতরণ করে।

ভারতের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গানধি, মন্ত্রী পরিষদের সদস্যবৃন্দ ও সেনাবাহিনীর তিন প্রধান প্রমুখ তাঁকে সংবর্ধনা জানান।

অতপর তিনি ঢাকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। বিকেল তিনটায় 'কমেট' শেখ

www.pathagar.com

মুজিবুর রহমানকে নিয়ে তেজগাঁও বিমান বন্দরে অবতরণ করে। অগণিত জনতার ভীড়। তেজগাঁও থেকে রেসকোর্স পৌঁছতে তাঁর প্রায় দুই ঘণ্টা সময় লেগে যায়। রেসকোর্সে তিনি দীর্ঘ ভাষণ দেন। ভাষণের একাংশে তিনি বলেন,

> "আমার পশ্চিম পাকিস্তানী ভাইয়েরা, আপনাদের প্রতি আমার কোন বিদ্বেষ নেই। আমি কামনা করি আপনারা সুখে থাকুন। আপনাদের সেনাবাহিনী আমাদের লাখ লাখ লোককে হত্যা করেছে, লাখ লাখ মা- বোনের মর্যাদাহানি করেছে, আমাদের গ্রামগুলো বিধ্বস্ত করেছে। তবুও আপনাদের প্রতি আমার কোন আক্রোশ নেই।"
>
> "বাংলাদেশ পৃথিবীর বৃহত্তম মুসলিম অধ্যুসিত দেশ। ইন্দোনেশিয়ার পরই এর স্থান। মুসলিম সংখ্যার দিক দিয়ে ভারতের স্থান তৃতীয় এবং পাকিস্তানের স্থান চতুর্থ। কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাস, পাকিস্তানী সৈন্যবাহিনী ইসলামের নামে এ দেশের মুসলমানদের হত্যা করেছে, আমাদের নারীদের বে-ইজ্জত করেছে। আমি স্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থহীনভাবে বলছি, আমাদের দেশ হবে গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ ও সমাজতান্ত্রিক দেশ। এ দেশের কৃষক-শ্রমিক, হিন্দু-মুসলমান, বৌদ্ধ-খৃস্টান সবাই সুখে থাকবে, শান্তিতে থাকবে। যার যা ধর্ম তা স্বাধীন ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে পালন করবে।"[৪১]

১৯৭২ সনের ১২ই জানুয়ারি শেখ মুজিবুর রহমান রাষ্ট্রপতির পদে ইস্তফা দেন। রাষ্ট্রপতি হন বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী। শেখ মুজিবুর রহমান প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে গণহত্যা ও ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণের জন্য তদন্ত কমিটি গঠন

১৯৭১ সনের ২২শে ডিসেম্বর প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার কলকাতা থেকে ঢাকা আসে।

ঐ দিনই দৈনিক পূর্বদেশ-এর সম্পাদক জনাব এহতেশাম হায়দার চৌধুরী "ইয়াহইয়া জান্তার ফাঁসি দাও" শীর্ষক একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধ লেখেন।

---

৪১. এম. এ. ওয়াজেদ মিয়া, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ঘিরে কিছু ঘটনা ও বাংলাদেশ, পৃষ্ঠা- ১৩০।

www.pathagar.com

এই নিবন্ধে তিনি বলেন, 'ন' মাসের মুক্তি সংগ্রামে ৩০ লক্ষ লোক নিহত হয়েছে।' সংখ্যাটির উৎস ছিলো আন্দাজ-অনুমান। তখনো মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে নিহত ব্যক্তিদের সংখ্যা নির্ণয়ের জন্য কোন জরিপ কাজ শুরু হয়নি।

১৯৭২ সনের ১০ই জানুয়ারি শেখ মুজিবুর রহমান লন্ডন থেকে দিল্লী হয়ে ঢাকা পৌঁছেন। রেসকোর্সে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে তিনি একটি ভাষণ দেন। এই ভাষণে তিনি বলেন যে মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লাখ লোক নিহত হয়েছে। সম্ভবত দৈনিক পূর্বদেশ-এর উল্লেখিত নিবন্ধটিই ছিলো নিহতদের সংখ্যা সম্পর্কে তাঁর ধারণার উৎস।

১৯৭২ সনের ১৫ই জানুয়ারি শেখ মুজিবুর রহমান গণপরিষদের সদস্য এবং আওয়ামী লীগের কর্মীদেরকে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন হত্যা, লুটতরাজ ও অন্যান্য ক্ষয়ক্ষতির হিসাব ১৫ দিনের মধ্যে আওয়ামী লীগ অফিসে পৌঁছানোর নির্দেশ দেন।

আবার, ১৯৭২ সনের ২৯শে জানুয়ারি শেখ মুজিবুর রহমান মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে গণহত্যা ও ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণের জন্য ১২ সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেন এবং ৩০শে এপ্রিলের মধ্যে রিপোর্ট প্রদানের জন্য কমিটিকে নির্দেশ দেন।

এই কমিটির আহ্বায়ক ছিলেন ডেপুটি ইনস্পেকটার জেনারেল অব পুলিশ জনাব আবদুর রহীম। সদস্য ছিলেন অধ্যাপক খুরশিদ আলম (কুমিল্লা), মাহমুদ হুসাইন খান (বগুড়া), আবদুল হাফিয (যশোর), মহিউদ্দিন আহমদ (এক্স সুপারিনটেনডেন্ট অব পুলিশ), মুহাম্মাদ আলী (ডেপুটি সেক্রেটারি, কৃষি মন্ত্রণালয়), টি হুসাইন (সুপারিনটেনডিং ইঞ্জিনিয়ার), মহিউদ্দিন (ডিরেকটার অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশনস), ড. মুবারাক হুসাইন (ডেপুটি ডিরেকটার, স্বাস্থ্য), উইং কমান্ডার কে.এম. ইসলাম (বাংলাদেশ এয়ারফোর্স) এবং এম.এ. হাই (ডেপুটি সেক্রেটারি, ইসটাবলিশমেন্ট ডিভিশন, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়)।

আওয়ামী লীগের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব গণপরিষদের অন্যতম সদস্য

www.pathagar.com

জনাব এম.এ. মোহাইমেন ১৯৯০ সনের ২৩শে ফেব্রুয়ারি সাপ্তাহিক তারকালোক পত্রিকায় প্রদত্ত এক সাক্ষাতকারে বলেন,

> "পরবর্তী কালে ১৯৭২ সনের প্রথম দিকে আমরা নিহতদের সংখ্যা নিরূপণের প্রয়াস পাই। তখন বৃহত্তর নোয়াখালীর মৃতদের সংখ্যা বের করার দায়িত্ব গণপরিষদের সদস্য হিসেবে আমাকে দেওয়া হয়েছিলো। আমি বিভিন্ন থানা ও ইউনিয়নের সাথে যোগাযোগ করে যে সংখ্যা পেয়েছিলাম, সেটা সাত হাজারের কম। নিহত রাজাকারদের সংখ্যা ধরেও সাড়ে সাত হাজারের বেশি দাঁড়ায়নি। তখন বাংলাদেশে ঊনিশটি জিলা ছিলো। সবকটি জিলাতে যুদ্ধ সমভাবে হয়নি। যেসব জিলায় যুদ্ধের প্রকোপ বেশি হয়েছিলো, তার মধ্যে নোয়াখালী একটি। তাই নোয়াখালী জিলার মৃতের সংখ্যা যা দাঁড়িয়েছিলো, গড়ে ঐ সংখ্যাও যদি সব জিলাতে ধরা যায়, তাতেও লাখ সোয়া লাখের বেশি মৃতের সংখ্যা দাঁড়ায় না।"[৪২]

ঐ সাক্ষাতকারে জনাব এম.এ. মোহাইমেন আরো বলেন, "১৯৭২ সনে সরকারের তরফ থেকে প্রতি নিহতের জন্য দু'হাজার টাকা করে ঘোষণা করা হয়েছিলো। মাত্র ৭২ হাজার দরখাস্ত পড়েছিলো। তার মধ্যে (বাছাইয়ের পর) ৫০ হাজার নিহতের আত্মীয়দেরকে ঘোষিত অর্থ দেওয়া হয়।"

নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর বড়োভাই ব্যারিস্টার শরৎ চন্দ্র বসু। এই শরৎ চন্দ্র বসুরই নাতনি শর্মিলা বসু।

শর্মিলা বসু ১৯৭১ সনে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে আসলে কতো লোক নিহত হয়েছে, তা নির্ণয় করার জন্য দীর্ঘ সময় ধরে গবেষণা কার্যক্রম চালিয়েছেন। তাঁর গবেষণা গ্রন্থটি "ডেড রেকনিং" নামে লন্ডন থেকে প্রকাশিত হয়েছে। সেই গ্রন্থে তিনি বলেন,

> "From the available evidence descussed in this study, it appears possible to estimate with reasonable confidence that at least 50,000-100,000 people perished in the conflict of East Pakistan/Bangladesh in 1971...."
>
> অর্থাৎ তাঁর মতে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে অন্তত ৫০ হাজার থেকে এক লাখ লোক নিহত হয়েছে।[৪৩]

---

৪২. উদ্ধৃত, আবুল আসাদ, কালো পঁচিশের আগে ও পরে, পৃষ্ঠা : ২৭৬-২৭৭।

৪৩. শর্মিলা বসু, ডেড রেকনিং, পৃষ্ঠা-১৮১।

www.pathagar.com

বহু গ্রন্থ প্রণেতা খন্দকার আবুল খায়ের ১৯৭১ সন থেকে ১৯৭৫ সন পর্যন্ত সময়ে হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে বলেন, "লোক মরেছে ৪ পর্যায়ে। যথা-

১. ২৫শে মার্চের পূর্ব পর্যন্ত।
২. ২৫শে মার্চ থেকে ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত।
৩. ১৬ ডিসেম্বর থেকে অস্ত্র জমা দেয়ার পূর্ব পর্যন্ত।
৪. অস্ত্র জমা দেয়ার পর থেকে ৭৫-এর ১৫ই আগস্ট পর্যন্ত।

- ২৫শে মার্চের পূর্বে এক বিশেষ মহল থেকে একটা ধুয়া তুলে দেয়া হল যে বিহারী বাঙ্গালী একে অপরের শত্রু। এই ধুয়া তুলে উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ সৃষ্টি করে দেয়া হয়। এতে বাঙালী বিহারী উভয় পক্ষই মারে এবং মরে। তবে বিহারী মরে বেশি। এই সময় কোন পক্ষে কত মরল তার কোন সরকারী হিসাব সংরক্ষণ করা হয়েছে কি না তা আমাদের জানা নেই।
- ২৫শে মার্চের পর থেকে ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত। এই সময় ছিল যুদ্ধাবস্থা। এই সময় উভয় পক্ষ মরেছে। তবে বাঙ্গালীরাই মরেছে বেশি। এ সময় মরার কোন সরকারী হিসাব আমরা পাইনি।
- ১৬ই ডিসেম্বরের পর থেকে অস্ত্র জমা দেয়ার পূর্ব পর্যন্ত মেরেছে তারাই যাদের হাতে অস্ত্র ছিল। আর মরেছে তারাই যাদের হাতে অস্ত্র ছিল না এবং যারা ছিল ইসলামপন্থী।....
- অস্ত্র জমা দেয়ার পরও রাজনৈতিক হত্যা চালু থাকে '৭৫-এর ১৫ই আগস্ট পর্যন্ত।"

১৯৭১ সনে নিহত ব্যক্তিদের সংখ্যা সম্পর্কে তিনি বলেন,

"... ঐ সময় গ্রামের সংখ্যা ছিলো ৬৮,৩৮৫, ইউনিয়ন ছিলো ৪,৪৭২ আর বাড়ি সংখ্যা ছিলো ১,২৬,৭৩,০০০। ১৯৭১ সনে লোক সংখ্যা ছিলো ৬,৯৭,৭৪,০০০ আর ১৯৭২ সনে লোক সংখ্যা ছিলো ৭,২৩,৯২,০০০। আমরা যদি ৩০ লাখকে ৬৮ হাজার গ্রাম দিয়ে ভাগ করি তাহলে মোটামুটি একটা হিসাব পেতে পারি যে (৩০ লাখ লোক মরলে) প্রতি গ্রাম থেকে গড়ে ৪৫ জন করে লোক মরলে ৬৮ হাজার গ্রাম থেকে ৩০ লাখ লোক

www.pathagar.com

মরে। প্রতি ৪টি বাড়ি থেকে মরা লাগে গড়ে ১ জন করে এবং ৭ কোটি লোক থেকে ৩০ লাখ মরলে প্রতি ২৩ জনে ১ জন করে মরা লাগে।

এখন আপনারা যাঁরা ১৯৭১ সনের ঘটনা স্বচক্ষে দেখেছেন তাঁরা বলুন-

১. প্রতি গ্রাম থেকে কি গড়ে ৪৫ জন লোক মরেছে?

২. প্রতি ৪টি বাড়ি থেকে কি গড়ে ১জন লোক মরেছে?

৩. প্রতি ২৩ জনে কি গড়ে ১ জন লোক মরেছে?"[৪৪]

The British Medical Journal -এর একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে,

> "As many as 269,000 people died during the war leading to the liberation of Bangladesh in 1971."[৪৫]
>
> '১৯৭১ সনে সংঘটিত বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে ২,৬৯,০০০ (দুই লক্ষ উনসত্তর হাজার) জন মানুষ নিহত হয়েছে।'

উল্লেখ্য, ১৯৭২ সনের ২৯শে জানুয়ারি শেখ মুজিবুর রহমান গণহত্যা ও ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণের জন্য ১২ সদস্য বিশিষ্ট যেই সরকারী তদন্ত কমিটি গঠন করেছিলেন, সেই কমিটির রিপোর্ট জনসমক্ষে প্রকাশ করা হয়নি।

শেখ মুজিবুর রহমানের একটি বড়ো কৃতিত্ব

১৯৭২ সনের ৬ই ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিবুর রহমান কলকাতা সফরে যান। কলকাতার প্যারেড গ্রাউন্ডে এক বিরাট জনসভায় তিনি বক্তব্য রাখেন। অতপর ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গানধির সাথে তিনি একটি বৈঠকে বসেন।

শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশ ভূ-খণ্ড থেকে ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহারের বিষয়টি উত্থাপন করেন। এমন প্রস্তাবে ইন্দিরা গানধি একটু অপ্রস্তুত হয়ে যান। তিনি বলেন, "বাংলাদেশের আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি তো এখনও

---

৪৪. খন্দকার আবুল খায়ের, ৭১-এ কি ঘটেছিল রাজাকার কারা ছিল, পৃষ্ঠা-৬,৭,৮,৯।

৪৫. http://timesofindia.indiatimes.com/world/rest-of-world

www.pathagar.com

নাজুক। পুরো 'সিচুয়েশন' বাংলাদেশ সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করাটা কি বাঞ্ছনীয় নয়?"

এই বিষয়ে আরো কিছুক্ষণ আলোচনা চলে। এই বিষয়ে শেখ মুজিবুর রহমান দৃঢ়তা দেখাতে সক্ষম হন। তাঁর জনপ্রিয়তা তখন আকাশচুম্বী। শ্রীমতি ইন্দিরা গানধি তাঁকে নাখোশ করা সমীচীন মনে করেননি।

সিদ্ধান্ত হয় যে ১৯৭২ সনের ১৭ই মার্চ থেকে ২৫শে মার্চের মধ্যে সমস্ত ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহার করে নেওয়া হবে।

সন্দেহ নেই, সৈন্য প্রত্যাহারে শ্রীমতি ইন্দিরা গানধিকে রাজি করতে পারাটা ছিলো শেখ মুজিবুর রহমানের একটি বড়ো কৃতিত্ব।

'জাতীয় রক্ষী বাহিনী' গঠন

১৯৭২ সনের ৭ই মার্চ শেখ মুজিবুর রহমান 'জাতীয় রক্ষী বাহিনী' নামে একটি প্যারামিলিটারী বাহিনী গঠন করেন এবং ১লা ফেব্রুয়ারি তারিখ থেকে এই আদেশ কার্যকর গণ্য হবে বলে নির্দেশ দেন।

এই আদেশে বলা হয় যে 'সুনির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনবোধে এই বাহিনীকে অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃংখলার কাজে বেসামরিক কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করার জন্য নিয়োগ করতে পারবে।'

'আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব মনে করতেন যে প্রাতিষ্ঠানিক কোন সেনাবাহিনী ছাড়াই দেশ দ্রুততর গতিতে উন্নতির পথে এগিয়ে যেতে পারবে। কেবলমাত্র আনুষ্ঠানিক কাজ চালিয়ে নেওয়ার জন্য সেনাবাহিনী থাকা উচিত।'

'আওয়ামী লীগ নেতারা সেনাবাহিনীর মতো একটি সুসংগঠিত প্রতিষ্ঠানকে ক্ষমতাসীন সরকারের প্রতি একটি হুমকি হিসেবেই মনে করতেন।'

'প্রকৃতপক্ষে সামরিক সংগঠনের সঙ্গে ভারসাম্য বিধানের জন্য রাজনৈতিক প্রেরণা থেকেই এই বাহিনী গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিলো।'[৪৬]

---

৪৬. মওদুদ আহমদ, বাংলাদেশ : শেখ মুজিবর রহমানের শাসনকাল, পৃষ্ঠা-৭৫।

www.pathagar.com

বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন

১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল তারিখে মুজিবনগর সরকারের জারিকৃত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র

"যেহেতু একটি সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য ১৯৭০ সনের ৭ই ডিসেম্বর হইতে ১৯৭১ সনের ১৭ই জানুয়ারি পর্যন্ত বাংলাদেশে অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, এবং যেহেতু এই নির্বাচনে বাংলাদেশের জনগণ ১৬৯ জন প্রতিনিধির মধ্যে আওয়ামী লীগ দলীয় ১৬৭ জনকে নির্বাচিত করেন, এবং যেহেতু সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে জেনারেল ইয়াহিয়া খান জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণকে ১৯৭১ সনের ৩রা মার্চ তারিখে মিলিত হইবার জন্য আহ্বান করেন, এবং যেহেতু এই আহুত পরিষদ-সভা স্বেচ্ছাচারী ও বেআইনীভাবে অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করা হয়, এবং যেহেতু পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষ তাহাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষার পরিবর্তে এবং বাংলাদেশের প্রতিনিধিগণের সহিত আলোচনা অব্যাহত থাকা অবস্থায় একটি অন্যায় ও বিশ্বাসঘাতকতামূলক যুদ্ধ ঘোষণা করে, এবং যেহেতু এইরূপ বিশ্বাসঘাতকতামূলক আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের আইনানুগ অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৭১ সনের ২৬ মার্চ তারিখে ঢাকায় যথাযথভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদান করেন এবং বাংলাদেশের মর্যাদা ও অখণ্ডতা রক্ষার জন্য বাংলাদেশের জনগণের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান, এবং যেহেতু একটি বর্বর ও নৃশংস যুদ্ধ পরিচালনায় পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষ, অন্যান্যদের মধ্যে, বাংলাদেশের বেসামরিক ও নিরস্ত্র জনগণের উপর নজীরবিহীন নির্যাতন ও গণহত্যার অসংখ্য অপরাধ সংঘঠন করিয়াছে এবং এখনও অনবরত করিয়া চলিতেছে, এবং যেহেতু পাকিস্তান সরকার একটি অন্যায় যুদ্ধ চাপাইয়া দিয়া, গণহত্যা করিয়া এবং অন্যান্য দমনমূলক কার্যকলাপের মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রতিনিধিগণের পক্ষে একত্রিত হইয়া

www.pathagar.com

একটি সংবিধান প্রণয়ন এবং নিজেদের মধ্যে একটি সরকার প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব করিয়া তুলিয়াছে, এবং যেহেতু বাংলাদেশের জনগণ তাহাদের বীরত্ব, সাহসিকতা ও বিপ্লবী উদ্দীপনার মাধ্যমে বাংলাদেশের ভূখণ্ডের উপর তাহাদের কার্যকর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছে,

সেহেতু আমরা বাংলাদেশের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ, বাংলাদেশের সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী জনগণ কর্তৃক আমাদিগকে প্রদত্ত কর্তৃত্বের মর্যাদা রক্ষার্থে, নিজেদের সমন্বয়ে যথাযথভাবে একটি গণপরিষদরূপে গঠন করিলাম, এবং পারস্পারিক আলোচনা করিয়া, এবং বাংলাদেশের জনগণের জন্য সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার নিশ্চিত করণার্থে, সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্ররূপে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করিলাম এবং তদ্বারা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ইতিপূর্বে ঘোষিত স্বাধীনতা দৃঢ়ভাবে সমর্থন ও অনুমোদন করিলাম, এবং এতদ্দ্বারা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছি যে, সংবিধান প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি থাকিবেন এবং সৈয়দ নজরুল ইসলাম প্রজাতন্ত্রের উপ-রাষ্ট্রপতি থাকিবেন, এবং রাষ্ট্রপতি প্রজাতন্ত্রের সকল সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হইবেন, ক্ষমা প্রদর্শনের ক্ষমতাসহ প্রজাতন্ত্রের সকল নির্বাহী ও আইন প্রণয়ন ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন, একজন প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ এবং তাঁহার বিবেচনায় প্রয়োজনীয় অন্যান্য মন্ত্রী নিয়োগ ক্ষমতার অধিকারী হইবেন, কর আরোপণ ও অর্থ ব্যয়ন ক্ষমতার অধিকারী হইবেন, এবং বাংলাদেশের জনগণকে একটি নিয়মতান্ত্রিক ও ন্যায়ানুগ সরকার প্রদানের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অন্যান্য সকল কার্য করিতে পারিবেন।

আমরা বাংলাদেশের জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ আরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছি যে, কোন কারণে রাষ্ট্রপতি না থাকা বা রাষ্ট্রপতি তাঁহার কার্যভার গ্রহণ করিতে অসমর্থ হওয়া বা তাঁহার ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে অসমর্থ হওয়ার ক্ষেত্রে, রাষ্ট্রপতির উপর এতদ্বারা অর্পিত সমুদয় ক্ষমতা, কর্তব্য ও দায়িত্ব উপ-রাষ্ট্রপতির থাকিবে এবং উহা প্রয়োগ ও পালন করিবেন।

www.pathagar.com

আমরা আরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছি যে, জাতিসমন্ডলীর সদস্য হিসাবে আমাদের উপর যে দায় ও দায়িত্ব বর্তাইবে উহা পালন ও বাস্তবায়ন করার এবং জাতিসংঘের সনদ মানিয়া চলার প্রতিশ্রুতি আমরা দিতেছি।

আমরা আরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছি যে, স্বাধীনতার এই ঘোষণাপত্র ১৯৭১ সনের ২৬শে মার্চ তারিখে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

আমরা আরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছি যে, এই দলিল কার্যকর করার লক্ষ্যে এবং রাষ্ট্রপতি ও উপ-রাষ্ট্রপতির শপথ পরিচালনার জন্য আমরা অধ্যাপক ইউসুফ আলীকে আমাদের যথাযথ ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি নিয়োগ করিলাম।"

–গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান

অকটোবর, ২০১১ ইং, (পৃষ্ঠা: ১৫৪–১৫৬)

উল্লেখ্য, (১) শেখ মুজিবুর রহমান ২৬শে মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন কথাটি অকাট্য নয়।

(২) মহিলা আসন সংখ্যা যোগ করে গণপরিষদের সদস্য সংখ্যা দাঁড়ায় ১৬৯।

লক্ষ্য করার বিষয় 'স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে'র কোথাও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ কায়েমের অঙ্গীকার নেই। তেমনিভাবে অঙ্গীকার নেই সমাজতন্ত্র কায়েমের। বরং এতে অভিব্যক্ত হয়েছে অন্যায় ও যুলমের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো-র অঙ্গীকার।

১৯৭২ সনের ৪ঠা নবেম্বর গণপরিষদ বাংলাদেশের সংবিধান পাস করে এবং এই সংবিধান ১৬ই ডিসেম্বর থেকে কার্যকর হবে বলে প্রস্তাব গ্রহণ করে।

জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদকে রাষ্ট্রীয় মূলনীতি রূপে সংবিধানে সন্নিবেশিত করা হয়।

ধর্মের ভিত্তিতে রাজনৈতিক দল গঠন করার পথও রুদ্ধ করা হয়।

এই সংবিধানের ৩৮ নাম্বার অনুচ্ছেদটি ছিলো নিম্নরূপ ঃ

"জনশৃংখলা ও নৈতিকতার স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসংগত বাধা নিষেধ সাপেক্ষে সমিতি ও সংঘ গঠন করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের

www.pathagar.com

থাকিবে। তবে শর্ত থাকে যে, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসম্পন্ন বা লক্ষ্যানুসারী কোন সাম্প্রদায়িক সমিতি বা সংঘ অনুরূপ উদ্দেশ্যসম্পন্ন বা লক্ষ্যানুসারী ধর্মীয় নামযুক্ত বা ধর্মভিত্তিক অন্য কোন সমিতি বা সংঘ গঠন করিবার বা তাহার তৎপরতায় অংশগ্রহণ করিবার অধিকার কোন ব্যক্তির থাকিবে না।"

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ প্রসংগে মুক্তিযুদ্ধের ৯ নাম্বার সেকটারের কমান্ডার মেজর (অব) এম.এ. জলিলের একটি বক্তব্য খুবই প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন,

"সত্তরের শেষ এবং একাত্তরের শুরুর সেই অগ্নিঝরা দিনগুলোতে পূর্ব পাকিস্তানের সংগ্রামী জনগণের মাঝে বিজাতীয়দের প্রতি চরম ঘৃণা ও বিদ্বেষ পরিলক্ষিত হলেও ইসলাম ধর্মের প্রতি বিদ্বেষ মোটেও পরিলক্ষিত হয়নি, অথবা ধর্মহীনতা আমাদের পেয়ে বসেনি। তৎকালীন সময়ে কট্টর আওয়ামী লীগার বলে পরিচিত নেতা কর্মীদের মুখে 'ধর্মনিরপেক্ষতার' নামগন্ধও আমি শুনতে পাইনি। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী দামাল তরুণ-যুবকদের অধিকাংশই ছিল এদেশের ধর্মপ্রাণ মুসলিমদের সন্তান-সন্ততি। যুদ্ধের রক্তাক্ত ময়দানেও আমি মুক্তিযোদ্ধাদের দেখেছি বাকায়দা নামায পড়তে, দুরুদ পাঠ করতে।"[৪৭]

সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ছিলো বাংলাদেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর চিন্তাচেতনার সাথে সাংঘর্ষিক। বলা চলে, এইগুলোকে গণমানুষের ইচ্ছাআকাংখার বিরুদ্ধে তাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। জামায়াতে ইসলামী ও অন্যান্য ইসলামী দল তখন নিষিদ্ধ ছিলো। দেশের সর্বত্র আওয়ামী লীগের একচ্ছত্র দাপট। সেই জন্য গণমানুষের চিন্তাচেতনা বিরোধী নীতিগুলোর বিরুদ্ধে তখন কোন আওয়াজ তোলা সম্ভব হয়নি।

দালাল আইনে অভিযুক্তদের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন

১৯৭২ সনের ২৪শে জানুয়ারি শেখ মুজিবুর রহমান "দালাল (বিশেষ ট্রাইবুনাল) আদেশ" জারি করেন। স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালে যেইসব সিভিলিয়ান পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর সহযোগিতা করেছিলো তাদের বিচারের জন্য তৈরি হয় এই আইন।

১৯৭২ সনের মার্চ মাসেই দালাল আইনের অপব্যবহার দেখে আতাউর

৪৭. আতিক হেলাল সম্পাদিত, মেজর জলিল রচনাবলী, পৃষ্ঠা-৩৫।

www.pathagar.com

রহমান খান বলেন, 'জাতি পুনর্গঠনের মতো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সমাধা না করে সরকার সারা দেশে দালাল এবং কল্পিত শত্রুদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ায় রত হয়েছেন। মনে হচ্ছে এটাই যেন সরকারের সব চাইতে প্রধান কর্তব্য'।

তিনি বলেন, 'যারা ভিন্ন রাজনৈতিক মত পোষণ করতেন, অথচ খুন, অগ্নিসংযোগ, নারী ধর্ষণ কিংবা লুটপাটের মতো জঘন্য কার্যে প্রবৃত্ত হননি, তাদের ওপর গুরুতর শাস্তি আরোপের মাধ্যমে দেশের কোনো উপকার হবে না।'[৪৮]

[উল্লেখ্য যে ১৯৭২ সনের ২৯শে অগাস্ট সরকার দালাল আইন সংশোধন করে একটি অধ্যাদেশ জারি করে। এই সংশোধিত আইনে সর্বোচ্চ সাজা মৃত্যুদণ্ড এবং সর্বনিম্ন সাজা তিন বছর কারাদণ্ড করা হয়।]
১৯৭২ সনের ২০শে নবেম্বর "দালাল (বিশেষ ট্রাইবুনাল) আইনে" পূর্ব পাকিস্তানের সর্বশেষ গভর্ণর ডা. আবদুল মুত্তালিব মালিককে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রদান করা হয়।

মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, অধ্যাপক আবুল ফজল, ড. আলিম আল-রাজী প্রমুখ ব্যক্তি "দালাল (বিশেষ ট্রাইবুনাল) আইনে"র বিরোধিতা করতে থাকেন। বন্দি ছিলো বিপুল সংখ্যক। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণ করার মতো কোন তথ্য-উপাত্ত সরকারের হাতে ছিলো না।

১৯৭৩ সনের ৩০শে নবেম্বর সব কিছু বিবেচনা করে শেখ মুজিবুর রহমান দালাল আইনে আটক ও অভিযুক্ত ব্যক্তিদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন। এই ঘোষণার পর মুসলিম লীগ, ডিমোক্রেটিক পার্টি, নেযামে ইসলাম পার্টি, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম এবং জামায়াতে ইসলামীর ৩৪,৬০০ জন নেতা ও কর্মী জেল থেকে মুক্তি লাভ করেন।[৪৯]

---

৪৮. মওদুদ আহমদ, বাংলাদেশ : শেখ মুজিবর রহমানের শাসনকাল, পৃষ্ঠা-৭১।
৪৯. এম. এ. ওয়াজেদ মিয়া, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ঘিরে কিছু ঘটনা ও বাংলাদেশ, পৃষ্ঠা : ১৮০-১৮১।

www.pathagar.com

১৯৭৩ সনের ৭ই মার্চ অনুষ্ঠিত প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামীর অনুপস্থিতি

১৯৭৩ সনের ৭ই মার্চ অনুষ্ঠিত হয় প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন।

এই নির্বাচনে মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী গঠিত "অল পার্টিজ এ্যাকশন কমিটি" ২০১ জন প্রার্থী দাঁড় করায়। মস্কোপন্থী ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি ২২৫ আসনে এবং মেজর (অব.) এম.এ. জলিল এবং আ.স.ম. আবদুর রব গঠিত জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল ২৩৭ আসনে প্রার্থী দেয়।

> "... সরকারি দল নির্বাচনকে কঠোরভাবে গ্রহণ করে তাদের প্রতিটি প্রার্থীর বিজয় সুনিশ্চিত করতে উদ্যোগ নেয়ায় নির্বাচনে ব্যাপক সন্ত্রাস ছড়িয়ে পড়ে এবং নির্বাচনি সন্ত্রাসে ৫০ জন নিহত হন। সরকার দলীয় কর্মীদের আক্রমণে জাসদ প্রধানও আহত হন।"[৫০]

এই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ২৯৩টি আসনে, জাসদ ১টি আসনে, জাতীয় লীগ ১টি আসনে এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীরা ৫টি আসনে বিজয়ী হন।

এই নির্বাচনে সরকার পুলিশবাহিনী এবং রক্ষীবাহিনীকে দিয়ে বিরোধী দলের নমিনিদের পরাজয় নিশ্চিত করেছে বলে অভিযোগ উত্থাপিত হয়। ভোট গণনাকালে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের প্রধান মেজর (অব.) এম.এ. জলিল সরকারি দলের প্রার্থীর চেয়ে অনেক ভোটের ব্যবধানে এগিয়ে থাকলেও টেলিভিশনে হঠাৎ ফল প্রচার বন্ধ করে, পরে তাঁকে পরাজিত ঘোষণা করা হয়।

ঐ সময় মুসলিম লীগ, নেযামে ইসলাম পার্টি, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম এবং জামায়াতে ইসলামী সাংবিধানিকভাবেই নিষিদ্ধ ছিলো। তাছাড়া এইসব দলের নেতা ও কর্মীদের অনেকেই ছিলেন বন্দি। ফলে এই নির্বাচনে ইসলামী শক্তি কোন ভূমিকা পালন করার সুযোগ পায়নি।

---

৫০. মুহাম্মদ ইয়াহইয়া আখতার, অভিনব সরকার ব্যতিক্রমি নির্বাচন, পৃষ্ঠা-২২।

www.pathagar.com

৯৩ হাজার যুদ্ধবন্দির প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন

১৯৭৩ সনের ১৭ই এপ্রিল বাংলাদেশ ও ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদ্বয় দিল্লীতে অনুষ্ঠিত বৈঠকের পর এক যুক্ত ঘোষণায় যুদ্ধবন্দিদের বিষয়টি মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করার পক্ষে ঐকমত্য প্রকাশ করেন। পাকিস্তানী সামরিক ও বেসামরিক ৯৩ হাজার বন্দির মধ্য থেকে ১৯৫ জন কর্মকর্তাকে বাদ দিয়ে অবশিষ্টদেরকে পাকিস্তানে ফেরত পাঠানোর ইংগিতও দেওয়া হয়।

আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইবুনাল) আইন প্রণয়ন

১৯৭৩ সনের ১৪ জুলাই বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ ১৯৫ জন যুদ্ধাপরাধীর বিচারের জন্য 'আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইবুনাল) আইন' পাস করে।

যুদ্ধ চলাকালে কাউকে হত্যা করা, কারো বাড়ি লুট করা, কারো বাড়িতে আগুন দেওয়া এবং কোন মহিলাকে ধর্ষণ করার বিচারের জন্য এই আইন তৈরি করা হয়।

ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনে শেখ মুজিবুর রহমান

১৯৭৪ সনের ২২শে ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান, ইরান ও তুর্কী বাংলাদেশকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।

১৯৭৪ সনের ২২শে ফেব্রুয়ারি এক সংবাদ বুলেটিনে বলা হয় শেখ মুজিবুর রহমান ২৩-২৪ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের ঐতিহ্যবাহী শহর লাহোরে অনুষ্ঠিতব্য ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনে যোগদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

এটি ছিলো শেখ মুজিবুর রহমানের একটি সাহসী সিদ্ধান্ত। একটি সঠিক সিদ্ধান্ত।

অবশ্যই ভারত এই পদক্ষেপ ভালো চোখে দেখেনি।

শেখ ফজলুল হক মনি এই সিদ্ধান্তে দারুন নাখোশ হন। তিনি বেগম মুজিবের মাধ্যমে শেখ মুজিবুর রহমানের এই সিদ্ধান্ত পাল্টাবার চেষ্টা করেন।[৫১]

---

৫১. এম. এ. ওয়াজেদ মিয়া, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ঘিরে কিছু ঘটনা ও বাংলাদেশ, পৃষ্ঠা-১৮৯।

www.pathagar.com

শেখ মুজিবুর রহমান বলেন,

> "আমার লাহোর যাওয়ার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করার আর কোন অবকাশ নেই। কারণ, সাউদী আরবের বাদশাহ ফায়সাল লাহোর সম্মেলনে যোগদান করার জন্য ব্যক্তিগতভাবে অনুরোধ জানিয়ে আমার নিকট তারবার্তা পাঠিয়েছেন। উপরন্তু আমার শুভাকাংখী ও সুহৃদ বন্ধু আলজেরিয়ার প্রেসিডেন্ট হুয়ারি বুমেদিন তাঁর প্রেসিডেনশ্যাল প্লেন পাঠিয়েছেন আমাকে লাহোর নেওয়ার জন্য এবং ঐ প্লেনটি ইতোমধ্যেই ঢাকা পৌঁছেছে। সুতরাং আমার লাহোর যাওয়ার সিদ্ধান্ত বাতিল করা সমীচীন হবে না।"[৫২]

বিকেলে অনুষ্ঠিত মন্ত্রীসভার বৈঠকেও এই বিষয়ে মতভেদ দেখা দেয়। কিন্তু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর সিদ্ধান্তে অটল থাকেন।

২৩শে ফেব্রুয়ারি তিনি লাহোর পৌঁছেন। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভূট্টো তাঁকে বিমান বন্দরে রিসিভ করেন। সম্মেলনে তিনি মুসলিম জাহানের নেতৃবৃন্দ দ্বারা বিপুলভাবে সমাদৃত হন। সম্মেলন শেষে তাঁকে লাহোরের ইতিহাসখ্যাত শালিমার গার্ডেনে গণসংবর্ধনা দেওয়া হয়।

অভিযুক্ত ১৯৫ জন যুদ্ধাপরাধীর প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন

১৯৭৪ সনের ৫ই এপ্রিল দিল্লীতে ভারত, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের মিটিং শুরু হয়। ৯ই এপ্রিল এই মিটিং শেষ হয়। ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সরদার শরণ সিং, বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. কামাল হোসেন এবং পাকিস্তানের পররাষ্ট্রপ্রতিমন্ত্রী মি. আযিয আহমদ ১৯৫ জন অভিযুক্ত যুদ্ধাপরাধীর মুক্তির বিষয়ে একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

১৯৭৪ সনের ৯ই এপ্রিল বিকেলে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে পাকিস্তানের অভিযুক্ত ১৯৫ জন যুদ্ধাপরাধীর প্রতি ক্ষমা প্রদর্শনের ঘোষণা দেওয়া হয়।

একদলীয় শাসন প্রবর্তন

শেখ মুজিবুর রহমানের সরকার দেশে সুশাসন কায়েম করতে পারেনি। গণমানুষের সমস্যা সমাধানে সরকারের ব্যর্থতা ছিলো বিশাল। খাদ্য, বস্ত্র ও অন্যান্য সামগ্রী দুষ্প্রাপ্য হয়ে পড়ে। আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটতে থাকে। মানুষের মাঝে অস্বস্তি, অসন্তোষ ও অস্থিরতা দেখা দেয়।

---

৫২. এম. এ. ওয়াজেদ মিয়া, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ঘিরে কিছু ঘটনা ও বাংলাদেশ, পৃষ্ঠা-১৮৯।

www.pathagar.com

এই সময় আওয়ামীলীগ ও পুঁজিবাদবিরোধী বামদের তৎপরতা উল্লেখযোগ্য হারে বেড়ে যায়। সিরাজ শিকদারের পূর্ব বাংলা সর্বহারা পার্টি "স্বাধীনতার নামে বাংলাদেশ ভারতের পদানত" বলে প্রচারণা চালাতে থাকে। সিরাজ শিকদার "স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা" কায়েমের জন্য সশস্ত্র সংগ্রামের আহ্বান জানান। এই সময় হক, তোয়াহা, মতিন, আলাউদ্দিন, দেবেন শিকদার, শান্তি সেন, অমল সেন প্রমুখের নেতৃত্বাধীন গুপ্ত সংগঠনগুলো ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়ন বিরোধী শ্লোগান দেওয়া শুরু করে এবং শুরু করে "জাতীয় দুশমন" খতমের অভিযান।

১৯৭৩ সনে এসে আইন শৃংখলা পরিস্থিতির আরো অবনতি হতে থাকে। মে মাসে এসে গুপ্ত হত্যার শিকার ব্যক্তিদের সংখ্যা দাঁড়ায় ৪৯২৫।

১৯৭৪ সনে দেশের সর্বত্র বিভিন্ন থানার ওপর সশস্ত্র হামলা বৃদ্ধি পায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য শেখ মুজিবুর রহমান এক অদ্ভূত সিদ্ধান্ত নেন। তিনি গোটা দেশ কঠোর নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য বহু দলীয় ব্যবস্থা বিলুপ্ত করে এক দলীয় শাসন কায়েমের পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

এই লক্ষ্যেই ১৯৭৫ সনের ২৫শে জানুয়ারি জাতীয় সংসদে সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী উত্থাপিত ও গৃহীত হয়।

ঐদিনই শেখ মুজিবুর রহমান নতুন রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। ২৬শে জানুয়ারি তিনি ক্যাপ্টেন (অবঃ) মনসুর আলীকে প্রধানমন্ত্রী করে ১৭ সদস্য বিশিষ্ট মন্ত্রীসভা গঠন করেন। তবে তাজউদ্দিন আহমদকে মন্ত্রীসভার অন্তর্ভুক্ত করেননি।

২৪শে ফেব্রুয়ারি আওয়ামী লীগ, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি ও ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মোজাফফর) একীভূত হয়ে "বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ" (বাকশাল) নামে একটি নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করে।

এই দলের কেন্দ্রীয় কার্যকরি কমিটিতে ছিলেন-

১. শেখ মুজিবুর রহমান (চেয়ারম্যান), ২. সৈয়দ নজরুল ইসলাম, ৩. ক্যাপ্টেন (অবঃ) এম. মনসুর আলী (সেক্রেটারী জেনারেল), ৪. খন্দকার মুশতাক আহমদ, ৫. এ.এইচ.এম. কামারুজ্জামান, ৬. আবদুল মালেক

www.pathagar.com

উকিল, ৭. শ্রী মনোরঞ্জন ধর, ৯. ড. মুজাফফর আহমদ, ১০. শেখ আবদুল আযিয, ১১. মহিউদ্দিন আহমদ, ১২. গাজি গোলাম মুস্তফা।

লক্ষ্য করার বিষয়, এই কমিটিতেও প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।

মুসলিম লীগ, ডিমোক্রেটিক পার্টি, নেযামে ইসলাম পার্টি, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম এবং জামায়াতে ইসলামী পূর্ব থেকেই বেআইনী ছিলো। এবার বেআইনী দলের তালিকায় যুক্ত হলো : জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল, বাংলাদেশ জাতীয় লীগ, বাংলাদেশ লেবার পার্টি, জাতীয় গণতন্ত্রী দল, জাতীয় গণমুক্তি ইউনিয়ন এবং ইউনাইটেড পিপলস পার্টি।

একদলীয় শাসন প্রবর্তন ছিলো একটি অপরিণামদর্শী পদক্ষেপ। যাঁর নামে বাংলাদেশের মানুষকে মুক্তির স্বাদ আস্বাদন করানোর জন্য মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিলো, সেই শেখ মুজিবুর রহমানই বাংলাদেশের মানুষকে এক দলীয় শাসনের পিঞ্জরে বন্দি করলেন।

শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনাবসান

বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সাথে সাথেই আওয়ামী লীগ সরকার মুসলিম লীগ, ডিমোক্রেটিক লীগ, নেযামে ইসলাম পার্টি, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম এবং জামায়াতে ইসলামীকে বেআইনী ঘোষণা করে এবং রাজনৈতিক মতপার্থক্যের দরুন এই দলগুলোর হাজার হাজার নেতা ও কর্মীকে জেলে পুরে জাতীয় বিভাজনের নীতি অনুসরণ করে।

প্রশাসনের দলীয়করণ অন্যান্য দলের সাথে আওয়ামী লীগের দূরত্ব সৃষ্টি করে।

দলীয় বিচেনায় প্রশাসনে নিযুক্ত ব্যক্তিদের দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ করতে না পারায় প্রশাসন এবং জনগণের মধ্যে দূরত্ব বাড়তে থাকে। রক্ষীবাহিনীর দাপটে মানুষ ছিলো শংকিত।

যুব সমাজের জন্য নৈতিক দিকনির্দেশনা না থাকায় নৈতিক অবক্ষয় ব্যাপক আকার ধারণ করে। সারাদেশে চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, জবর দখল ও

www.pathagar.com

হত্যাকাণ্ড বাড়তে থাকে। দ্রব্যমূল্য ক্রেতা সাধারণের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে যায়। দশ আনা/বারো আনা সেরের চাউল দশ টাকা, আট আনা সেরের আটা ছয়/সাত টাকা, দুই আনা সেরের কাঁচা মরিচ চল্লিশ/পঞ্চাশ টাকা, আট আনা সেরের লবন চল্লিশ/পঞ্চাশ টাকা, পাঁচ টাকা সেরের সরিষার তেল ত্রিশ/চল্লিশ টাকা, এক টাকা সেরের মসূর ডাল আট/নয় টাকা, পাঁচ টাকার শাড়ি পঁয়ত্রিশ টাকা, তিন টাকার লুংগি পনর/বিশ টাকা এবং একশত চল্লিশ/দেড়শত টাকার এক ভরি স্বর্ণ নয়শত/এক হাজার টাকায় এসে দাঁড়ায়।[৫৩]

কল-কারখানায় উৎপাদন চরমভাবে ব্যাহত হয়। পাটের গুদামে বহুসংখ্যক অগ্নি সংযোগের ঘটনা ঘটে। ভোগ্যপণ্যের তীব্র অভাব দেখা দেয়। অর্ধাহারে থাকতে হয় অগণিত মানুষকে। পথে পথে কংকালসার মানুষ দৃষ্ট হয়।

১৯৭৪ এর শেষভাগে দুর্ভিক্ষে মৃত্যুবরণ করে বহুসংখ্যক মানুষ। এমতাবস্থায় সমালোচনার মুখ বন্ধ করার জন্য শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৫ সনের ১৬ই জুন The Newspaper (Annulment of Declaration) Act 1975 জারি করেন। সরকার বাংলাদেশ অবজারভার, বাংলাদেশ টাইমস, দৈনিক বাংলা এবং দৈনিক ইত্তেফাক অধিগ্রহণ করে। বাকি সব পত্রিকা বন্ধ করে দেওয়া হয়।

১৯৭৫ সনের ২৩শে জুন সারাদেশকে একষট্টি জিলায় বিভক্ত করে একষট্টি জন গভর্ণর নিযুক্ত করে শেখ মুজিবুর রহমান একদলীয় শাসনের ভিত মজবুত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। অসন্তোষ তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে। গোটা দেশে একটি শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা সৃষ্টি হয়।

শেখ মুজিবুর রহমান এক সময় ছিলেন গোটা জাতির নয়নমণি। তাঁর জনপ্রিয়তা ছিলো অতুলনীয়। কিন্তু তাঁর সাড়ে তিন বছরের শাসনে অতিষ্ঠ

---

৫৩. অলি আহাদ, জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫-১৯৭৫, পৃষ্ঠা-৪৩৬।

www.pathagar.com

হয়ে মানুষ তাঁর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। সুবিধাভোগী কিছু লোক ছাড়া সারা দেশের কোটি কোটি মানুষ একটি পরিবর্তন প্রত্যাশী হয়ে ওঠে। ঠিক এই সময়েই ঘটে একটি বড়ো রকমের ঘটনা। ১৯৭৫ সনের ১৫ই অগাস্ট মর্মান্তিকভাবে রাজনৈতিক পট পরিবর্তন ঘটে। বহু আপনজনসহ নিহত হন বাংলাদেশের স্থপতি শেখ মুজিবুর রহমান।

শেখ মুজিবুর রহমানের পতনের কারণ বিশ্লেষণ করে একজন বিদেশী সাংবাদিক বলেন,

"তাঁর (মুজিবের) বিপর্যয়ের রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রধানতঃ তিনটি উপকরণ মিশে আছে। প্রথমতঃ সামরিক বাহিনীর প্রধান হওয়া সত্ত্বেও মুজিব সেনাবাহিনীকে অবিশ্বাস ও অবজ্ঞা করতেন।.....সামরিক অফিসারদের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করার কোন সুযোগ তিনি ছাড়তেন না। স্পষ্টতই তাদের উপর তিনি গোয়েন্দাগিরি চালাতেন।.... মুজিবের প্রতি ব্যক্তিগতভাবে অনুগত উচ্চ ট্রেনিংপ্রাপ্ত, সুসজ্জিত, ইউনিফরমধারী রক্ষীবাহিনীকে অস্ত্রেশস্ত্রে, বেতনে-ভাতায়, ব্যয়ে-বরাদ্দে সামরিক বাহিনীর চেয়ে বেশি প্রাধান্য দেয়া হতো। উভয়ের স্বার্থের অনেক সংঘাতেই মুজিব অন্ধভাবে রক্ষীবাহিনীকে সমর্থন করতেন।..... মুজিবের পতনের দ্বিতীয় প্রধান কারণ হচ্ছে ১৯৭২ সালে রচিত বাংলাদেশ শাসনতন্ত্রে ইসলামকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদা থেকে সরিয়ে দেয়া। ইসলামের মর্যাদার এই অবনয়ন অনিশ্চয়তা সূচক প্রমাণিত হয়েছে। 'এক হাজার মসজিদের শহর' বলে ঢাকা বরাবরই গর্ব করেছে এবং বাঙালীরা ঐতিহ্যগতভাবেই পশ্চিম পাকিস্তানীদের চেয়ে বেশি ধর্মানুরাগী। অপরদিকে বাঙ্গালী মুসলমানরা উপমহাদেশে আলাদা মুসলিম রাষ্ট্রের পরিকল্পনা অবিচলিতভাবে সমর্থন করেছিলেন বলেই ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের সৃষ্টি হয়েছিল। এই পশ্চাদভূমিতে মুজিবের অনুসৃত ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি বাংলাদেশের জনগণের বৃহত্তম অংশকে আহত করেছিল। তাই নতুন প্রেসিডেন্ট খন্দকার মুশতাক আহমদ বাংলাদেশকে ইসলামিক রিপাবলিক ঘোষণা করে রাতারাতি জনসমর্থন লাভ করেছেন।

www.pathagar.com

গত শুক্রবার জুমা'র নামাযের জন্য কারফিউ উঠিয়ে দিলে মসজিদে এই জনসমর্থন অভিব্যক্ত হয়েছে।"[৫৪]

১৯৭৫ সনের নবেম্বর বিপ্লব

১৯৭৫ সনের ১৫ই অগাস্ট সেনাঅভ্যুত্থানের নেতৃবৃন্দের অনুরোধে শেখ মুজিবুর রহমানের ঘনিষ্ঠ সহযোগী খন্দকার মুশতাক আহমদ রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

রাষ্ট্রপতি মুশতাক আহমদ আওয়ামী লীগ নেতা জনাব মোহাম্মদউল্লাহকে উপরাষ্ট্রপতি পদে নিয়োগ দেন এবং দশ সদস্যবিশিষ্ট একটি মন্ত্রীসভা গঠন করেন। এই মন্ত্রীসভার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন –

বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী, প্রফেসর ইউসুফ আলী, বাবু ফনীভূষণ মজুমদার, জনাব সোহরাব হোসেন, জনাব আবদুল মান্নান, বাবু মনোরঞ্জন ধর, জনাব আবদুল মমিন এবং জনাব আসাদুজ্জামান খান। এঁরা সকলেই ছিলেন আওয়ামী লীগের উচ্চ পর্যায়ের নেতা। অবশিষ্ট দুইজন ছিলেন ড. আজিজুর রহমান মল্লিক এবং ড. মোজাফফর আহমদ।

তাছাড়া রাষ্ট্রপতি ১১ জনকে প্রতিমন্ত্রী নিযুক্ত করেন। তাঁরা হলেন–
জনাব দেওয়ান ফরিদ গাজী, জনাব মোমেনউদ্দিন আহমদ , প্রফেসর নূরুল ইসলাম চৌধুরী, জনাব শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন, জনাব তাহেরউদ্দিন ঠাকুর, জনাব মোসলেমউদ্দিন খান, জনাব নূরুল ইসলাম মঞ্জুর, জনাব কে এম ওবায়দুর রহমান, ডাঃ ক্ষিতিশ চন্দ্র মন্ডল, জনাব রিয়াজউদ্দিন আহমদ এবং জনাব সৈয়দ আলতাফ হোসেন। এঁরাও আওয়ামী লীগের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা।
২৪শে অগাস্ট তিনি চীফ অব স্টাফ পদ থেকে মেজর জেনারেল সফিউল্লাহকে সরিয়ে মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানকে উক্ত পদে নিয়োগ দেন।

---

৫৪. এন্থনী মাসকারেন-হাস, সানডে টাইমস, লন্ডন, ১৭ই অগাস্ট, ১৯৭৫।

www.pathagar.com

২৮শে অগাস্ট তিনি একষট্টি জিলায় একষট্টিজন গভর্ণর নিয়োগের আদেশ বাতিল করেন।

১লা সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল) গঠন সংক্রান্ত আদেশ বাতিল করেন।

২৬শে সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রপতি একটি ইনডেমনিটি অর্ডিন্যান্স জারি করেন। এই অর্ডিন্যান্সে বলা হয় যে ১৯৭৫ সনের ১৫ই অগাস্টের পরিবর্তনের সাথে জড়িত কারো বিরুদ্ধে দেশের কোন আদালতে অভিযোগ করা যাবে না।

৫ই অকটোবর রাষ্ট্রপতি জাতীয় রক্ষীবাহিনীকে সেনাবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন।

১৬ই অকটোবর রাষ্ট্রপতি এয়ার মার্শাল এ.কে. খন্দকারকে বিমানবাহিনী প্রধানের পদ থেকে সরিয়ে এম.এ.জি.তাওয়াবকে উক্ত পদে নিযুক্তি দেন।

৩রা নবেম্বর দিবাগত রাতে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে নিহত হন সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমদ, এ.এইচ.এম. কামারুজ্জামান এবং ক্যাপ্টেন (অব.) মনসুর আলী।

৩রা নবেম্বর ভোর রাতে ঢাকাস্থ পদাতিক ডিভিশন এবং বিমানবাহিনীর একটি অংশের সাহায্যে ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ একটি সামরিক অভ্যুত্থান ঘটান।

অভ্যুত্থানকারীরা ক্যান্টনমেন্টে চীফ অব স্টাফ মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানকে তাঁর বাসভবনে অবরুদ্ধ করে ফেলে। তারা বংগভবনে অবরুদ্ধ করতে সক্ষম হয় রাষ্টপতি খন্দকার মুশতাক আহমদকে।

ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ কর্ণেল সৈয়দ ফারুক রহমান এবং তাঁর সাথীদেরকে আত্মসমর্পণ করতে নির্দেশ দেন। কর্ণেল ফারুক রহমান এবং তাঁর সংগীরা আত্মসমর্পণ করতে অস্বীকৃতি জানান। বংগভবনে একটি রক্তাক্ত সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে। এই সময় জেনারেল (অব.) মুহাম্মাদ আতাউল গনী ওসমানী একটি জীপে সাদা পতাকা উড়িয়ে বংগভবনে উপস্থিত হন। ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ ও কর্ণেল শাফায়াত জামিল তখন রাষ্ট্রপতির সাথে অসৌজন্যমূলক আচরণ করছিলেন। দীর্ঘ আলাপ-

www.pathagar.com

আলোচনার পর একটি সমঝোতা হয়। লে. কর্ণেল সৈয়দ ফারুক রহমান, লে. কর্ণেল খন্দকার আবদুর রশিদ, মেজর শরিফুল হক ডালিম, মেজর আযিয পাশা, মেজর মহিউদ্দিন, মেজর শাহরিয়ার, মেজর বজলুল হুদা, মেজর রাশেদ চৌধুরী, মেজর নূর, মেজর শরফুল হোসেন, লে. কিসমত হোসেন, লে. খায়রুজ্জামান, লে. আবদুল মাজেদ, হাবিলদার মুসলেহউদ্দিন, নায়েক মারফত আলী এবং নায়েক মুহাম্মাদ হাশেমকে একটি বিমানে করে থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংককে পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়।

৪ঠা নবেম্বর রেডিওতে ঘোষণা হয় যে মেজর জেনারেল খালেদ মোশাররফ সেনাবাহিনীর নতুন চীফ অব স্টাফ নিযুক্ত হয়েছেন।

৫ই নবেম্বর রেডিওতে ঘোষণা হয় যে রাষ্ট্রপতি খন্দকার মুশতাক আহমদ সামরিক বিধি সংশোধন করে তাঁর উত্তরাধিকারী নিয়োগের বিধান সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি এ.এস.এম. সায়েমের অনুকূলে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

৬ই নবেম্বর নতুন রাষ্টপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন বিচারপতি এ.এস.এম. সায়েম।

এই দিকে খবর ছড়িয়ে পড়ে যে মেজর জেনারেল খালেদ মোশাররফ কর্তৃক সংঘটিত অভ্যুত্থান একটি প্রো-ইন্ডিয়া অভ্যুত্থান। সারা দেশের ক্যান্টনমেন্টগুলো উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। খবর আসতে থাকে যে যশোর, রংপুর, বগুড়া এবং কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টের সিপাহীরা খালেদ মোশাররফকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য ঢাকার দিকে এগিয়ে আসছে। ৬ই নবেম্বর মধ্যরাতের পর ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের সিপাহীরাও অফিসারদের নিয়ন্ত্রণমুক্ত হয়ে পড়ে।

অবস্থার নাজুকতা উপলব্ধি করে মেজর জেনারেল খালেদ মোশাররফ, ব্রিগেডিয়ার নাজমুল হুদা ও কর্ণেল হায়দার বংগভবন থেকে বেরিয়ে শেরেবাংলা নগরে উপস্থিত হন রংপুর থেকে আগত সেনাদের সাথে কথা বলার জন্য। কিছুক্ষণ পরই মেজর জেনারেল খালেদ মোশাররফ,

www.pathagar.com

ব্রিগেডিয়ার নাজমুল হুদা ও কর্ণেল হায়দার বিদ্রোহী সিপাহীদের গুলিতে নিহত হন।

প্রায় একই সময় বংগভবনে গুলিবিদ্ধ হয়ে গ্রেফতার হন কর্ণেল শাফায়াত জামিল। ব্রিগেডিয়ার নুরুজ্জামান ত্বরিৎ ঢাকার বাইরে চলে গিয়ে আত্মরক্ষা করেন।

৭ই নবেম্বর ঢাকা রেডিও স্টেশন থেকে ঘোষণা করা হয় বীর বিপ্লবী সিপাহীরা ক্ষমতা দখল করেছে এবং অবরুদ্ধ অবস্থা থেকে মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানকে মুক্ত করেছে।

রাতে ঘোষণা করা হয় যে রাষ্ট্রপতি এ.এস.এম. সায়েমের নিকট প্রধান সামরিক প্রশাসকের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে এবং মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান সেনাবাহিনী প্রধান নিযুক্ত হয়েছেন।

সেইদিন অস্ত্র হাতে সিপাহীরা দলে দলে রাজপথে নেমে আসে। ট্রাকে ট্রাকে সিপাহীরা রাজপথে টহল দিতে থাকে। তাদের সাথে মিলিত হয় হাজার হাজার মানুষ। মিছিলে মিছিলে ভরে যায় ঢাকা শহর। নানা রকমের শ্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে বাতাস। মহাউল্লাসে গলা ফাটিয়ে লোকেরা শ্লোগান দিতে থাকে ঃ "আল্লাহু আকবার", "সিপাহী জনতা ভাই ভাই", "বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।" সেই দিন গগণবিদারী "আল্লাহু আকবার" ধ্বনি এক অবিস্মরণীয় আবহ সৃষ্টি করেছিলো।

সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে সিরাতুন্নবী সম্মেলন

১৯৭৬ সনের ৫-৭ মার্চ তারিখ ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে অনুষ্ঠিত হয় একটি সিরাতুন্নবী সম্মেলন।

এই সম্মেলনের ব্যবস্থাপনা কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন সর্বজন শ্রদ্ধেয় আলিম মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মাদ মাসুম এবং সেক্রেটারি ছিলেন পুরাতন ঢাকার কৃতিসন্তান জনাব আবদুল ওয়াহিদ। এই সম্মেলনে বিমানবাহিনী প্রধান এয়ার ভাইস মার্শাল এম.এ.জি. তাওয়াব একটি আবেগপূর্ণ বক্তব্য পেশ করেন। অগণিত মানুষ এই সম্মেলনে যোগদান করে। বাঁধভাংগা

www.pathagar.com

পানির স্রোতের মতো ছুটে আসে মানুষ। এই সম্মেলনে ঢাকা মহানগরীর অধিবাসীদের ইসলামী চেতনার যেই বহি:প্রকাশ ঘটেছে তা ছিলো অতুলনীয়, গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ বার্তাবহ।

ধর্মভিত্তিক রাজনীতির ওপর আরোপিত বিধিনিষেধ প্রত্যাহার

১৯৭৬ সনের ৩রা মে রাষ্ট্রপতির জারিকৃত একটি অধ্যাদেশের মাধ্যমে বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৮ নাম্বার অনুচ্ছেদটি বাতিল করে ধর্মভিত্তিক রাজনীতির ওপর আরোপিত বিধিনিষেধ তুলে নেওয়া হয়।

রাষ্ট্রপতি হন জিয়াউর রহমান

১৯৭৭ সনের ২১শে এপ্রিল রাষ্ট্রপতি বিচারপতি এ.এস.এম. সায়েম মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের নিকট রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও দায়িত্ব হস্তান্তর করেন।

১৯৭৭ সনের ২২শে এপ্রিল রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান একটি অধ্যাদেশের মাধ্যমে ১৯৭২ সনের সংবিধানের শিরোনামে "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম" সংযোজন এবং চার মূলনীতি 'জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা' কথাগুলোর পরিবর্তে "সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস, জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্র অর্থাৎ 'অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচার" কথাগুলো প্রতিস্থাপন করেন।

১৯৭৭ সনের গণভোট

১৯৭৭ সনের ৩০শে মে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান একটি গণভোটের আয়োজন করেন।

তাঁর গৃহীত পদক্ষেপগুলোর প্রতি জনগণের সমর্থন আছে কি না তা যাচাইয়ের জন্য ছিলো এই গণভোট।

ভোটারগণ বিপুলভাবে তাঁর প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করে।

www.pathagar.com

১৯৭৮ সনের রাষ্ট্রপতি নির্বাচন

১৯৭৮ সনের ৩রা জুন অনুষ্ঠিত হয় রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ।

রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ছিলেন গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। তাই তিনি অবাধ নির্বাচনে অন্যদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে গণমানুষের নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি হিসেবে দেশ শাসন করতে চেয়েছেন।

জেনারেল (অব.) মুহাম্মাদ আতাউল গনী ওসমানীকে বিপুল ভোটে পরাজিত করে মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন।

একদলীয় শাসন ব্যবস্থার বিলুপ্তি সাধন

১৯৭৮ সনের ১৫ই ডিসেম্বর রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান এক ফরমান জারি করে এক দলীয় ব্যবস্থা বাতিল করে বহুদলীয় ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন।

বাংলাদেশের জনগণ অনুভব করে যে তাদের বুকের ওপর থেকে একটি জগদ্দল পাথর অপসারিত হয়েছে।

'ইসলামিক ডিমোক্রেটিক লীগ' গঠন

১৯৭১ সনের ২৬শে মার্চ ইয়াহইয়া খান সকল প্রকারের রাজনৈতিক তৎপরতার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। এই নিষেধাজ্ঞা জামায়াতে ইসলামীর জন্যও প্রযোজ্য ছিলো।

১৯৭২ সনে বাংলাদেশের জন্য যেই সংবিধান গৃহীত হয় সেটিতেও ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল গঠনের ওপর নিষেধাজ্ঞা ছিলো।

১৯৭৭ সনের ৩০শে মে গণভোটের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের গৃহীত পদক্ষেপগুলো অনুমোদিত হওয়ায় ইসলামের নামে রাজনৈতিক দল গঠন করার পথে আর কোন বাধা রইলো না।

ফলে ইসলামী রাজনৈতিক দল গঠন নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু হয়।

এই চিন্তারই ফসল "ইসলামিক ডিমোক্রেটিক লীগ"।

১৯৭৬ সনের ২৪শে অগাস্ট ডিমোক্রেটিক পার্টি, নেযামে ইসলাম পার্টি,

www.pathagar.com

খেলাফতে রব্বানী পার্টি এবং জামায়াতে ইসলামীর নেতৃবৃন্দ ইসলামিক ডিমোক্রেটিক লীগ (I.D.L) নামে একটি রাজনৈতিক প্ল্যাটফরম গড়ে তোলেন।

মাওলানা ছিদ্দিক আহমদকে (নেযামে ইসলাম পার্টি) চেয়ারম্যান, মাওলানা আবদুর রহীম (জামায়াতে ইসলামী), মাওলানা আবদুস সুবহান (জামায়াতে ইসলামী), এডভোকেট সা'দ আহমদকে (জামায়াতে ইসলামী) ভাইস চেয়ারম্যান এবং এডভোকেট শফিকুর রহমানকে (ডিমোক্রেটিক পার্টি) সেক্রেটারী জেনারেল করে এর কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করা হয়।

ইসলামিক ডিমোক্রেটিক লীগ বলিষ্ঠভাবে উচ্চারণ করে যে ইসলাম একটি পূর্ণাংগ জীবন বিধান। মানুষের কল্যাণ এর বাস্তবায়নের ওপর নির্ভরশীল।

ইসলামিক ডিমোক্রেটিক লীগ ১৯৭৯ সনের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেয়।

১৯৭৯ সনের ১৮ই ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ

১৯৭৯ সনের ১৮ই ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের নির্বাচন।

এটি ছিলো বাংলাদেশের দ্বিতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন। এই নির্বাচনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল ২০৭টি আসনে, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ৩৯টি আসনে এবং মুসলিম লীগ ১৪টি আসনে বিজয়ী হয়।

ইসলামিক ডিমোক্রেটিক লীগ থেকে মনোনীত জামায়াতে ইসলামীর ৬ জন সদস্য জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। নির্বাচিত সদস্যগণ হচ্ছেন- মাওলানা আবদুর রহীম (পিরোজপুর), মাস্টার মুহাম্মাদ শফীকুল্লাহ (লক্ষ্মীপুর), মাওলানা নুরুন্নবী সামদানী (ঝিনাইদহ), অধ্যাপক রেজাউল করীম (গাইবান্ধা), এ. এস. এম. মোজাম্মেল হক (ঝিনাইদহ) এবং অধ্যাপক সিরাজুল হক (কুড়িগ্রাম)।

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে জামায়াতে ইসলামীর এটাই প্রথম উপস্থিতি।

www.pathagar.com

জাতীয় সংসদ কর্তৃক সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী গ্রহণ

১৯৭৯ সনের ৫ই এপ্রিল জাতীয় সংসদে গৃহীত হয় সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী বিল। ৬ই এপ্রিল থেকে এটি কার্যকর হয়। এই সংশোধনীতে ১৯৭৫ সনের ১৫ই অগাস্ট হতে তখন পর্যন্ত প্রণীত সকল আদেশ, বিধান ও ফরমান এবং সংবিধানে যা কিছু সংশোধন, সংযোজন, পরিবর্তন, বিলোপ সাধন এবং প্রতিস্থাপন করা হয়েছে, সেইগুলো বৈধভাবে প্রণীত ও গৃহীত হয়েছে বলে ঘোষিত হয়।

এই সংশোধনী গৃহীত হওয়ার পর বাংলাদেশের মানুষ তাঁদের স্বকীয়তা খুঁজে পায় এবং স্বাধীনভাবে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার হিম্মত লাভ করে।

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ

১৯৭৯ সনের ২৫, ২৬ ও ২৭শে মে ঢাকাস্থ ইডেন হোটেল প্রাংগনে অনুষ্ঠিত হয় একটি কনভেনশন। বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ আব্বাস আলী খানের আহ্বানে এই কনভেনশনে উপস্থিত হন সারা বাংলাদেশ থেকে আগত কমবেশি ৪৫০ জন সদস্য।

সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন আব্বাস আলী খান। এই সম্মেলনে অধ্যাপক গোলাম আযমের একটি দীর্ঘ ভাষণ পড়ে শুনানো হয়। পরে এটি "বাংলাদেশ ও জামায়াতে ইসলামী" নামে প্রকাশিত হয়।

এই ভাষণে তিনি বলেন,

> "আল্লাহ পাকই সমস্ত পৃথিবীর সৃষ্টা। আমরা তাঁর দাসত্ব কবুল করে মুসলিম (অনুগত) হিসেবে পরিচয় দিতে গৌরব বোধ করি। মুসলিমের দৃষ্টিতে আল্লাহর গোটা দুনিয়াই তাঁর বাসভূমি। কিন্তু আমাদের মহান সৃষ্টা যে দেশে আমাদেরকে পয়দা করলেন, সে দেশের সাথে স্বাভাবিক কারণেই আমরা বিশেষ ধরনের এক গভীর সম্পর্ক অনুভব করি। কারণ আমরা ইচ্ছে করে এ দেশে পয়দা হইনি। আমাদের দয়াময় প্রভু নিজের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে এদেশে পয়দা করেছেন। তাই আমাদের স্রষ্টা আমাদেরকে এদেশে পয়দা করাই যখন পছন্দ করেছেন, তখন এদেশের প্রতি আমাদের মহব্বত অন্য সব দেশ থেকে বেশি হওয়াই স্বাভাবিক।"

www.pathagar.com

"বাংলাদেশে মুসলিম, হিন্দু, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ ও উপজাতীয়সহ প্রায় দশ কোটি লোক বাস করে। বাংলাদেশী হিসেবে সবার সাথেই আমাদের ভালবাসার সম্পর্ক থাকতে হবে। আমাদের দেশের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নায় আমরা সমান অংশীদার। ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে সকল বাংলাদেশী আমাদের ভাই-বোন। সবার কল্যাণের সাথেই আমাদের মঙ্গল জড়িত। এদেশে আমরা যে আদর্শ কায়েম করতে চাই এর আহ্বান সবার নিকটই পৌঁছাতে হবে। আমাদের সবারই স্রষ্টা আল্লাহ। তাঁর দেয়া আদর্শ অমুসলিমদের মধ্যে পৌঁছানো আমাদেরই কর্তব্য। আল্লাহর সৃষ্ট সূর্য, চন্দ্র, আলো, বাতাস ইত্যাদি আমরা যেমন সমভাবে ভোগ করছি, আল্লাহর দীনের মহা নিয়ামতও আমাদের সবার প্রাপ্য। বংশগতভাবে মুসলিম হবার দাবীদার হওয়ার দরুন আল্লাহর দীনকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত নিজস্ব সম্পদ মনে করা উচিত নয়। অমুসলিম ভাইদেরও যে তাদের স্বার্থেই দীন ইসলামকে জানা প্রয়োজন এবং গ্রহণযোগ্য কিনা বিবেচনা করা কর্তব্য সে বিষয়ে আমাদের দেশীয় ভাই হিসেবে তাদেরকে মহব্বতের সাথে একথা বুঝানো আমাদের বিরাট দায়িত্ব ও দীনী কর্তব্য।"

"বাংলাদেশে যারা রাজনীতি করেন, তাদের সবাইকে আমরা ও একারণেই শ্রদ্ধা করি যে, তারাও দেশ সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করেন, দেশকে উন্নত করতে চান, দেশের সমস্যাগুলোর সমাধানে আগ্রহী এবং জনগণের কল্যাণকামী। তারা শুধু নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত নন, গোটা দেশের ভালমন্দ সম্পর্কে সজাগ দৃষ্টি রাখেন। এ ধরনের লোকদের সঠিক প্রচেষ্টায়ই একটি দেশ সত্যিকার উন্নতি লাভ করতে পারে। কিন্তু যারা দেশ গড়ার চিন্তাই করে না, যারা কেবল আত্ম-প্রতিষ্ঠায় ব্যস্ত, তারা দেশের সম্পদ নয়, তারা দেশের আপদ। যারা শুধু আত্ম-প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য নিয়েই রাজনীতি করেন, তারা দেশের কলঙ্ক। আর যারা দৈহিক শক্তি বা অস্ত্রশক্তির বলে জনগণের উপর শাসক সেজে বসতে চায়, তারা দেশের ডাকাত।

সব রকম রাজনৈতিক দলের প্রতি সম্মানবোধ সত্ত্বেও সবার সাথে আমাদের সমান সম্পর্ক রক্ষা করা সম্ভব নয়। বিভিন্ন মানদণ্ডে আমাদের দেশের রাজনৈতিক দলগুলোকে প্রধানত তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায় ঃ

১। যেসব দল ইসলামকে দলীয় আদর্শ হিসেবে স্বীকার করে।

২। যেসব দল ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদে বিশ্বাসী।

৩। যেসব দল সমাজতন্ত্রের আদর্শে দেশ গড়তে চায়।

আমরা যেহেতু ইসলামী আদর্শে বিশ্বাসী, সেহেতু প্রথম শ্রেণীভুক্ত দলগুলোর সাথে আমাদের আদর্শিক সম্পর্কের দরুন তাদের সঙ্গে আমাদের নিম্নরূপ সম্বন্ধ বজায় রাখতে হবে ঃ

(ক) ইসলামবিরোধী শক্তির পক্ষ থেকে তাদের কারো উপর হামলা হলে

www.pathagar.com

আমরা ন্যায়ের খাতিরে তাদের পক্ষে থাকব ও হামলা প্রতিহত করতে সাহায্য করব।

(খ) ইসলামী দল হিসেবে যারা পরিচয় দেন, তাদের সাথে দীনের ব্যাপারে সহযোগিতা করব। এ সহযোগিতার মনোভাব নিয়েই তাদেরকে দীনি ভাই হিসেবে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেব।

(গ) ইসলামী দলের নেতা ও কর্মীদের জন্য যেসব বিশেষ গুণ অপরিহার্য, সে বিষয়ে কোন দলের মধ্যে কোন কমতি বা ত্রুটি দেখা গেলে মহব্বতের সাথে সে বিষয়ে তাদেরকে সংশোধনের উদ্দেশ্যে ভুল ধরিয়ে দেব। অনুরূপভাবে আমাদের ভুল-ত্রুটি ধরিয়ে দিলে কৃতজ্ঞতার সাথে তা কবুল করব।

(ঘ) কোন সময় যদি কোন ইসলামপন্থী দল আমাদের বিরোধিতা করে, তবুও আমরা তাদের বিরোধিতা করব না। প্রয়োজন হলে বন্ধুত্বপূর্ণ ভাষায় জওয়াব দেব।

(ঙ) নির্বাচনের সময় তাদের সাথে দরকার হলে সমঝোতা করব।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় নম্বরে উল্লেখিত দলগুলোর সাথে আমরা নিম্নরূপ সম্পর্ক রক্ষার চেষ্টা করব ঃ

(ক) যেসব রাজনৈতিক দল সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ইসলামকে জীবনাদর্শ মনে করে না, তাদের সাথেও আমরা কোন প্রকার শত্রুতার মনোভাব পোষণ করব না। দেশ ও জাতির কল্যাণের জন্য মত ও পথ বাছাই করার স্বাধীনতা সবারই থাকা উচিত। আমরা তাদের মত ও পথকে ভুল মনে করলে যুক্তির মাধ্যমে শালীন ভাষায় অবশ্যই সমালোচনা করব।

(খ) তাদের কেউ আমাদের প্রতি অশোভন ভাষা প্রয়োগ করলেও আমরা আমাদের শালীনতার মান বজায় রেখেই জওয়াব দেব। গালির জওয়াবে আমরা কখনও গালি দেব না বা অন্যায় দোষারোপের প্রতিশোধ নিতে গিয়ে আমরা ন্যায়ের সীমা লংঘন করব না।

(গ) দেশের স্বার্থ ও জনগণের কল্যাণে তাদের যেসব কাজকে আমরা মঙ্গলজনক মনে কবর, সেসব ক্ষেত্রে তাদের সাথে সহযোগিতা কবর।"

"যারা রাজনীতি করেন, তাদের উপরে ভাল-মন্দ প্রধানত নির্ভরশীল। ভ্রান্ত রাজনীতি গোটা দেশকে বিপন্ন করতে পারে। ভুল রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত জনগণের দুর্গতির কারণ হতে পারে। তাই সুস্থ রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি করে দেশ ও জাতিকে প্রতিযোগিতার এ দুনিয়ায় বাঞ্ছিত উন্নতির দিকে এগিয়ে নেবার ব্যাপারে আন্তরিকতা থাকলে সকল রাজনৈতিক দলের পক্ষেই

www.pathagar.com

নিম্নের নীতিমালা অনুসরণ করা কর্তব্য ঃ

১। সকল রাজনৈতিক দলকেই নিষ্ঠার সাথে স্বীকার করে নিতে হবে যে, আল্লাহর সার্বভৌমত্বের অধীনে জনগণই খিলাফাতের (রাজনৈতিক ক্ষমতার) অধিকারী ও সরকারী ক্ষমতার উৎস।

২। গণতন্ত্রের এই প্রথম কথাকে স্বীকার করার প্রমাণ স্বরূপ নির্বাচন ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে ক্ষমতা হাসিলের চিন্তা পরিত্যাগ করতে হবে।

৩। বাংলাদেশের সম্মান রক্ষা ও সুনাম অর্জনের উদ্দেশ্যে বিশ্বের স্বীকৃত গণতান্ত্রিক নীতিগুলোকে আন্তরিকতার সাথে পালন করতে হবে এবং এর বিপরীত আচরণ সতর্কতার সাথে বর্জন করতে হবে।

অগণতান্ত্রিক আচরণ দেশকে সহজেই দুনিয়ায় নিন্দনীয় বানায়। তাই দেশের সম্মান রক্ষার প্রধান দায়িত্ব সরকারী দলের।

৪। অভদ্র ভাষায় সমালোচনা করা, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে অস্ত্র ব্যবহার করা এবং দৈহিক শক্তি প্রয়োগ করাকে রাজনৈতিক গুণ্ডামি ও লুটতরাজ মনে করে ঘৃণা করতে হবে। ব্যক্তি স্বার্থে লুটতরাজ ও গুণ্ডামি করাকে সবাই অন্যায় মনে করে। কিন্তু এক শ্রেণীর ভ্রান্ত মতবাদ রাজনৈতিক ময়দানে এসব জঘন্য কাজকেই বলিষ্ঠ নীতি হিসেবে ঘোষণা করে। এ ধরনের কার্যকলাপের প্রশ্রয়দাতাদেরকে গণতন্ত্রের দুশমন হিসেবে চিহ্নিত করতে হবে।

৫। সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত কোন ব্যক্তি বা দলকে স্বাধীনতার শত্রু, দেশদ্রোহী, বিদেশের দালাল, দেশের দুশমন ইত্যাদি গালি দেয়াকে রাজনৈতিক অপরাধ বলে গণ্য করতে হবে। সবাই যদি আমরা একে অপরকে এ গালি দিতে থাকি, তাহলে দুনিয়াবাসীকে এ ধারণাই দেয়া হবে যে, এ দেশের সবাই কারো না কারো দালাল, এমন দেশের কোন মর্যাদাই দুনিয়ায় স্বীকৃত হতে পারে না।"

এই সম্মেলনে একটি নতুন গঠনতন্ত্র অনুমোদিত হয়। সেই গঠনতন্ত্রের ভিত্তিতে ১৯৭৯ সনের ২৭শে মে থেকে চারদফা পূর্ণাংগ কর্মসূচী নিয়ে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ কর্মতৎপরতা শুরু করে।

'কেয়ারটেকার সরকারের রূপরেখা' প্রণয়ন

১৯৮০ সনের মাঝামাঝি আমীরে জামায়াত অধ্যাপক গোলাম আযম সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য "কেয়ারটেকার সরকার" সংক্রান্ত একটি সুচিন্তিত রূপরেখা জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের অধিবেশনে পেশ

www.pathagar.com

করেন। বিস্তারিত আলোচনার পর কর্মপরিষদ রূপরেখাটি সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করে।

রূপরেখাটি নিম্নরূপ–

১. সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি প্রেসিডেন্ট কর্তৃক কেয়ারটেকার সরকারপ্রধান নিযুক্ত হবেন।

২. প্রধান বিচারপতি কেয়ারটেকার সরকারপ্রধানের দায়িত্ব গ্রহণের পর দল নিরপেক্ষ লোকদের মধ্য থেকে একটি টিম গঠন করে প্রেসিডেন্টের নিকট পেশ করবেন। প্রেসিডেন্ট তাঁদেরকে নিয়োগ দেবেন। এই টিমের কোন ব্যক্তি আসন্ন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন না।

৩. কেয়ারটেকার সরকারপ্রধানের সুপারিশের ভিত্তিতে প্রেসিডেন্ট একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশন গঠন করবেন।

৪. নির্বাচন অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে কেয়ারটেকার সরকার বিধিবিধান প্রণয়ন করতে পারবেন। সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারিগণ কেয়ারটেকার সরকারের সকল নির্দেশ পালন করতে বাধ্য থাকবেন।

৫. নিরপেক্ষভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠানে সফলতা অর্জন করার জন্য প্রেসিডেন্ট কেয়ারটেকার সরকারকে সার্বিক সহযোগিতা করবেন।

১৯৮০ সনের ৭ই ডিসেম্বর জামায়াতে ইসলামীর ভারপ্রাপ্ত আমীর আব্বাস আলী খান রমনা গ্রীনে আহূত এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই রূপরেখা প্রকাশ করেন।

ইসলামী বিপ্লবের ৭ দফা গণ দাবি

১৯৮১ সনের ৩০শে জানুয়ারি রমনা গ্রীনে অনুষ্ঠিত একটি কর্মী সমাবেশে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ-এর ভারপ্রাপ্ত আমীর আব্বাস আলী খান 'ইসলামী বিপ্লবের ৭ দফা গণ দাবি' পেশ করেন।

দাবিগুলো হচ্ছে–

www.pathagar.com

১. বাংলাদেশকে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করতে হবে

ক. আল্লাহর সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি দিতে হবে।
খ. কুরআন-সুন্নাহর আইন জারি করতে হবে।
গ. প্রচলিত আইনকে কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী সংশোধন করতে হবে।
ঘ. মুসলিম-অমুসলিম সকলের প্রতি ইসনাফ ও সুবিচার কায়েম করতে হবে।

২. ঈমানদার যোগ্য লোকের সরকার কায়েম করতে হবে

ক. আল্লাহবিমুখ ও অসৎ লোকদের নেতৃত্বের পরিবর্তন ঘটাতে হবে।
খ. সৎ ও যোগ্য লোকদেরকে শাসনক্ষমতা দিতে হবে।
গ. পৃথক নির্বাচনের ভিত্তিতে জাতীয় সংসদ নির্বাচন করতে হবে।

৩. বাংলাদেশের আযাদির হেফাজত করতে হবে

ক. জনমনে জাতীয়তার ইসলামী চেতনা জাগাতে হবে।
খ. রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে গণতন্ত্রসম্মত বানাতে হবে।
গ. মৌলিক মানবাধিকার বহাল করতে হবে।
ঘ. যাবতীয় অসম চুক্তি বাতিল করে স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ করতে হবে।
ঙ. মুসলিম জাহানের ঐক্য-প্রচেষ্টা জোরদার করতে হবে।

৪. আইন শৃঙ্খলা পূর্ণরূপে বহাল করতে হবে

ক. জান-মাল ও ইজ্জত-আবরুর হেফাজত করতে হবে।
খ. সমাজবিরোধী যাবতীয় কার্যকলাপ বন্ধ করতে হবে।
গ. বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ থেকে পৃথক করতে হবে।

৫. ইসলামী অর্থব্যবস্থা চালু করতে হবে

ক. সরকারকে ভাত-কাপড় ও বাসস্থানসহ মৌলিক মানবীয় প্রয়োজন পূরণের দায়িত্ব নিতে হবে।
খ. জনশক্তিকে দক্ষ বানিয়ে বেকার সমস্যার সমাধান করতে হবে।
গ. মেহনতি মানুষের ন্যায্য অধিকার দিতে হবে।

www.pathagar.com

ঘ. পরিবার-পরিকল্পনার নামে ঈমান ও চরিত্রধ্বংসী জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বন্ধ করতে হবে।

ঙ. সুদ, ঘুষ, মদ, জুয়া, শোষণ, দুর্নীতিসহ যাবতীয় যুলুম খতম করতে হবে।

৬. ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতি প্রবর্তন করতে হবে

ক. সর্বস্তরে ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা কায়েম করতে হবে।

খ. ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকায় স্থাপন করতে হবে।

ঘ. শুক্রবারকে সরকারি ছুটির দিন ঘোষণা করতে হবে।

ঙ. অপসংস্কৃতি বন্ধ করে ইসলামী সংস্কৃতি চালু করতে হবে।

৭. কুরআন-হাদীস মোতাবেক মহিলাদের যাবতীয় অধিকার বহাল করতে হবে

ক. মহিলাদের ইসলামসম্মত মর্যাদা দিতে হবে।

খ. মহিলাদের জন্য পৃথক শিক্ষাব্যবস্থা চালু করতে হবে।

গ. মহিলাদের পৃথক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে।

ঘ. মহিলাদের নৈতিক অধঃপতনের ষড়যন্ত্র রোধ করতে হবে।

১৯৮১ সনের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন

১৯৮১ সনের ৩০শে মে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান চট্টগ্রামে একদল বিদ্রোহী সেনার হাতে মর্মান্তিকভাবে নিহত হন।

অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবদুস সাত্তার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের উদ্যোগ নেন।

১৯৮১ সনের ১৫ই নবেম্বর রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার দেড় মাস পূর্বে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে কাকে ভোট দেওয়া উচিত এই বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে জামায়াতে ইসলামী কর্তৃক প্রকাশিত একটি পুস্তিকা ভোটারদের মাঝে বিলি করা হয়। এতে বলা হয়েছে–

১. দেশের স্বাধীনতা কাদের হাতে নিরাপদ সেটাই পয়লা নম্বরে

www.pathagar.com

বিবেচ্য। প্রতিবেশী দেশ থেকেই স্বাধীনতা বিপন্ন হওয়ার আশংকা। তাই যারা এই প্রতিবেশী দেশকে অতি বন্ধু মনে করে তাদেরকে ভোট দেওয়া নিরাপদ নয়।

২. দ্বিতীয় বিবেচ্য বিষয় গণতন্ত্র। কাদের হাতে গণতন্ত্র নিরাপদ তা তাদের অতীত আচরণ থেকে স্পষ্ট জানা যায়। যারা একদলীয় শাসন জাতির ওপর চাপিয়ে দিয়েছিলো তারা গণতন্ত্রের দুশমন।

৩. যারা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও সমাজতন্ত্র কায়েম করতে চায় তাদেরকে ভোট দেওয়া আত্মহত্যারই শামিল।

৪. ইসলাম কায়েম করার উদ্দেশ্যে একাধিক প্রার্থী হয়েছেন। তাঁদের দ্বারা ইসলাম কায়েম হওয়া সম্ভব মনে করলে ভোট দিতে পারেন।

এই নির্বাচনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের নমিনি ছিলেন বিচারপতি আবদুস সাত্তার। আওয়ামী লীগের নমিনি ছিলেন ড. কামাল হোসেন। বিচারপতি আবদুস সাত্তার বিপুল ভোটাধিক্যে ড. কামাল হোসেনকে পরাজিত করেন।

এই নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামীর জনশক্তি সুশৃংখলভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সেনাপতির রাজনীতির বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ

১৯৮১ সনের ২৭শে ডিসেম্বর সেনাভবনে সেনাপ্রধান মেজর. জেনারেল এইচ.এম. এরশাদ জাতীয় পত্রিকা এবং সংবাদ সংস্থাসমূহের সম্পাদকদের সমাবেশে একটি বক্তব্য দেন। এতে তিনি বলেন, 'আমাদের সর্বস্তরের সামরিক লোকজন রাজনীতিতে সামরিক এ্যাডভেঞ্চার কামনা করে না, কিংবা সশস্ত্র বাহিনীতে তাঁরা রাজনৈতিক এ্যাডভেঞ্চার চান না। তাঁরা কেবলমাত্র জনগণকে সাহায্য করতে এবং যে কোন ভবিষ্যত (সামরিক) অভ্যুত্থানের অপচেষ্টার বিরুদ্ধে ভারসাম্য বজায় রাখতে চান।..... দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের স্বার্থে জাতীয় পর্যায়ে প্রেসিডেন্টের নেতৃত্বে গঠন করা দরকার এমন একটি দায়িত্ব ও ক্ষমতাসম্পন্ন 'জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ'-যার সদস্য থাকবেন উপরাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, উপপ্রধানমন্ত্রী এবং কতিপয় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী ছাড়াও তিন সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান।'

www.pathagar.com

মূলত এটি ছিলো একটি রাজনৈতিক বক্তব্য। রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষই যে এই বক্তব্যের উৎস তা বুঝতে কারো অসুবিধা হয়নি।

১৯৮২ সনের ১লা জানুয়ারি একটি অধ্যাদেশের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি দশ সদস্য বিশিষ্ট 'জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ' গঠন করেন। রাষ্ট্রপতির নেতৃত্বে এতে সদস্য রাখা হয় উপরাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, শিল্পমন্ত্রী এবং সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনীর প্রধানকে।

পরবর্তীতে 'জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ'-এর সদস্য সংখ্যা দশ থেকে কমিয়ে ছয়ে আনা হয়। পরিবর্তিত পরিষদে রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী এবং সেনাবাহিনী প্রধান, নৌবাহিনী প্রধান ও বিমানবাহিনী প্রধানকে রাখা হয়। স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে সেনাপ্রধান মেজর জেনারেল এইচ.এম. এরশাদ-এর চাপেই এমনটি করতে হয়েছে। অন্যান্য রাজনৈতিক দল এবং জামায়াতে ইসলামী এটিকে একটি সরকারের ওপর আরেকটি সরকার বলে আখ্যায়িত করে।

এইদিকে দেশের আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটতে থাকে। আবার, নানাভাবে প্রচারিত হতে থাকে, রাষ্ট্রপতি আবদুস সাত্তারের স্বাস্থ্যের অবস্থা ভালো নয়।

১৯৮২ সনের ২৪শে মার্চ ভোরে রেডিও ও টেলিভিশনে ঘোষণা করা হয় যে দেশে সামরিক শাসন জারি করা হয়েছে এবং সেনাপ্রধান সামরিক আইন প্রশাসক নিযুক্ত হয়েছেন। অতপর সকাল এগারোটায় রাষ্ট্রপতি আবদুস সাত্তার ঘোষণা করেন যে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির সার্বিক অবনতি এবং স্বাস্থ্যগত কারণে তিনি সেনাপ্রধান মেজর জেনারেল এইচ.এম. এরশাদের অনুকূলে ক্ষমতা হস্তান্তর করেছেন। তাঁর বিষণ্ন চেহারা দেখে কারো বুঝতে অসুবিধা হয়নি যে চাপ সৃষ্টি করে তাঁর কাছ থেকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হয়েছে।

২৭শে মার্চ রাষ্ট্রপতি পদে নিযুক্ত করা হয় বিচারপতি আহসানউদ্দিন চৌধুরীকে।

ইতোমধ্যে মেজর জেনারেল এইচ.এম. এরশাদ মুলতবিকৃত শাসনতন্ত্রে তাঁর ইচ্ছামতো পরিবর্তন সাধনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

www.pathagar.com

১৯৮৩ সনের ১৫ই ফ্রেব্রুয়ারি আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে গড়ে ওঠে ১৫ দলীয় ঐক্যজোট। অপর দিকে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের নেতৃত্বে গড়ে ওঠে ৭ দলীয় ঐক্যজোট।

১৯৮৩ সনের ১লা এপ্রিল থেকে দেশে ঘরোয়া রাজনীতির অনুমতি দেওয়া হয়।

১৯৮৩ সনের ২৮শে মার্চ (অর্থাৎ ঘরোয়া রাজনীতি শুরুর তিন দিন আগে) জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে প্রচারিত হয় গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য সম্বলিত একটি হ্যান্ডবিল।

এই হ্যান্ডবিলে বলা হয়,

> 'শাসনতন্ত্রে হাত দিতে গেলে এমন জটিলতার সৃষ্টি হবে যে, শেষ পর্যন্ত দেশ কোন্ সংকটে পতিত হয়, তা বলা যায় না। কারণ শাসনতন্ত্র এমন এক পবিত্র দলীল, যার ওপর জনগণের আস্থা না থাকলে দেশে কোনক্রমেই স্থিতিশীলতা আসতে পারে না। যে শাসনতন্ত্র জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা রচিত, সে শাসনতন্ত্রই জনগণের আনুগত্য লাভ করতে সক্ষম হয়। জনগণের ওপর চাপিয়ে দেয়া শাসনতন্ত্র কখনো ঐ মর্যাদা পায় না। দেশের বর্তমান শাসনতন্ত্র জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারাই রচিত। এ পর্যন্ত যে কয়েকবার একে সংশোধন করা হয়েছে তার কোনটাই শাসনতন্ত্রের বহির্ভূত (unconstitutional) পদ্ধতিতে করা হয়নি। এসব সংশোধনীর পক্ষে ও বিপক্ষে যত মতই থাকুক, এসব সংশোধনী আইনসম্মত বলে স্বীকার করতে সবাই বাধ্য। কারণ এসব সংশোধনী হয় জাতীয় সংসদে গৃহীত হয়েছে, না হয় গণভোটের মাধ্যমে অনুমোদিত হয়েছে। তাই বর্তমান শাসনতন্ত্রে যে কোন রকম সংশোধনী আনতে হলে জাতীয় সংসদের প্রয়োজন। যাঁরা শাসনতন্ত্রে যে সংশোধনীই আনতে চান, তাঁদের জন্য একমাত্র সঠিক ও নিয়মতান্ত্রিক মাধ্যমই হলো জাতীয় সংসদ। সংলাপের মাধ্যমে এটা কিছুতেই সম্ভব নয়। এ ব্যাপারে মতের বিভিন্নতা ব্যাপক। কেউ চান সংশোধন-পূর্বকালীন শাসনতন্ত্র। কেউ চান চতুর্থ সংশোধনীর পূর্বের শাসনতন্ত্র। কেউ চান পঞ্চম সংশোধনীর পরবর্তী, আর কেউ ষষ্ঠ সংশোধনীসহ চান। এর মিমাংসা কে করবে এবং কিভাবে হবে।'

সুখের বিষয়, সকল রাজনৈতিক দল এই কথা বুঝতে সক্ষম হয় যে নির্বাচিত জাতীয় সংসদ ছাড়া শাসনতন্ত্র সংশোধনে হাত দেওয়ার অধিকার কাউকে দেওয়া উচিত নয়। বিশেষ করে সামরিক সরকারের হাতে এই ক্ষমতা তুলে দেওয়া হবে মস্ত বড়ো ভুল।

www.pathagar.com

১৯৮৩ সনের ২০শে নবেম্বর বাইতুল মুকাররমের দক্ষিণ চত্বরে জামায়াতে ইসলামী একটি জনসভার আয়োজন করে। প্রধান বক্তা ছিলেন ভারপ্রাপ্ত আমীর আব্বাস আলী খান। উক্ত জনসভায় প্রধান বক্তা দুইটি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা দেন ঃ

এক. এরশাদ সরকার অবৈধ। কারণ সেনাপতি হিসেবে শাসনতন্ত্রের আনুগত্য করাই তাঁর কর্তব্য ছিলো। তিনি অন্যায়ভাবে শাসনতন্ত্র মুলতবি করে নির্বাচিত সরকারকে উচ্ছেদ করেছেন।

দুই. শাসনতন্ত্র পুনর্বহাল করার লক্ষ্যে মেজর জেনারেল এরশাদকে ক্ষমতা ত্যাগ করতে হবে। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে একটি কেয়ারটেকার সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে।

গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে যুগপৎ আন্দোলন

আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন ১৫ দলীয় জোট এবং বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের নেতৃত্বাধীন ৭ দলীয় জোট কিছু যুগপৎ কর্মসূচি দিতে থাকে। জামায়াতে ইসলামীকে যুগপৎ আন্দোলনে শরীক করতে অনীহা লক্ষ্য করা গেলো।

১৯৮৩ সনের ২৮শে নবেম্বর ১৫ দলীয় জোট ও ৭ দলীয় জোট সবিচালয় ঘেরাও কর্মসূচি দেয়। জনগণের তেমন সাড়া পাওয়া যায়নি। সচিবালয়ের দেয়াল ভাংগা ইত্যাদি কিছু ঘটনা ঘটে। সরকার এই সুযোগে সামরিক শাসন আবার দৃঢ় করে নেয়। রাজনৈতিক তৎপরতা আবার বন্ধ হয়ে যায়।

এই সময়টিতে জামায়াতে ইসলামীর লিয়াজোঁ কমিটি দুই নেত্রীসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সাথে যোগাযোগ করে অগণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসরণ করে গণতন্ত্রে উত্তরণ সম্ভব নয় বলে জামায়াতে ইসলামীর দৃষ্টিভংগি তুলে ধরে। এই বক্তব্যের প্রতি তাঁরা ইতিবাচক মনোভংগি ব্যক্ত করেন।

তখন থেকে ১৫ দলীয় জোট ও ৭ দলীয় জোটের সাথে জামায়াতে ইসলামীর লিয়াজোঁ কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হতে থাকে। একই দিনে পৃথক পৃথক রুটে মিছিল, পৃথক পৃথক স্থানে সমাবেশ এবং পৃথক পৃথক বিবৃতি প্রদান চলতে থাকে।

www.pathagar.com

১৯৮৪ সনের গোড়ার দিকে এরশাদ সরকার উপজিলা নির্বাচনের ঘোষণা দেয়।

এটা ছিলো এরশাদের স্বৈরশাসনের ভিত্ মজবুত করার কৌশল। ১৫ দলীয় জোট ও ৭ দলীয় জোট এবং জামায়াতে ইসলামী এটিকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হিসেবে গ্রহণ করে। তিন দিক থেকেই উচ্চারিত হয় : সর্বাগ্রে জাতীয় সংসদ নির্বাচন চাই। নির্বাচিত জাতীয় সংসদই সিদ্ধান্ত নেবে উপজিলা পরিষদ হবে কি হবে না। প্রশাসনের কোন পরিবর্তন সাধনের ইখতিয়ার সামরিক সরকারের নেই।

এই ইস্যুকে কেন্দ্র করে ১৫ দলীয় জোট, ৭ দলীয় জোট এবং জামায়াতে ইসলামীর যুগপৎ আন্দোলন শক্তি সঞ্চয় করতে সক্ষম হয়।

হুসেইন মুহাম্মাদ এরশাদ কর্তৃক রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ

১৯৮৩ সনের ১১ই ডিসেম্বর প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হুসেইন মুহাম্মাদ এরশাদ বিচারপতি আহসান উদ্দীন চৌধুরীকে সরিয়ে নিজেই রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

জেনারেল (অব.) মুহাম্মাদ আতাউল গনী ওসমানীর মৃত্যু

জেনারেল (অব.) মুহাম্মাদ আতাউল গনী ওসমানী ছিলেন বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক। 'জেনারেল ওসমানী 'সাহায্য' ছাড়া অন্য কোন ধরনের হস্তক্ষেপ ও মুরুব্বিয়ানা সহ্য করতে চাইতেন না।'

'নিজ দেশের স্বাধীন সত্তা সম্পর্কে তাঁর যে ভয়ংকর অহংকার ছিলো তার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই তিনি এটা চেয়েছিলেন। তাঁর বাহিনী ভারতীয় বাহিনীর সাথে সংযুক্ত হোক, এটা তিনি কিছুতেই চাইতেন না।'

লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার একক নেতৃত্বে ভারতীয়বাহিনী ও মুক্তিবাহিনীর যৌথকমান্ড গঠন তিনি সহজভাবে নিতে পারেননি।

তাই দেখা যায় যৌথকমান্ড গঠনের পরও তিনি মুক্তিবাহিনীকে সরাসরি কমান্ড করতেন।

এইসব কারণেই পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণের পুরো ঘটনা তাঁর নিকট গোপন রাখা হয়।

১৯৮৩ সনের ২৪ শে নবেম্বর সাপ্তাহিক বিচিত্রা-র পক্ষ থেকে তাঁকে

www.pathagar.com

জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো, 'পাকিস্তানী সৈন্যদের আত্মসমর্পণ আপনার নিকট হলো না কেন?' জওয়াবে তিনি বলেন, 'মুক্তিযুদ্ধের এমন অনেক ঘটনা আমি জানি, যাতে অনেকেরই অসুবিধা হবে। আমি একটা বই লিখছি। তাতে সব ঘটনাই পাবেন। একটা আত্মজীবনী লিখবো। অনেক অজানা ইতিহাস থাকবে তাতে। জেনারেল ওসমানীর জীবনীগ্রন্থ হবে না সেটা, সেটা হবে বাংলাদেশের জন্মের ইতিহাস।'

চিকিৎসার জন্য লন্ডন যাওয়ার প্রাক্কালে সি.এম.এইচ. হাসপাতালে তিনি এই সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন।

অনেক কথা, অনেক ইতিহাস বুকে নিয়ে ১৯৮৪ সনের ১৬ই জানুয়ারি জেনারেল (অব.) মুহাম্মাদ আতাউল গনী ওসমানী লন্ডনে মৃত্যুবরণ করেন।

রাষ্ট্রপতি এরশাদের সাথে বিরোধী দলগুলোর সংলাপ

১৯৮৪ সনের গোড়ার দিকে যুগপৎ আন্দোলন শক্তি সঞ্চয় করতে পারায় হুসেইন মুহাম্মাদ এরশাদ বিরোধী দলগুলোর সাথে সংলাপের তাকিদ অনুভব করেন।

জামায়াতে ইসলামী ১৫ দলীয় জোট এবং ৭ দলীয় জোটের নেতৃবৃন্দকে বুঝাবার চেষ্টা করে যে সংলাপ সফল করতে হলে সকল বিরোধী দল একই সংগে গিয়ে একই কথা বলা প্রয়োজন। জামায়াতে ইসলামীর এই কথার যৌক্তিকতা তাঁরা বুঝতে ব্যর্থ হন।

১৯৮৪ সনের ৯ই এপ্রিল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে ৭ দলীয় জোটের নেতৃবৃন্দ বংগভবনে গিয়ে রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহাম্মাদ এরশাদের কাছে ৩৩ দফা দাবি পেশ করে বংগভবন ত্যাগ করেন।

১৯৮৪ সনের ১০ই এপ্রিল ভারপ্রাপ্ত আমীর আব্বাস আলী খানের নেতৃত্বে জামায়াতে ইসলামীর একটি টিম বংগভবনে গিয়ে রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহাম্মাদ এরশাদের নিকট জামায়াতে ইসলামীর বক্তব্য তুলে ধরে। বক্তব্যে বলা হয়, 'সেনাপ্রধান হিসেবে শপথ নেওয়ার সময় আপনি যেই শাসনতন্ত্রের হিফাযাতের দায়িত্ব নিয়েছিলেন তা মুলতবি করে এবং নির্বাচিত সরকারকে উৎখাত করে ক্ষমতা দখল করার কোন বৈধ অধিকার আপনার ছিলো না।

www.pathagar.com

শাসনতন্ত্র পুনর্বহাল করে নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন সরকারের হাতে ক্ষমতা তুলে দিন। এই ব্যাপারে দুইটি বিকল্প পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারেন :

১. আপনি যদি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চান তাহলে সুপ্রিম কোর্টের কর্মরত প্রধান বিচারপতির নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করুন। তাঁর নেতৃত্বে একটি অরাজনৈতিক ও নির্দলীয় কেয়ারটেকার সরকার নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করুক। এই নির্বাচনে জনগণ আপনাকে নির্বাচিত করলে আপনি দেশ শাসনের বৈধ অধিকার পাবেন।

২. আপনি যদি ঘোষণা করেন যে, আপনি নিজে নির্বাচনে প্রার্থী হবেন না এবং কোন রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বে থাকবেন না তাহলে আপনাকেও কেয়ারটেকার সরকারপ্রধান হিসেবে গ্রহণ করতে আমরা সম্মত। নির্বাচনের পর আপনি পদত্যাগ করবেন এবং নির্বাচিত সরকার দেশ পরিচালনার দায়িত্ব পালন করবে।'

১৯৮৪ সনের ১১ই এপ্রিল আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ১৫ দলীয় জোটের নেতৃবৃন্দ বংগভবনে গিয়ে হুসেইন মুহাম্মাদ এরশাদের সাথে সংলাপ করেন প্রায় তিন ঘন্টা।

পৃথক পৃথক সংলাপের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি এরশাদ বিরোধী রাজনৈতিক দল গুলোর মধ্যে প্রচণ্ড মতবিরোধ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পেয়ে যান। এতে তিনি দৃঢ়তা দেখাতে শুরু করেন।

জামায়াতে ইসলামীর লিয়াজোঁ কমিটি উভয় জোটের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখে।

১৯৮৪ সনের ২৭শে সেপ্টেম্বর ১৫ দলীয় জোট, ৭ দলীয় জোট ও জামায়াতে ইসলামীর ডাকে সারা দেশে হরতাল পালিত হয়।

১৪ই অকটোবর ঢাকাতে ১৫ দলীয় জোট, ৭ দলীয় জোট এবং জামায়াতে ইসলামী যুগপৎ মহাসমাবেশ অনুষ্ঠিত করে। ১৫ দলীয় জোটের মহাসমাবেশ বাইতুল মুকাররমের দক্ষিণ চত্বরে, ৭ দলীয় জোটের মহাসমাবেশ বাইতুল মুকাররমের উত্তর গেটে এবং জামায়াতে ইসলামীর মহাসমাবেশ মতিঝিল শাপলা চত্বরে অনুষ্ঠিত হয়। জামায়াতে ইসলামীর মহাসমাবেশে প্রধান বক্তা ছিলেন ভারপ্রাপ্ত আমীর আব্বাস আলী খান।

www.pathagar.com

৮ই ডিসেম্বর সারা দেশে হরতাল পালিত হয়। এরপর ২২ ও ২৩শে ডিসেম্বর পালিত হয় দুই দিনের টানা হরতাল।

রাষ্ট্রপতি এরশাদের গণভোট বর্জন

১৯৮৫ সনের ২১শে মার্চ রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহাম্মাদ এরশাদ তাঁর প্রতি জনগণের আস্থা আছে কিনা তা যাচাইয়ের জন্য গণভোটের আয়োজন করেন।

ভাড়াটে কিছু লোক ছাড়া ভোট কেন্দ্রে কেউ যায়নি। তথাপিও নির্বাচন কমিশনের মাধ্যমে ঘোষণা করা হয় যে, বিশাল সংখ্যক ভোটার রাষ্ট্রপতির প্রতি তাদের আস্থা ব্যক্ত করেছে। অবশ্য যাতে বাধামুক্ত ভাবে গণভোট সম্পন্ন হতে পারে সেই জন্য ১লা মার্চ থেকেই রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ করা হয়েছিলো।

উপজিলা চেয়ারম্যান নির্বাচন বয়কট

এবার এরশাদ ঘোষণা করলেন যে, ১৯৮৫ সনের ১৬ ও ২০ মে উপজিলা চেয়ারম্যান নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। সংলাপে সকলেই সর্বাগ্রে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবি উত্থাপন করেছিলেন। হুসেইন মুহাম্মাদ এরশাদের উপজিলা চেয়ারম্যান নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা সেই দাবির প্রতি বৃদ্ধাংগুলি দেখানোর মতোই ছিলো।

১৫ দলীয় জোট, ৭ দলীয় জোট এবং জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে উপজিলা চেয়ারম্যান নির্বাচন বয়কট করার ঘোষণা দেওয়া হয়।

নির্বাচনের দিন হরতালও পালিত হয়।

সাউথ এশিয়ান এসোসিয়েশন ফর রিজিওনাল কো-অপারেশন গঠন

রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান উপমহাদেশের ৭টি রাষ্ট্রের একটি সংস্থা কায়েমের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। সাড়াও পেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর স্বপ্ন বাস্তবায়িত হওয়ার আগেই তিনি শহীদ হন।

www.pathagar.com

১৯৮৫ সনের ৭-৯ ডিসেম্বর বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলংকা, নেপাল, ভূটান ও মালদ্বীপের রাষ্ট্রপ্রধান/সরকারপ্রধানগণ ঢাকাতে মিলিত হয়ে সাউথ এশিয়ান এসোসিয়েশন ফর রিজিওনাল কো-অপারেশন (SAARC) গড়ে তোলেন। প্রতিষ্ঠা সম্মেলনেই অনেক মূল্যবান প্রস্তাব ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এইগুলো বাস্তবায়িত হলে সবগুলো দেশই উপকৃত হতো। কিন্তু বৃহৎ দেশ ভারতের সহযোগিতার অভাবে SAARC বেশিদূর এগুতে পারেনি।

১৯৮৬ সনের ৭ই মে অনুষ্ঠিত তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ

রাষ্ট্রপতি এরশাদ এবার জাতীয় সংসদ নির্বাচনের উদ্যোগ নেন।

নির্বাচন ঘোষণার পর ১৫ দলীয় জোট ও ৭ দলীয় জোটের সাথে জামায়াতে ইসলামীর লিয়াজোঁ কমিটির যোগাযোগ আরো বেড়ে যায়।

রাষ্ট্রপতি এরশাদের অধীনে নির্বাচন মোটেই অবাধ ও নিরপেক্ষ হওয়ার সম্ভাবনা ছিলো না।

জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে দুই জোটকে বলা হলো, রাষ্ট্রপতি এরশাদকে পদত্যাগ করে কেয়ারটেকার সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি জানালে নির্বাচন বয়কট করার ভিত্তি তৈরি হতে পারে। আর তাঁকে ক্ষমতায় রেখে নির্বাচনে গেলে তাঁর অবস্থান মযবুত করতে সহযোগিতা করা হবে।

কিন্তু জামায়াতে ইসলামী কর্তৃক প্রস্তাবিত কেয়ারটেকার সরকারের দাবির সাথে একমত হলে জামায়াতে ইসলামীর ভাবমর্যাদা বৃদ্ধি পায় বিধায় এই বিষয়ে একমত হতে জোটদ্বয়ের অনীহা ছিলো লক্ষ্য করার মতো।

এমতাবস্থায় জামায়াতে ইসলামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা এবং অপর দুইটি জোটকেও নির্বাচনমুখী করার সিদ্ধান্ত নেয়।

১৯৮৬ সনের ১৯শে মার্চ রাত দুইটায় জানা যায় যে, আওয়ামী লীগ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে। কিন্তু বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল তখন পর্যন্ত কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেনি। রাত তিনটায় জামায়াতে ইসলামীর

www.pathagar.com

লিয়াজোঁ কমিটিকে দলটি থেকে জানানো হয়, 'একটা টেকনিকেল কারণে আমরা এখনো সিদ্ধান্ত নিতে পারিনি। আগামীকাল সিদ্ধান্ত নেবো। আপনারা আপনাদের সিদ্ধান্ত পত্রিকায় দিয়ে দিন।' কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি।

১৯৮৬ সনের ৭ই মে জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

জামায়াতে ইসলামী ৭৬টি আসনে নমিনি দেয়।

নিজ নামে জামায়াতে ইসলামীর এটিই ছিলো জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রথম অংশ গ্রহণ। তাই জামায়াতে ইসলামীর জনশক্তির মধ্যে বেশ উৎসাহ-উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়।

এই নির্বাচনে ব্যাপক কারচুপি হয়।

এই নির্বাচনে হুসেইন মুহাম্মাদ এরশাদের জাতীয় পার্টি ১৫৮টি আসনে, আওয়ামী লীগ ৯৬টি আসনে, জামায়াতে ইসলামী ১০টি আসনে, জাসদ ৪টি আসনে, অন্যান্য দল ১০ টি আসনে এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীরা ২২টি আসনে বিজয়ী হয়।

জামায়াতে ইসলামী থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্যরা হচ্ছেন :

অধ্যাপক মুজিবুর রহমান (রাজশাহী), জনাব এ.এস.এম. মোজাম্মেল হক (ঝিনাইদহ), জনাব লতিফুর রহমান (নওয়াবগঞ্জ), জনাব কাজী শামসুর রহমান (সাতক্ষিরা), জনাব জবানউদ্দীন আহমদ (নিলফামারী), এডভোকেট নূর হোসাইন (যশোর), জনাব মকবুল হোসেন (ঝিকরগাছা), জনাব আবদুর রহমান ফকির (বগুড়া), জনাব মীম. উবাইদুল্লাহ (নওয়াবগঞ্জ) এবং জনাব আবদুল ওয়াহিদ (কুষ্টিয়া)।

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে জামায়াতে ইসলামীর এটি দ্বিতীয় উপস্থিতি।

১৯৮৬ সনের রাষ্ট্রপতি নির্বাচন বর্জন

১৯৮৬ সনের ১লা সেপ্টেম্বর হুসেইন মুহাম্মাদ এরশাদ আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় পার্টিতে যোগদান করেন এবং পার্টির চেয়ারম্যান হন।

www.pathagar.com

১৯৮৬ সনের ৪ঠা সেপ্টেম্বর হুসেইন মুহাম্মাদ এরশাদ নিজকে লে. জেনারেল পদে উন্নীত করে সেনাবাহিনী থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

অতপর জনগণের নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি হিসেবে নিজকে সু-প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তিনি রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত নেন। জামায়াতে ইসলামীর লিয়াজোঁ কমিটি উভয় জোটের নেত্রীর সাথে যোগাযোগ করে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন বর্জনের ব্যাপারে সম্মত করার চেষ্টা করে।

১৯৮৬ সনের ১৫ই অকটোবর রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন জোট, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল নেতৃত্বাধীন জোট এবং জামায়াতে ইসলামী নির্বাচন বর্জন করায় রাষ্ট্রপতি নির্বাচন খুব পানসে হয়ে যায়। রাষ্ট্রপতি নির্বাচন দ্বারা হুসেইন মুহাম্মাদ এরশাদ যেই গৌরব অর্জন করতে চেয়েছিলেন তা তিনি অর্জন করতে পারেননি।
১৯৮৬ সনের ২৩শে অকটোবর হুসেইন মুহাম্মাদ এরশাদ নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন।
জামায়াতে ইসলামীর লিয়াজোঁ কমিটি স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন জোরদার করার লক্ষ্যে আবার যোগাযোগ শুরু করে।

এই সময় ১৫ দলীয় জোট থেকে বেরিয়ে যাওয়া বামদের গড়া ৫ দলীয় জোট নোংরা রাজনীতিতে লিপ্ত হয়। তারা বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের কাছে গিয়ে বলে, জামায়াতে ইসলামী আওয়ামী লীগের সাথে আঁতাত করে সংসদ নির্বাচন করেছে, তাই এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে জামায়াতে ইসলামীকে সাথে নেবেন না। আবার আওয়ামী লীগের কাছে গিয়ে বলে, জামায়াতে ইসলামী স্বাধীনতা বিরোধী দল। কাজেই তাদেরকে নিয়ে গণতান্ত্রিক আন্দোলন করা যাবে না।

১৯৮৭ সনের ৩রা ডিসেম্বর ১০ জন সংসদ সদস্যের পদত্যাগ

১৯৮৭ সনে রাষ্ট্রপতি এরশাদের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে যুগপৎ আন্দোলন আবার গড়ে ওঠে। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করায় আন্দোলনে বেশি সোচ্চার হয়।

www.pathagar.com

১৯৮৭ সনের ৩রা ডিসেম্বর জামায়াতে ইসলামীর ১০ জন সংসদ সদস্য মাননীয় স্পিকার শামসুল হুদা চৌধুরীর নিকট গিয়ে পদত্যাগপত্র পেশ করেন। আওয়ামী লীগ সদস্যগণও পদত্যাগপত্র পেশ করবেন বলে জানানো হয়। কিন্তু নেত্রী বিদেশে থাকায় তাঁদের সিদ্ধান্ত নিতে দেরি হচ্ছিলো। ঠিক এই অবস্থাতেই ৬ই ডিসেম্বর রাষ্ট্রপতি এরশাদ জাতীয় সংসদ ভেংগে দেন। এতে আওয়ামী লীগ বেশ বেকায়দায় পড়ে যায়।

১৯৮৮ সনের ৩রা মার্চ অনুষ্ঠিত চতুর্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচন বর্জন

শাসনতান্ত্রিক শূন্যতা পূরণের জন্য রাষ্ট্রপতি এরশাদ তীব্রভাবে জাতীয় সংসদের নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন এবং নির্বাচন অনুষ্ঠানের কার্যক্রম শুরু করেন।

আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন ৮ দলীয় জোট, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের নেতৃত্বাধীন ৭ দলীয় জোট এবং জামায়াতে ইসলামী এই নির্বাচন বয়কট করে।

আ.স.ম. আবদুর রবের নেতৃত্বে কয়েকটি ছোট ছোট দল একত্রিত হয়ে এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে।

ভোটার উপস্থিতি ছিলো প্রায় শূন্য। তবুও নির্বাচন কমিশনকে দিয়ে ঘোষণা করানো হয় এই নির্বাচনে ৬০ ভাগ ভোটার ভোট দিয়েছেন। আরো ঘোষণা করা হয়, জাতীয় পার্টি ২৫১টি আসনে, আ.স.ম. আবদুর রবের নেতৃত্বাধীন কম্বাইন্ড অপোজিশন ১৯টি আসনে, অন্যান্য দল ৫টি আসনে এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীগণ ২৫টি আসনে বিজয়ী হয়েছেন।

বড় বড় দলগুলো নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করায় এই নির্বাচন দেশে-বিদেশে গ্রহণযোগ্য হলো না। কোন না কোন ভাবে জনমতকে প্রভাবিত করার জন্য রাষ্ট্রপতি এরশাদ তখন মরিয়া।

১৯৮৮ সনের ৭ই জুন জাতীয় সংসদ তাঁর সিদ্ধান্তে সংবিধানের অষ্টম সংশোধনী পাশ করে।

'রাষ্ট্রধর্ম' শিরোনামে একটি অনুচ্ছেদ সংযোজন করে তাতে বলা হয় "ইসলাম প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম, তবে প্রজাতন্ত্রে অন্যান্য ধর্মও শান্তি ও সম্প্রীতিতে পালন করা যাবে।"

www.pathagar.com

এই সময় বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা, অন্যতম সেকটার কমান্ডার, মেজর জেনারেল (অব.) সি. আর. দত্তের উদ্যোগে "রাষ্ট্রধর্ম" অনুচ্ছেদ প্রত্যাহারের দাবিতে আন্দোলন চালাবার জন্য গঠিত হয় "হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃস্টান ঐক্য পরিষদ।"

কেয়ারটেকার সরকারের দাবিতে আবার যুগপৎ আন্দোলন

১৯৮৯ সনের অকটোবর মাসে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন ৮ দলীয় জোট, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের নেতৃত্বাধীন ৭ দলীয় জোট, বামদের ৫ দলীয় জোট এবং জামায়াতে ইসলামী কেয়ারটেকার সরকারের অধীনে জাতীয় সংসদের নির্বাচনের দাবিতে আন্দোলন পরিচালনার সিদ্ধান্ত গ্রহণের সাথে সাথেই এরশাদবিরোধী আন্দোলন চাংগা হয়ে ওঠে।

অনেক বিলম্বে হলেও জামায়াতে ইসলামীর কেয়ারটেকার সরকারের দাবি জাতীয় দাবিতে পরিণত হয়

১৯৯০ সনের ১৯শে নবেম্বর বিকেলে অনুষ্ঠিত পৃথক পৃথক সমাবেশ থেকে ৮ দলীয় জোট, ৭ দলীয় জোট, ৫ দলীয় জোট এবং জামায়াতে ইসলামী কেয়ারটেকার সরকারের রূপরেখা প্রকাশ করে।

১৯৯০ সনের ২৭শে নবেম্বর দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হয়। কারফিউ জারি করা হয়। ছাত্র-জনতা কারফিউ ভেংগে মিছিল করতে থাকে।

১৯৯০ সনের ৪ঠা ডিসেম্বর রাজনৈতিক নেতা-কর্মী, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, ছাত্র, শ্রমিক এবং বিভিন্ন পেশার অগণিত লোক ঢাকা মহানগরীর রাজপথ গুলো মিছিলে মিছিলে ভরে দেয়।

১৯৯০ সনের ৫ই ডিসেম্বর বিরোধী দলগুলো সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমদকে কেয়ারটেকার প্রধান করার জন্য চাপ সৃষ্টি করে। রাষ্ট্রপতি এরশাদ ঐদিনই জাতীয় সংসদ ভেংগে দেন।

১৯৯০ সনের ৬ই ডিসেম্বর ব্যারিস্টার মওদূদ আহমদ উপরাষ্ট্রপতি পদে ইস্তফা দেন। রাষ্ট্রপতি এরশাদ বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদকে উপরাষ্ট্রপতি নিযুক্ত করে, তাঁকে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বানিয়ে, নিজে রাষ্ট্রপতি পদে ইস্তফা দেন।

www.pathagar.com

১৯৯১ সনের ২৭শে ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ

১৯৯০ সনের ৬ই ডিসেম্বর বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদ অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট হিসেবে কেয়ারটেকার সরকারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি ৯জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে উপদেষ্টা নিযুক্ত করেন। উপদেষ্টাগণ হচ্ছেন-

১. জনাব কফিলউদ্দিন মাহমুদ (সাবেক অর্থ সচিব), ২. জনাব ফখরুদ্দীন আহমদ (সাবেক পররাষ্ট্র সচিব), ৩. ডা. এম.এ. মাজেদ (সাবেক সভাপতি, বি.এম.এ), ৪. ড. জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী (সাবেক ভিসি, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়), ৫. এম.জি. কিবরিয়া (সাবেক আইজিপি), ৬. মেজর (অব.) রফিকুল ইসলাম (বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা), ৭. ব্যারিস্টার সৈয়দ ইশতিয়াক আহমদ (সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়ার আইনজীবী), ৮. ড. রেহমান সুবহান (অধ্যাপক ও অর্থনীতিবিদ), ৯. জনাব আবদুল খালেক (সাবেক আইজিপি)।

বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদের নেতৃত্বাধীন কেয়ারটেকার সরকার নির্ধারিত সময়ের মধ্যে একটি সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ১৯৯১ সন বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ সন।

> "এই প্রথম সুযোগ আসে একটি নিরপেক্ষ ও নির্দলীয় সরকারের তত্বাবধানে অনুষ্ঠেয় নির্বাচনের মাধ্যমে সত্যিকারের গণপ্রতিনিধিত্বমূলক সরকার নির্বাচন করার।"[৫৫]

২৬শে ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় কেয়ারটেকার সরকার প্রধান অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমদ রেডিও টেলিভিশন ভাষণে বলেন, "এবারের নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ হতে বাধ্য।" রাতে প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি মুহাম্মাদ আবদুর রউফ রেডিও ও টেলিভিশন ভাষণে বলেন, "যেই কোন মূল্যে নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ করা হবে।"

২৭শে ফেব্রুয়ারি শান্তিপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয় পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন।

---

৫৫. এম. এ. ওয়াজেদ মিয়া, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ঘিরে কিছু ঘটনা ও বাংলাদেশ, পৃষ্ঠা- ৩৮৯।

www.pathagar.com

এই নির্বাচনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল ১৪০টি আসনে, আওয়ামী লীগ ৮৮টি আসনে, জাতীয় পার্টি (এরশাদ) ৩৫টি আসনে, জামায়াতে ইসলামী ১৮টি আসনে, অন্যান্য দল এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীগণ ১৯টি আসনে বিজয়ী হন। বেগম খালেদা জিয়া ও হুসেইন মুহাম্মাদ এরশাদ পাঁচটি পাঁচটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে প্রত্যেকটিতেই বিজয়ী হন। শেখ হাসিনা তিনটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে মাত্র ১টি আসনে বিজয়ী হন।

২৮শে ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় আওয়ামী লীগ সভানেত্রী এক সাংবাদিক সম্মেলনে "কতিপয় অদৃশ্য শক্তির গোপন আঁতাতের মাধ্যমে নির্বাচনে সূক্ষ্ম ও সুকৌশলে কারচুপি হয়েছে"[৫৬] বলে হাস্যকর উক্তি করেন।

১লা মার্চ এক সাংবাদিক সম্মেলনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া বলেন, "নির্বাচন অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ, সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয়েছে। তবে ভোটার তালিকা ছিলো ত্রুটিপূর্ণ। ভোটার তালিকায় ত্রুটি না থাকলে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল দুই তৃতীয়াংশ আসন পেতো।"[৫৭]

ঐ দিনই আওয়ামী লীগ প্রেসিডিয়ামের অন্যতম সদস্য ড. কামাল হোসেন (যিনি নির্বাচনে বিজয়ী হতে পারেননি) এক বিবৃতিতে গণরায়ের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, "নির্বাচন শান্তিপূর্ণ ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে। আমি আশা করি, সবাই অর্জিত গণতন্ত্র রক্ষা করবেন।"[৫৮]

"৩রা মার্চ আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা নির্বাচনে আওয়ামী লীগের ব্যর্থতার দায়দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে সভানেত্রীর দায়িত্ব থেকে পদত্যাগ করেন।"

তবে ৫ই মার্চ তিনি সহকর্মীদের অনুরোধে পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করে নেন।

এই নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামীর নমিনি ছিলেন ২২২ জন। ১৮ জন বিজয়ী হন।

---

৫৬. এম. এ. ওয়াজেদ মিয়া, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ঘিরে কিছু ঘটনা ও বাংলাদেশ, পৃষ্ঠা-৪০৩।
৫৭. এম. এ. ওয়াজেদ মিয়া, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ঘিরে কিছু ঘটনা ও বাংলাদেশ, পৃষ্ঠা-৪০৩।
৫৮. এম. এ. ওয়াজেদ মিয়া, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ঘিরে কিছু ঘটনা ও বাংলাদেশ, পৃষ্ঠা-৪০৩।

www.pathagar.com

বিজয়ী সদস্যগণ হচ্ছেন–

১. মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী (পাবনা), ২. মাওলানা আবদুস সুবহান (পাবনা), ৩. মাওলানা আযিযুর রহমান চৌধুরী (দিনাজপুর), ৪. মাওলানা শাহাদাতুজ্জামান (বগুড়া), ৫. মাওলানা নাছিরুদ্দিন (নওগাঁ), ৬. লতিফুর রহমান (নওয়াবগঞ্জ), ৭. মাওলানা আবু বাকর শেরকুলি (নাটোর), ৮. মাওলানা হাবিবুর রহমান (চুয়াডাঙ্গা), ৯. মাওলানা সাখাওয়াত হুসাইন (যশোর), ১০. মুফতী আবদুস সাত্তার (বাগেরহাট), ১১. শাহ মুহাম্মাদ রহুল কুদ্দুস (খুলনা), ১২. এড. শেখ আনছার আলী (সাতক্ষিরা), ১৩. কাজী শামসুর রহমান (সাতক্ষিরা), ১৪. এ.এস.এম. রিয়াছাত আলী (সাতক্ষিরা), ১৫. গাজী নজরুল ইসলাম (সাতক্ষিরা), ১৬. ডা. এ.কে.এম. আসজাদ (রাজবাড়ি), ১৭. শাহজাহান চৌধুরী (চট্টগ্রাম) এবং ১৮. এনামুল হক মনজু (কক্সবাজার)।

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে জামায়াতে ইসলামীর এটি তৃতীয় উপস্থিতি।

১৯৯১ সনে সরকার গঠনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলকে সহযোগিতা প্রদান

পঞ্চম জাতীয় সংসদ ছিলো একটি ঝুলন্ত সংসদ।

সরকার গঠনের জন্য কমপক্ষে ১৫১টি আসন প্রয়োজন। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল ১৪০টি আসন পেয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হলেও সরকার গঠনের জন্য এর কমপক্ষে আরো ১১ জন সংসদ সদস্যের সমর্থন প্রয়োজন ছিলো।

আওয়ামী লীগ ৮৮টি আসনের সাথে জাতীয় পার্টির (এরশাদ)-এর ৩৫টি আসন এবং অন্যান্য ১৯টি আসন মিলে জোটবদ্ধ হলে আসন সংখ্যা দাঁড়ায় ১৪২টি। তার মানে, আওয়ামী লীগের সরকার গঠনের জন্য প্রয়োজন ছিলো আরো ৯ জন সংসদ সদস্যের সমর্থন।

অর্থাৎ আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন জামায়াতে ইসলামীর ১৮ জন সংসদ সদস্যকেই "ব্যালান্স অব পাওয়ার" বানিয়ে দেন। জামায়াতে ইসলামীর

www.pathagar.com

সমর্থন ছাড়া না বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল, না আওয়ামী লীগের পক্ষে সরকার গঠন সম্ভব হচ্ছিলো।

এমতাবস্থায় আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা তাঁর দলের অন্যতম শীর্ষ নেতা আমির হোসেন আমুকে জামায়াতে ইসলামীর অন্যতম শীর্ষ নেতা আলী আহসান মুহাম্মাদ মুজাহিদের নিকট প্রেরণ করেন এবং বেশ কয়েকটি মন্ত্রিত্ব নিয়ে জামায়াতে ইসলামীকে আওয়ামী লীগের সাথে কোয়ালিশন সরকারে যোগদানের আহ্বান জানান।

এই দিকে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের পক্ষ থেকে দলটির তৎকালীন মহাসচিব আবদুস সালাম তালুকদার জামায়াতে ইসলামীর ভারপ্রাপ্ত আমীর আব্বাস আলী খান বরাবর সরকার গঠনে তাঁদের দলকে সমর্থন করার জন্য অনুরোধপত্র পাঠান।

১১ই মার্চ জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারী জেনারেল মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, আলী আহসান মুহাম্মাদ মুজাহিদ, মুহাম্মাদ কামারুজ্জামান ও এড. শেখ আনছার আলী অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদের নিকট সমর্থনপত্রটি হস্তান্তর করেন।

১৯৯১ সনের ১৯শে মার্চ অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি শাহাবুদ্দীন আহমদ বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের চেয়ারপাসন বেগম খালেদা জিয়াকে প্রধানমন্ত্রী করে ১০ জন পূর্ণমন্ত্রী ও ২১জন প্রতিমন্ত্রীর সমন্বয়ে একটি মন্ত্রী পরিষদ গঠন করেন।

১৯৯১ সনের ২০শে মার্চ বিকেল আড়াইটায় নির্ধারিত ছিলো মন্ত্রীদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান।

"আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা কিংবা তাঁর দলের কোন নেতা বা সংসদ সদস্য উক্ত শপথ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন না।"

২৮শে মার্চ জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত ৩০টি মহিলা আসনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের ২৮ জন এবং জামায়াতে ইসলামীর ২ জন নমিনি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন।

জামায়াতে ইসলামীর দুইজন মহিলা সংসদ সদস্য হচ্ছেন- হাফিযা আসমা খাতুন ও খন্দকার রাশেদা খাতুন।

www.pathagar.com

সংসদীয় পদ্ধতিতে প্রত্যাবর্তনে ভূমিকা পালন

১৯৭২ সনে প্রবর্তিত সরকার পদ্ধতি ছিলো সংসদীয় বা পার্লামেন্টারী।

১৯৭৫ সনের ২৫শে জানুয়ারি জাতীয় সংসদে গৃহীত সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী অনুযায়ী দেশে রাষ্ট্রপতি পদ্ধতি বা প্রেসিডেনশ্যাল পদ্ধতি চালু হয়।

১৯৯১ সন পর্যন্ত দেশে প্রেসিডেনশ্যাল পদ্ধতিই চালু ছিলো।

১৯৯১ সনে পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর রাজনৈতিক দলগুলো সরকার পদ্ধতি নিয়ে নতুন করে মতামত ব্যক্ত করা শুরু করে।

প্রেসিডেন্ট পদ্ধতি কোন মন্দ পদ্ধতি নয়। এই পদ্ধতি সফলভাবেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চালু রয়েছে। তবে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে প্রেসিডেন্ট পদ্ধতি স্বৈরশাসনে রূপান্তরিত হওয়ার বহু নমুনা রয়েছে। এই পদ্ধতিতে একই ব্যক্তি রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকারপ্রধান হন বিধায় স্বৈরশাসনের রূপ নেওয়ার ঝুঁকি থাকে।

সংসদীয় পদ্ধতিতে রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকারপ্রধান হন ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি। সংসদীয় পদ্ধতি বৃটেনে সফলভাবে প্রচলিত রয়েছে কয়েক শতাব্দী ধরে।

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল গোড়া থেকেই প্রেসিডেনশ্যাল পদ্ধতিতে বিশ্বাসী ছিলো। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াও একই মতের অনুসারী ছিলেন।

আওয়ামী লীগ গোড়াতে সংসদীয় পদ্ধতি প্রবর্তন করে পরে প্রেসিডেনশ্যাল পদ্ধতি চালু করে।

পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জনগণ কর্তৃক প্রত্যাখাত হয়ে রাজনৈতিকভাবে দারুণ বেকায়দায় পড়ে। সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করা ছাড়া দলটির কোন বিকল্প পথ ছিলো না। আর সংসদীয় সরকার পদ্ধতিতে প্রত্যাবর্তনের দাবি ছাড়া অন্য কোন দাবি নিয়ে মাঠে নেমে কোন ফায়দা হতো না। অতএব আওয়ামী লীগ এই দাবি নিয়েই সোচ্চার হয় এবং সংসদীয় পদ্ধতিতে প্রত্যাবর্তনের জন্য জাতীয় সংসদে সংবিধান সংশোধনী বিল জমা দেয়।

জামায়াতে ইসলামীর লিয়াজোঁ কমিটি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের শীর্ষ

www.pathagar.com

নেতাদের সাথে যোগাযোগ করে বাংলাদেশে সংসদীয় সরকার পদ্ধতি চালু করার যৌক্তিকতা তুলে ধরে। এই বিষয়ে মত বিনিময়ের জন্য প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া জামায়াতে ইসলামীর ভারপ্রাপ্ত আমীরসহ কয়েকজন শীর্ষ নেতার সাথে বসতে চাইলেন।

মিটিংয়ের তারিখ, সময় নির্ধারিত হয়। মিটিংয়ে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সাথে ছিলেন আবদুস সালাম তালুকদার ও কর্ণেল (অব.) মুস্তাফিজুর রহমান।

জামায়াতে ইসলামীর ভারপ্রাপ্ত আমীর আব্বাস আলী খানের সাথে ছিলেন আলী আহসান মুহাম্মাদ মুজাহিদ ও মুহাম্মাদ কামারুজ্জামান।

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল প্রেসিডেনশ্যাল পদ্ধতির পক্ষে যুক্তি পেশ করে। জামায়াতে ইসলামী সংসদীয় পদ্ধতির পক্ষে যুক্তি পেশ করে। এইভাবেই মিটিং শেষ হয়ে যায়।

সুখের বিষয়, ঐ রাতেই বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল সংসদীয় সরকার পদ্ধতির পক্ষে সিদ্ধান্ত নেয় এবং জাতীয় সংসদে সংবিধান সংশোধনী বিল উত্থাপনের আয়োজন সম্পন্ন করে।

সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা নিজামীর ওপর সন্ত্রাসী হামলা

১৯৯১ সনের ২৭শে মে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার ড. মুহাম্মাদ মনিরুজ্জামান মিঞা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদেরকে একটি মিটিংয়ে যোগদান করতে আহ্বান জানান। ক্যাম্পাসে একটি সুন্দর পরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যেই তিনি মিটিংয়ের আয়োজন করেন।

ভারপ্রাপ্ত আমীর আব্বাস আলী খান এই মিটিংয়ে আমন্ত্রিত হন। তিনি ঐ দিন ঢাকা অনুপস্থিত থাকবেন বিধায় তদানীন্তন সেক্রেটারী জেনারেল মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী এম.পি.-কে পাঠাবেন বলে ভাইস চ্যান্সেলারকে টেলিফোনে জানান।

www.pathagar.com

ঐ মিটিংয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সদস্যবৃন্দ এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিবৃন্দ মিলে প্রায় ৬০ জন উপস্থিত হন।

মিটিং চলাকালে ছাত্রলীগের একটি মিছিল মাওলানা নিজামীর বিরুদ্ধে শ্লোগান দিতে দিতে সম্মেলন কক্ষে ঢুকে পড়ে। মিছিলকারীরা মাওলানা নিজামীকে মিটিং থেকে বের করে দেওয়ার দাবি জানায়।

ভাইস চ্যান্সেলার সাহেব শান্তিপূর্ণভাবে সুন্দর যুক্তি দিয়ে তাদেরকে বুঝাবার চেষ্টা করেন। ওরা চলে যায়।

মিটিং আবার শুরু হয়। এই সময় কয়েকটি ছাত্র সংগঠনের কর্মীরা একত্রিত হয়ে আবার সম্মেলন কক্ষে ঢুকে পড়ে এবং মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর ওপর আঘাত হানতে শুরু করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোকটার হামলাকারীদেরকে থামাতে গিয়ে নিজেও আহত হন।

আহত মাওলানা নিজামী ফ্লোরে পড়ে যান এবং জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। এবার সন্ত্রাসীরা সেখান থেকে সরে পড়ে।

খবর পেয়ে পুলিশ ছুটে আসে এবং গুরুতর আহত নিজামী সাহেবকে উঠিয়ে ইবনে সিনা হাসপাতালে নিয়ে যায়।

প্রধানমন্ত্রী, জাতীয় সংসদের স্পিকার ও মন্ত্রীদের অনেকেই তাঁকে দেখতে হাসপাতালে যান।

বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ এই সন্ত্রাসী হামলার নিন্দা করে বিবৃতি দেন।

বড়ো দলগুলোর মধ্যে ব্যতিক্রম ছিলো আওয়ামী লীগ। এই দলটির পক্ষ থেকে সন্ত্রাসী হামলার নিন্দা করে কোন বিবৃতি দেওয়া হয়নি।

জাতীয় সংসদ কর্তৃক সংবিধানের একাদশ ও দ্বাদশ সংশোধনী গ্রহণ

সরকার পদ্ধতি সম্পর্কে মতপার্থক্য থাকায় পঞ্চম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে সংবিধান সংশোধনী গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল এবং আওয়ামী লীগের সাথে যোগাযোগ করে মতপার্থক্য দূর করার চেষ্টা চালানো হয়। অবশেষে মতপার্থক্য দূর হয়।

www.pathagar.com

সংবিধানের একাদশ সংশোধনী ছিলো অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদের সুপ্রিম কোর্টে ফিরে যাওয়ার বিধান সংক্রান্ত। আর দ্বাদশ সংশোধনী ছিলো প্রেসিডেনশ্যাল পদ্ধতির সরকার বিষয়ক বিধানগুলোর স্থলে সংসদীয় সরকার বিষয়ক বিধানগুলোর প্রতিস্থাপন সংক্রান্ত।

১৯৯১ সনের ১০ই অগাস্ট রাতে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল, আওয়ামী লীগ, জামায়াতে ইসলামী, অন্যান্য দল এবং স্বতন্ত্র সদস্যগণ সর্বসম্মতভাবে সংশোধনী দুইটি পাস করে অনুপম ঐক্যের উদাহরণ স্থাপন করেন। এই ঐক্যের উদাহরণ গোটা জাতিকে বিপুলভাবে পুলকিত করে।

১৯৯১ সনের ৮ই অকটোবর প্রেসিডেন্ট নির্বাচন

ইতোপূর্বে প্রেসিডেনশ্যাল পদ্ধতি চালু ছিলো বিধায় সংবিধানে জনগণের ভোটে প্রেসিডেন্ট নির্চাচিত হওয়ার বিধান ছিলো।

সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনী গৃহীত হওয়ায় সংসদ সদস্যদের ভোটে প্রেসিডেন্ট নির্চাচিত হওয়ার বিধান প্রতিস্থাপিত হয়।

১৯৯১ সনের ৮ই অকটোবর প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের দিন ধার্য হয়।

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের পক্ষ থেকে জনাব আবদুর রহমান বিশ্বাস মনোনীত হন।

আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে মনোনীত হন সাবেক প্রধান বিচারপতি বদরুল হায়দার চৌধুরী।

জাতীয় সংসদে দুইজন মহিলাসহ জামায়াতে ইসলামীর সংসদ সদস্য ছিলেন ২০ জন। প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীদ্বয় তাঁদের ভোট পাওয়ার জন্য ভিন্ন ভিন্ন সময়ে এসে আমীরে জামায়াত অধ্যাপক গোলাম আযমের দু'আ চান। অবশ্য প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামী ভোট প্রদানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেনি। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের নমিনির এমনিতেই সংখ্যাধিক্য ভোট পাওয়া নিশ্চিত ছিলো। জামায়াতে ইসলামীর সংসদ সদস্যগণ প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ভোট দিচ্ছেন না জেনে জাতীয় পার্টির (এরশাদ) ৩৫ জন সদস্যও ভোটদানে বিরত থাকেন। এতে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থীর ভোট সংখ্যা আরো কমে যায়।

www.pathagar.com

সর্বোচ্চসংখ্যক ভোট পেয়ে জনাব আবদুর রহমান বিশ্বাস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।

আমীরে জামায়াত অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিকত্ব মামলা

১৯৭৩ সনের ১৮ই এপ্রিল শেখ মুজিবুর রহমান সরকার বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করার অভিযোগে ৩৯ জন বিশিষ্ট ব্যক্তির নাগরিকত্ব বাতিল করে। এঁদের মধ্যে ছিলেন- সর্বজনাব নূরুল আমীন (এন.ডি.এফ.), এডভোকেট হামিদুল হক চৌধুরী (পি.ডি.পি), মাহমুদ আলী (পি.ডি.পি), এডভোকেট জুলমত আলী খান (মুসলিম লীগ), ওয়াহিদুজ্জামান (মুসলিম লীগ), কাজী আবদুল কাদের (মুসলিম লীগ), এ.কিউ.এম. শফিকুল ইসলাম (মুসলিম লীগ), ড. গোলাম ওয়াহিদ চৌধুরী, রাজা ত্রিদিব রায় (চাকমা রাজা), আবদুল জাব্বার খদ্দর (কৃষক শ্রমিক পার্টি), মাওলানা আবদুর রহিম (জামায়াতে ইসলামী), অধ্যাপক গোলাম আযম (জামায়াতে ইসলামী), শেখ আনসার আলী (জামায়াতে ইসলামী), মাস্টার শফিকুল্লাহ (জামায়াতে ইসলামী), অধ্যাপক মহিউদ্দিন চৌধুরী (জামায়াতে ইসলামী), অধ্যাপক আবদুল খালেক (জামায়াতে ইসলামী), অধ্যাপক ইউসুফ আলী (জামায়াতে ইসলামী), মাওলানা তমিজুদ্দীন (জামায়াতে ইসলামী), ব্যারিস্টার কুরবান আলী প্রমুখ।

১৯৭১ সনের ২২ শে নবেম্বর অধ্যাপক গোলাম আযম জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান-এর কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের অধিবেশনে যোগদানের জন্য লাহোর গিয়েছিলেন। অধিবেশন শেষে তিনি ঢাকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ শুরু হওয়ায় প্লেন গতিপথ পরিবর্তন করে জিদ্দা গিয়ে অবতরণ করে। সেখান থেকে অধ্যাপক গোলাম আযম আবার লাহোর আসেন।

১৯৭৩ সনের এপ্রিল মাসে অধ্যাপক গোলাম আযম হাজ পালনের জন্য

www.pathagar.com

মাক্কা যান। সেখানে অবস্থান কালেই তিনি তাঁর নাগরিকত্ব বাতিলের ঘোষণা সম্পর্কে অবহিত হন। তিনি লন্ডন চলে যান।

১৯৭৬ সনের জানুয়ারি মাসে বাংলাদেশ সরকার ঘোষণা করে যে যাঁদের নাগরিকত্ব বাতিল করা হয়েছিল তাঁরা নাগরিকত্ব বহালের জন্য সরাসরি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিবের নিকট দরখাস্ত করবেন।

এই ঘোষণা অনুযায়ী যাঁরা আবেদন করেছিলেন তাঁরা নাগরিকত্ব ফিরে পান।

১৯৭৬ সনের মে মাসে অধ্যাপক গোলাম আযম তাঁর নাগরিকত্ব ফিরে পাওয়ার জন্য স্বরাষ্ট্র সচিবের নিকট আবেদন করেন। কিন্তু কোন ইতিবাচক সাড়া পাননি।

১৯৭৭ সনের জানুয়ারি মাসে তিনি তদানীন্তন প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক মে. জেনারেল জিয়াউর রহমানের নিকট আবেদনপত্র পাঠান। কোন সদুত্তর মেলেনি।

১৯৭৮ সনে তিনি নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের নিকট আবেদনপত্র প্রেরণ করেন। এবারও তাঁকে নাগরিকত্ব ফিরিয়ে দেওয়া হলো না।

অবশেষে তাঁর অসুস্থ বৃদ্ধা আম্মার আবেদনে সরকার তাঁকে বাংলাদেশে আসার ভিসা দেয়।

১৯৭৮ সনের ১১ই জুলাই তিনি দেশে ফিরেন। দেশে ফিরে তিনি নাগরিকত্ব বহালের জন্য আবারো আবেদন পেশ করেন।

১৯৭৮ সনের নবেম্বর মাসে সরকার তাঁকে ১০ই ডিসেম্বরের মধ্যে দেশ থেকে চলে যেতে বলে। অধ্যাপক গোলাম আযম লিখিতভাবে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানকে জানান যে তাঁর পক্ষে দেশ ত্যাগ করা সম্ভব নয়। এরপর সরকার আর কিছুই বলেনি।

১৯৮০ সনের মে মাসে জানা যায় যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিকত্ব বহালের সুপারিশ সম্বলিত ফাইল দস্তখতের জন্য প্রেসিডেন্টর নিকট পাঠিয়েছেন। ঐ মাসেই জাতীয় সংসদের এক সদস্যের প্রশ্নের

www.pathagar.com

জওয়াবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন যে তাঁর নাগরিকত্ব বহালের বিষয়টি সরকারের বিবেচনাধীন রয়েছে।

১৯৮৮ সনের ৩১শে মে জাতীয় সংসদে তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী ব্যারিস্টার মওদূদ আহমদ একটি বিবৃতি দেন। তিনি বলেন, "অধ্যাপক গোলাম আযম বাংলাদেশী নাগরিকত্ব লাভের উদ্দেশ্যে সরকারের নিকট যেই আবেদন করেছেন, তা সরকার এখনো বিবেচনা করেনি। ঐ আবেদন এখনো নাকচ করা হয়নি বলে তিনি বাংলাদেশে অবস্থান করছেন।"

১৯৯১ সনের ৯ই মার্চ ভারপ্রাপ্ত আমীর আব্বাস আলী খানের নেতৃত্বে জামায়াতে ইসলামীর একটি ডেলিগেশন বংগভবনে গিয়ে অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদের সাথে সাক্ষাত করে। সাক্ষাতের এক পর্যায়ে জনাব আব্বাস আলী খান বলেন, "আমি জামায়াতে ইসলামীর ভারপ্রাপ্ত আমীর। নির্বাচিত আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম। তিনি জন্মসূত্রে এই দেশের নাগরিক। অন্যায়ভাবে তাঁর নাগরিকত্ব হরণ করা হয়েছে। তাঁর নাগরিকত্ব অধিকার বহাল করার জন্য ১৫ বছর ধরে দাবি জানানো হচ্ছে। আমরা আশা করি আপনি তাঁর নাগরিকত্ব বহাল করে ঐ অন্যায়ের প্রতিকার করবেন।"

বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদ বলেন, "আমি তাঁর ফাইলটা ভালো করে দেখেছি। আমার বুঝেই আসে না যে তাঁর নাগরিকত্ব এতোদিন পর্যন্ত কেন বহাল হলো না। আমি ওয়াদা করছি, সরকার গঠন করে জাতীয় সংসদ চালু করার আসল দায়িত্ব পালন করার পর আমি এই কাজ অবশ্যই করবো। আমি কখনো ওয়াদা খেলাফ করি না। এই বিষয়ে আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন।"

১৯৯১ সনের অকটোবর মাসে বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদ নব নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট আবদুর রহমান বিশ্বাসের নিকট প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা ও দায়িত্ব হস্তান্তর করে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির পদে ফিরে যান।

১৯৯৫ সনের ১লা ফেব্রুয়ারি বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদ সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন। ঐ বছরের কোন এক সময়

www.pathagar.com

বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদ ড. জি. ডব্লিও. চৌধুরীকে বলেন, "আমি জীবনে ওয়াদা ভংগ করিনি। একটি মাত্র ওয়াদা আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ভংগ হয়ে গেলো বলে আমি বিবেকের দংশন বোধ করছি।..... জাতীয় সংসদে সংবিধান সংশোধনী পাস হয়ে যাওয়ার পর উপযুক্ত সময় মনে করে আমি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে ফাইলটি তলব করি। বারবার তাকিদ দিয়েও যখন ফাইলটি পেলাম না, তখন আমি কৈফিয়ত তলব করি। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানালো, 'ফাইলটি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।"

১৯৭৮ সনে দেশে ফেরার পর থেকে অধ্যাপক গোলাম আযম বারবার আমীরে জামায়াত নির্বাচিত হয়ে আসছিলেন। তাঁর নাগরিকত্ব ছিলো না বিধায় রাজনৈতিক অংগনে ভূমিকা পালন করতেন ভারপ্রাপ্ত আমীর জনাব আব্বাস আলী খান।

এইভাবে ঘনিয়ে আসে ১৯৯২-৯৪ কার্যকালের জন্য আমীরে জামায়াতের নির্বাচন অনুষ্ঠানের সময়। এই নির্বাচনে অধ্যাপক গোলাম আযম আমীরে জামায়াত নির্বাচিত হলে তাঁর নাম প্রকাশ্যে ঘোষণা করা হবে কিনা বিষয়টি কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ ও শেষে কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরায় আলোচিত হয়। আলোচনান্তে সিদ্ধান্ত হয় যে এবার প্রকাশ্যে নাম ঘোষণা করা হবে।

১৯৯২-৯৪ কার্যকালের জন্য অধ্যাপক গোলাম আযম আমীরে জামায়াত নির্বাচিত হয়েছেন খবরটি পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথেই ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও সমাজবাদে বিশ্বাসী গোষ্ঠী হৈ চৈ শুরু করে দেয়। তারা বলে, জামায়াতে ইসলামী একজন বিদেশীকে আমীর বানিয়ে সংবিধান লংঘন করেছে। অতএব দলটিকে বেআইনী ঘোষণা করতে হবে এবং অধ্যাপক গোলাম আযমকে দেশ থেকে বের করে দিতে হবে।

১৯৯২ সনের মার্চ মাসের মাঝামাঝি তারা 'গণআদালত' গঠনের ঘোষণা দেয়।

অধ্যাপক গোলাম আযমের বিরুদ্ধে কোন মামলা দায়ের হয়নি। তিনি কোন অপরাধের সাথে জড়িত ছিলেন না। দেশের আদালতে গিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ প্রমাণ করা যাবে না। সেই জন্য তারা আদালতের শরণাপন্ন না হয়ে তথাকথিত গণআদালত গঠনের উদ্যোগ নেয়।

www.pathagar.com

জাহানারা ইমামকে এই আদালতের চেয়ারম্যান বানানো হয়। সদস্য ছিলেন এড. গাজিউল হক, ড. আহমদ শরীফ, স্থপতি মাযহারুল ইসলাম, ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ, ফয়েজ আহমদ, প্রফেসর কবীর চৌধুরী, কলিম শরাফী, মাও. আবদুল আউয়াল, লে. কে. (অব.) কাজী নূরুজ্জামান, লে. ক. (অব.) আবু ওসমান চৌধুরী ও ব্যারিস্টার শওকত আলী খান।

১৯৯২ সনের ২৬শে মার্চ সোহরাউয়ার্দী উদ্যানে গণআদালত বিচার কার্য পরিচালনা করবে বলে ঘোষণা করা হয়।

দেশে একটি প্রতিষ্ঠিত সরকারের বর্তমানে এই ধরনের গণআদালতের ঘোষণা ছিলো অবৈধ ও বেআইনী। বিস্ময়ের ব্যাপার, এই আদালতের আয়োজকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিয়ে সরকার ১৯৯২ সনের ২৪শে মার্চ রাত ৩টার সময় অধ্যাপক গোলাম আযমের নিকট একটি শো-কজ নোটিশ হস্তান্তর করে।

এতে বলা হয়, যেহেতু ১৮-৪-৭৩ তারিখের বিজ্ঞপ্তি দ্বারা আপনাকে বাংলাদেশের নাগরিক থাকার অযোগ্য ঘোষণা করা হয়েছিলো, যেহেতু আপনি নিবন্ধনকৃত বিদেশী এবং যেহেতু আপনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৮ অনুচ্ছেদের পরিপন্থী কাজ করে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ-এর আমীর হয়েছেন, অতএব আপনাকে ২৪শে মার্চ বেলা ১০টার মধ্যে কারণ দর্শানোর জন্য নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, কেন আপনাকে বাংলাদেশ থেকে বহিষ্কার করা হবে না এবং আইনগত অন্যান্য ব্যবস্থা নেওয়া হবে না।

নোটিশ প্রাপ্তির পর তাড়াহুড়ো করে জওয়াব তৈরি করতে হয়। জামায়াতে ইসলামীর সংসদীয় দলের উপনেতা মাওলানা আবদুস সুবহান স্বরাষ্ট্র সচিবের নিকট সকাল ১০টাতেই উক্ত জওয়াব পৌঁছিয়ে দেন।

২৪শে মার্চ খবর ছড়িয়ে পড়ে যে অধ্যাপক গোলাম আযমকে গ্রেফতার করা হচ্ছে। জামায়াতে ইসলামীর হাজার হাজার কর্মী ও সাধারণ মানুষ মগবাজার কাজী অফিস লেনে জমায়েত হয়। তাদের মুখে উচ্চারিত হতে থাকে গগণবিদারী শ্লোগান।

www.pathagar.com

রাত ১১টায় অধ্যাপক গোলাম আযম তাঁর অফিস কক্ষে জামায়াতে ইসলামীর নেতৃবৃন্দ ও পুলিশ কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে কিছু কথা বলেন। অতপর তিনি কেন্দ্রীয় কারাগারে যাওয়ার জন্য বাইরে আসেন। তাঁকে দেখে সমবেত জনতার মাঝে কান্নার রোল পড়ে যায়।

তিনি সমবেত জনমন্ডলীর উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন।

বক্তব্যে তিনি বলেন,

> 'আপনারা মনে রাখবেন, ভাবপ্রবণ হয়ে জোশের চোটে যদি হুঁশ হারিয়ে ফেলেন, তাহলে কোন কল্যাণ হবে না। অন্যরা যতো যুলম-অত্যাচারই করুক না কেন, আপনারা প্রতিশোধ নেবেন না। প্রতিশোধ নেওয়া আমাদের রাসূলের তরীকা নয়। কেউ সন্ত্রাস করলেও আমরা সন্ত্রাস করবো না এবং সন্ত্রাস না করেই তাদেরকে পরাজিত করবো। সন্ত্রাসের মুকাবিলা সন্ত্রাস দিয়ে হবে না। সন্ত্রাসের মুকাবিলা ধৈর্য দিয়েই করতে হবে।'[৫৯]

অতপর তিনি পুলিশের একটি গাড়িতে ওঠেন। আরো একটি জিপ ও ৩টি লরি ভর্তি পুলিশ তাঁকে পাহারা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলো। তিনি রাত পৌনে বারোটায় গাড়িতে ওঠেন। ভিড় ঠেলে কাজী অফিস লেন পার হতে সময় লাগে ২০ মিনিট।

২৫শে মার্চ একটি সরকারি প্রেসনোটে বলা হয় অধ্যাপক গোলাম আযমকে কারণ দর্শানোর একটি নোটিশ দেওয়া হয়। তিনি যথাসময়ে উক্ত নোটিশের জওয়াব প্রদান করেন। তবে তাঁর জওয়াব সরকারের নিকট গ্রহণযোগ্য হয়নি। এমতাবস্থায় সরকার 'ফরেনার্স এ্যাকট'-এর আওতায় অধ্যাপক গোলাম আযমকে আটকের আদেশ প্রদান করেছে।

১৯৯২ সনের ২৫শে মার্চ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ভারপ্রাপ্ত আমীর আব্বাস আলী খান বলেন, 'অধ্যাপক গোলাম আযম জন্মগতভাবে বাংলাদেশী নাগরিক এবং তাঁর পূর্বপুরুষগণও বাংলাদেশের ভূ-সীমার মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছেন।' 'অধ্যাপক গোলাম আযম যেহেতু কখনো তাঁর নাগরিকত্ব পরিত্যাগ করেননি, সেহেতু জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ-এর আমীর হওয়ার সম্পূর্ণ অধিকার তাঁর রয়েছে। এটা বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৮ নাম্বার অনুচ্ছেদের পরিপন্থী নয়।'

---

৫৯. অধ্যাপক গোলাম আযম, জীবনে যা দেখলাম, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৭২।

www.pathagar.com

'অধ্যাপক গোলাম আযম বিগত ১৪ বছর ধরে বাংলাদেশে নিজ বাসভবনে বসবাস করে আসছেন। এতে করে সরকার ল অব ইকুইসেন্স মুতাবিক স্বীকার করে নিয়েছে যে অধ্যাপক গোলাম আযম বাংলাদেশের নাগরিক। এটা সরকার এখন আইনত অস্বীকার করতে পারে না।'

এই সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সেক্রেটারী জেনারেল মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক ইউসুফ আলী, জনাব আলী আহসান মুহাম্মাদ মুজাহিদ, জনাব মুহাম্মাদ কামারুজ্জামান, মাওলানা আবদুস সুবহান, আবদুল কাদের মোল্লা এবং এডভোকেট শেখ আনসার আলী।

১৯৯২ সনের ২৬শে মার্চ অবৈধ ও বেআইনী গণআদালত অধ্যাপক গোলাম আযমের বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধকালে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী কর্তৃক গণহত্যা, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ, জনপদ ধ্বংস, নারী ধর্ষণ প্রভৃতি অপরাধজনক কাজে মদদকারী এবং স্বয়ং শান্তিকমিটি, আলবদর, আল-শামস বাহিনী গঠন করে এবং হানাদার পাকিস্তানী বাহিনীকে রাজাকার বাহিনী গঠনে প্রত্যক্ষ সহযোগিতা করে গণহত্যা, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ, জনপদ ধ্বংস, নারী ধর্ষণের ন্যায় জঘন্য অপরাধ সংঘটনের নির্দেশ প্রদান, প্ররোচিতকরণ, বুদ্ধিজীবী হত্যার নীল নকশা প্রণয়ন করে নিজস্ব বাহিনী আলবদর, আল-শামসকে দিয়ে তাদের হত্যা করানো এবং মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তীকালে 'পূর্ব পাকিস্তান পুনরুদ্ধার কমিটি' গঠন করে বিদেশী শত্রুর চর হিসেবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে অপরাধ সংঘটনের বানোয়াট অভিযোগ গঠন করে।

সাক্ষী ছিলেন ড. আনিসুজ্জামান (অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ড. বোরহানুদ্দীন খান জাহাঙ্গীর, (অধ্যাপক, রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়), ড. মেঘনাদ গুহ ঠাকুরতা (শিক্ষক, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়), সৈয়দ শামসুল হক (কবি, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার), শাহরিয়ার কবীর (সাহিত্যিক, সাংবাদিক), মুশতারী শফী (লেখিকা), সাইদুর রহমান, অমিতাভ কায়সার, হামিদা বানু,

www.pathagar.com

আলী যাকের, ড. মুশতাক হোসেন, মাওলানা ইয়াহইয়া মাহমুদ এবং আরো তিন জন।

তথাকথিত গণআদালত অধ্যাপক গোলাম আযমকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করে এবং এক মাসের মধ্যে তাঁর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানায়।

১৯৯২ সনর ৩১শে মার্চ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার জরুরী অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। অধিবেশনে গৃহীত একটি প্রস্তাবে আমীরে জামায়াত অধ্যাপক গোলাম আযমের গ্রেফতারির নিন্দা করা হয় এবং তাঁর আশু মুক্তি দাবি করা হয়। অপর প্রস্তাবে তথাকথিত গণআদালতীদের অপতৎপরতার নিন্দা করা হয় এবং তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সরকারের নিকট দাবি জানানো হয়।

সারাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী ও সমাজবাদীদের আয়োজিত সভা সমাবেশের চেয়ে অনেক বড়ো আকারের সভাসমাবেশ এবং মিছিলে অধ্যাপক গোলাম আযমের মুক্তির দাবি উচ্চারিত হতে থাকে। সারাদেশে ব্যাপক হারে পোস্টার লাগানো হয়।

ভারপ্রাপ্ত আমীর আব্বাস আলী খান এবং সেক্রেটারী জেনারেল মতিউর রহমান নিজামী বিভিন্ন সভা সমাবেশে জোরালো বক্তব্য রাখতে থাকেন।

১৯৯২ সনের এপ্রিল মাসেই অধ্যাপক গোলাম আযমের পক্ষে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশনে দুইটি মামলা করা হয়।

বিচারপতি আবদুল জলিল ও বিচারপতি রুহুল আমীনের বেঞ্চে অধ্যাপক গোলাম আযমের গ্রেফতারিকে অবৈধ দাবি করে মামলা দায়ের করা হয়।

বিচারপতি ইসমাঈলুদ্দীন সরকার ও বিচারপতি বদরুল ইসলাম চৌধুরীর সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চে অধ্যাপক গোলাম আযমকে বাংলাদেশের নাগরিকত্বের অযোগ্য ঘোষণা করে সরকার যেই সিদ্ধান্ত নিয়েছে তা সম্পূর্ণরূপে বেআইনী বলে দাবি করা হয়।

জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে মামলা দুইটির তত্বাবধানের দায়িত্ব সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল আলী আহসান মুহাম্মাদ মুজাহিদের ওপর

www.pathagar.com

অর্পণ করা হয়। আর মামলা পরিচালনার দায়িত্ব অর্পিত হয় ব্যারিস্টার এ.আর. ইউসুফ ও ব্যারিস্টার আবদুর রাজ্জাকের ওপর।

১৯৯২ সনের ১২ই অগাস্ট হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ নাগরিকত্ব মামলার রায় ঘোষণা করে। বিচারপতি ইসমাঈলুদ্দীন সরকার নাগরিকত্ব বাতিলের পক্ষে রায় দেন। অপর দিকে বিচারপতি বদরুল ইসলাম চৌধুরী বাতিলের আদেশটিকে অবৈধ বলে রায় দেন।

বিভক্ত রায় হওয়ায় মামলাটি তৃতীয় বিচারপতি আনোয়ারুল হক চৌধুরীর বেঞ্চে প্রেরিত হয়।

১৯৯৩ সনের ২২শে এপ্রিল বিচারপতি আনোয়ারুল হক চৌধুরী অধ্যাপক গোলাম আযমের পক্ষে রায় দেন। দুঃখের বিষয়, সরকার এই রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে আবেদন পেশ করে।

১৯৯৩ সনের ১৩ই জুলাই হাইকোর্ট ডিভিশন বেঞ্চ অধ্যাপক গোলাম আযমকে গ্রেফতার করা অবৈধ বলে যেই মামলা করা হয়, সেই মামলার রায় ঘোষণা করে। রায়ে তাঁকে আটক রাখা বেআইনী বলে ঘোষণা করা হয়।

১৯৯৩ সনের ১৫ই জুলাই সকাল ১১টায় অধ্যাপক গোলাম আযম কেন্দ্রীয় কারাগারের গেটে এলে জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্র শিবিরের নেতা ও কর্মীগণ বুলন্দ কণ্ঠে শ্লোগান দিতে থাকে। তাঁর গাড়ি অনুসরণ করে বিশাল মিছিল মগবাজারের দিকে এগিয়ে চলে। একটা ছোট মঞ্চ তৈরি করা হয়। এতে ওঠে অধ্যাপক গোলাম আযম সমবেত জনগণের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন। অধ্যাপক গোলাম আযম এবার ষোল মাস পর জেল থেকে মুক্তি লাভ করেন।

১৯৯৪ সনের ৪ঠা মে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিকত্ব মামলার শুনানি শুরু হয়। এটর্নি জেনারেল ৪ঠা মে থেকে শুরু করে ১৬ই মে-এর মধ্যে মোট সাত দিন তাঁর বক্তব্য পেশ করেন। অধ্যাপক গোলাম আযমের পক্ষে বক্তব্য রাখেন ব্যারিস্টার এ.আর.ইউসুফ।

১৯৯৪ সনের ২২শে জুন রায় ঘোষণার তারিখ নির্ধারিত হয়। বহুসংখ্যক ব্যারিস্টার, এডভোকেট এবং নেতা-কর্মী আদালতকক্ষ ও চত্বরে ভিড়

www.pathagar.com

জমিয়েছিলেন। বিচারপতি মুহাম্মাদ হাবিবুর রহমান (প্রিজাইডিং জজ), বিচারপতি এ.টি.এম. আফজল, বিচারপতি মুসতাফা কামাল এবং বিচারপতি লতিফুর রহমান সর্বসম্মতভাবে অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিকত্ব বাতিলের নির্দেশটিকে অবৈধ বলে রায় দেন।

১৯৯৪ সনের ২৩শে জুন জামায়াতে ইসলামী ঢাকা মহানগরী শাখা বাইতুল মুকাররমের উত্তর গেটে 'শুকরিয়া সমাবেশে'র আয়োজন করে।

দীর্ঘ ২৩ বছর পর জনসভায় দাঁড়িয়ে অধ্যাপক গোলাম আযম এক দীর্ঘ ও জ্ঞানগর্ভ ভাষণ পেশ করেন।

ভাষণে তিনি বলেন,

"বাংলাদেশ আমার দেশ। এ দেশেই আমার জন্ম। জন্ম আমার এ দেশের রাজধানী ঢাকাতেই। জন্মগত নাগরিকত্ব আল্লাহর দান। কে কোথায় জন্ম নেবে তার ফায়সালা তিনিই করেন। জন্মসূত্রের নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়ার অধিকার কারো নেই, তবু কেড়ে নেওয়া হয়েছিলো। আজ আমার কোন দুঃখ নেই। আল্লাহ তা'আলা সম্মানের সঙ্গে দেশের সর্বোচ্চ আদালতের মাধ্যমে আমার নাগরিকত্ব ফিরিয়ে দিয়েছেন। আলহামদুলিল্লাহ।"

"আমার কোন ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই। আমি নিজে দেশের বড় কিছু হবো, দেশের কোন কর্তা হবো এ ধরনের কোন কামনা আমার নেই। কিন্তু একটি কামনাই আমাকে অস্থির করে তোলে। দুনিয়া থেকে যখন বিদায় নেবো, আমার দেশের ১২ কোটি মানুষকে কী অবস্থায় রেখে যাবো। তাদেরকে সুখী ও নিরাপত্তাবোধ নিয়ে বেঁচে থাকার মতো অবস্থায় রেখে যেতে পারব কিনা– এটা আমার বড়ো চিন্তা।"

"জাতীয় ঐক্য ছাড়া দেশ গড়া যাবে না। এ কথাটা চিন্তা করা সহজ, কাজটা সবচে' কঠিন। কিভাবে আমাদের দেশের মানুষ এ দুর্নাম থেকে মুক্তি পাবে যে, এটা গরিব এবং ভিক্ষুকের দেশ। সারা দুনিয়ায় এ বদনামের বোঝা আমরা বয়ে বেড়াচ্ছি। এদেশের মানুষের উন্নতি হোক এবং দুর্নাম ঘুচুক এটাই আমাদের সবচে' বড় সাধনা, সবচে' বড় কামনা। এ বিরাট কাজটা এমনি এমনি হবে না। কোন একটি দলের পক্ষেও সম্ভব হবে না। কোন দলীয় সরকারও একাকী পারবে না। দেশে অনেক সমস্যা। তাই আমি আরো মনে করি, এ বিরাট কাজ করা তখনই সম্ভব হবে, যখন আমরা রাজনৈতিক ভেদাভেদ, হিংসা-বিদ্বেষ, সন্ত্রাসী রাজনীতি এবং উত্তেজনাপূর্ণ রাজনীতি ইত্যাদি ক্ষান্ত করে সবাই সুস্থ রাজনীতি করতে রাজি হব। আমি মনে করি, দেশ গড়ার চিন্তা-ভাবনা যাদের আছে, তারাই রাজনীতি করেন। আর রাজনৈতিক ময়দানে যারা নেতৃত্ব দিচ্ছেন, তাদের চেষ্টা সাধনার ওপরই

www.pathagar.com

জনগণের ঐক্য নির্ভর করে। জনগণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে কোন নেতৃত্ব সফল হবে না। জনগণের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টি করেই সত্যিকারভাবে দেশের কল্যাণ করা সম্ভব। এ ঐক্যের জন্য আসুন, আমরা সকলে চেষ্টা করি।"[৬০]

লালদিঘি ময়দানে জামায়াতে ইসলামীর জনসভা

১৯৯৪ সনের ২৬শে জুলাই চট্টগ্রামের লালদিঘি ময়দানে জামায়াতে ইসলামীর জনসভার দিন ধার্য হয়।

স্থির হয় প্রধান বক্তা থাকবেন আমীরে জামায়াত অধ্যাপক গোলাম আযম। লালদিঘি ময়দান সরকারি মুসলিম হাইস্কুলের খেলার মাঠ। জামায়াতে ইসলামী কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে জনসভা অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি নিতে থাকে।

ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি নামক ইসলামবিদ্বেষী সংস্থাটি ঢাকার জনসভার সময় নিরব ছিলো। কিন্তু চট্টগ্রামের জনসভা ঘোষিত হলে ঐ সংস্থাটি জনসভা হতে দেবে না বলে ঘোষণা দেয়। উক্ত সংস্থার কর্মীরা দেয়ালে সাঁটানো জামায়াতে ইসলামীর বহুসংখ্যক পোস্টার ছিঁড়ে ফেলে। বেশ কিছু স্পটে মাইক পাবলিসিটিতে বাধা দেয়। সারা শহরে তারা আতংক ছড়িয়ে দেয় যাতে ভয়ে জনগণ সেই জনসভায় উপস্থিত না হয়।

পুলিশ কমিশনার চট্টগ্রাম জামায়াতে ইসলামীর নেতৃবৃন্দকে জনসভা বাতিল করার অনুরোধ জানাতে থাকেন। নেতৃবৃন্দ পুলিশ কমিশনারকে বলেন, "আমরা কোন বেআইনি কাজ করছি না। জনসভা করা আমাদের বৈধ অধিকার। এই অধিকার সংরক্ষণ ও নিশ্চিত করার দায়িত্ব আপনার। সন্ত্রাসীরা অবৈধ তৎপরতা চালাচ্ছে। তাদেরকে দমন করার জন্য পুলিশবাহিনী রয়েছে। তাদেরকে দমনের বদলে জামায়াতে ইসলামীকে দমন করার চেষ্টা করছেন কেন? জামায়াতে ইসলামী জনসভা করবে, আইনশৃংখলার দায়িত্বে নিযুক্ত পুলিশবাহিনী সন্ত্রাসীদেরকে দমনের দায়িত্ব পালন করবে, এটাই কাম্য।"

সন্ত্রাসীরা যাতে ময়দান দখল করতে না পারে, সেই জন্য আগের দিন

---

৬০. অধ্যাপক গোলাম আযম, জীবনে যা দেখলাম, সপ্তম খণ্ড, পৃষ্টা-৪২,৪৩,৪৪

www.pathagar.com

দুপুরেই জামায়াতে ইসলামীর দুই হাজার স্বেচ্ছাসেবক ময়দান দখলে নেন। বিকেলে সন্ত্রাসীরা মিছিল করে এসে ঢিল ছুঁড়তে থাকে। স্বেচ্ছাসেবকগণ তাদেরকে তাড়িয়ে দেন।

রাতে স্বেচ্ছাসেবকগণ ময়দানেই অবস্থান করেন। শেষ রাতে তাঁরা ছালাতুত্ তাহাজ্জুদ আদায় করে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের নিকট দু'আ করতে থাকেন।

ইসলামবিদ্বেষীদের তৎপরতা জনগণের মাঝে উৎসুক্য সৃষ্টি করে। যাদের আসার কথা নয় এমন ব্যক্তিরাও পরিস্থিতি প্রত্যক্ষ করার জন্য এগিয়ে আসেন। সভা শুরুর আগেই মাঠ এবং মাঠের তিন দিক লোকে লোকারণ্য হয়ে যায়। বিকেল তিনটায় আল কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে জনসভার কাজ শুরু হয়।

সন্ত্রাসীরা নিউ মার্কেটে সমবেত হয়ে দাম্ভিকতাপূর্ণ বক্তব্য রাখতে থাকে। তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক ছিলো অস্ত্রধারী।

জনসভা মঞ্চের দেড়শত গজ দূরে ছিলো কোতোয়ালী থানা। জনসভা এবং সন্ত্রাসীদের মাঝে পুলিশের দুইটি গ্রুপ দাঁড় করিয়ে রাখা হয়।

এক পর্যায়ে সন্ত্রাসীরা পুলিশের প্রথম গ্রুপের বাধা উপেক্ষা করে জনসভার দিকে অগ্রসর হয়। অতপর তারা পুলিশের দ্বিতীয় গ্রুপকেও অতিক্রম করে সামনে এগুতে থাকে। জামায়াতে ইসলামীর স্বেচ্ছাসেবকগণ পরিস্থিতি সামলাবার জন্য অগ্রসর হন। সন্ত্রাসীরা বেপরোয়া গুলি চালাতে থাকে। তাদের গুলিতে আবুল খায়ের ও জাফর আহমাদ নামক দুইজন নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তি শাহাদাত বরণ করেন। আহত হন কয়েকশত লোক। সন্ত্রাসীদের গুলি উপেক্ষা করে স্বেচ্ছাসেবকগণ জনসভার শৃংখলা নিশ্চিত করেন। শত শত আহত ব্যক্তির আঘাতগুলো সবই ছিলো তাঁদের শরীরের সম্মুখ দিকে, পেছনের দিকে নয়।

অধ্যাপক গোলাম আযম ২৩ বছর পর লালদিঘি ময়দানে বক্তব্য পেশ করেন। চট্টগ্রামের এই সফল জনসভা জামায়াতে ইসলামীর অগ্রগতির পথে একটি মাইলফলক স্থাপন করে।

www.pathagar.com

১৯৯৬ সনের ১৫ই ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচন বর্জন

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল, আওয়ামী লীগ এবং জামায়াতে ইসলামীর যুগপৎ আন্দোলনের ফলেই স্বৈর-শাসক হুসেইন মুহাম্মাদ এরশাদের পতন ঘটে। প্রতিষ্ঠিত হয় বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদের পরিচালনাধীন কেয়ারটেকার সরকার। এই কেয়ারটেকার সরকার একটি সুষ্ঠু নির্বাচন জাতিকে উপহার দিতে সক্ষম হয়। জামায়াতে ইসলামীর ১৮ জন সংসদ সদস্যের সমর্থন নিয়ে বাংলাদেশ জাতায়তাবাদী দল সরকার গঠন করে।

নব গঠিত সরকারের উচিত ছিলো অবিলম্বে সংবিধানে কেয়ারটেকার সরকার পদ্ধতি সংযোজিত করে নেওয়া। রহস্যজনক কারণে সরকার কেয়ারটেকার পদ্ধতি সংবিধানে সংযোজন করার ব্যাপারে অনীহা প্রদর্শন করতে থাকে। জামায়াতে ইসলামী, আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টি সংসদে উত্থাপনের জন্য কেয়ারটেকার সরকার পদ্ধতি বিল জমা দেয়। কিন্তু সরকারী দলের সিদ্ধান্ত ছাড়া এই বিষয়ে আলোচনা শুরু হতে পারছিলো না। সরকারের অপ্রত্যাশিত মনোভংগি ও ভূমিকার কারণে রাজনৈতিক অংগন আবার উত্তপ্ত হয়ে উঠে। ফলে আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি ও জামায়াতে ইসলামী কেয়ারটেকার সরকার পদ্ধতি সংবিধানে সংযোজনের দাবিতে যুগপৎ আন্দোলন শুরু করতে বাধ্য হয়। জামায়াতে ইসলামী সরকার গঠনে যেই বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলকে সহযোগিতা করলো, সেই দলের সরকারের বিরুদ্ধেই আন্দোলনে নামতে বাধ্য হলো।

এক পর্যায়ে আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। সরকারের পক্ষে মেয়াদ পূর্ণ করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। এই পরিস্থিতিতেই সরকার ১৯৯৬ সনের ১৫ই ফেব্রুয়ারী ষষ্ঠ জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত করে। আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি ও জামায়াতে ইসলামী এই নির্বাচন বর্জন করে।

এই অস্বাভাবিক নির্বাচনের পর বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল সরকার গঠন করে। এই সরকার দুই সপ্তাহের মধ্যে সংবিধানে কেয়ারটেকার পদ্ধতি সংযোজন করে পদত্যাগ করে।

www.pathagar.com

১৯৯৬ সনের ১২ই জুন অনুষ্ঠিত সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ

১৯৯৬ সনের ১২ই জুন অনুষ্ঠিত হয় সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন।

সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময় রাষ্ট্রপতি ছিলেন বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদ। কেয়ারটেকার সরকার প্রধান ছিলেন বিচারপতি মুহাম্মাদ হাবিবুর রহমান।

এই কেয়ারটেকার সরকারে অপরাপর উপদেষ্টা ছিলেন সৈয়দ ইশতিয়াক আহমেদ, ড. মুহাম্মাদ ইউনুস, ড. ওয়াহিদউদ্দীন মাহমুদ, অধ্যাপক শামসুল হক, অধ্যাপক জামিলুর রহমান চৌধুরী, শেগুফতা বখত চৌধুরী, এ.জেড.এম. নাছির উদ্দীন, সৈয়দ মঞ্জুর এলাহী, ড. নাজমা চৌধুরী ও মেজর জেনারেল (অব) আবদুর রহমান খান।

নির্বাচনের পূর্বে আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা মাক্কায় গিয়ে উমরা পালন করেন। দেশে ফিরে ইহরামের পট্টিবাঁধা অবস্থায় তাসবীহমালা হাতে নিয়ে তিনি নির্বাচনী অভিযানে নামেন। গোটা নির্বাচনী অভিযানে তিনি দুই হাত জোড় করে জনগণের নিকট দলের অতীত ভুলের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং দলটিকে আরেকবার ক্ষমতাসীন করার জন্য বিনীতভাবে ভোটারদের প্রতি আবেদন জানান।

এই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ১৪৬টি আসন, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল ১১৬টি আসন, জাতীয় পার্টি (এরশাদ) ৩২টি আসন এবং জামায়াতে ইসলামী ৩টি আসন লাভ করে।

জামায়াতে ইসলামী থেকে জাতীয় সংসদে নির্বাচিত তিনজন সদস্য হচ্ছেন মাওলানা দেলাওয়ার হোসেন সাঈদী (পিরোজপুর), কাজী শামসুর রহমান (সাতক্ষিরা) এবং মিজানুর রহমান চৌধুরী (নিলফামারী)

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে জামায়াতে ইসলামীর এটি চতুর্থ উপস্থিতি।

জাতীয় পার্টির (এরশাদ) সমর্থন নিয়ে আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা সরকার গঠন করেন।

www.pathagar.com

১৯৯৬ সনের ২২শে জুলাই জাতীয় সংসদ বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করে।

ক্ষমতাসীন হয়ে শেখ হাসিনার জনগণ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত 'ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ'-ই তাঁর দলের আদর্শ বলে ঘোষণা করেন। মাদরাসা শিক্ষাকে সংকুচিত করে ফেলার প্রয়াস চালান। তাঁর দল মাদরাসাগুলোকে 'মৌলবাদীদে'র আখড়া বলে প্রচারণা চালাতে থাকে। কোথাও কোন বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটলে এটি মৌলবাদীদের কাজ বলে প্রচারণা চলতে থাকে। আর 'মৌলবাদী' বলতে তাঁরা ইসলামপন্থীদেরকে বুঝাতেন। বড়ো বড়ো কয়েকজন আলিমকে গ্রেফতার করে আলিম সমাজের মাঝে ত্রাস সৃষ্টি করা হয়। গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা, প্রতিষ্ঠান, সংস্থার নামের পূর্বে "বঙ্গবন্ধু" যোগ করা হয়। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, পেশাজীবী সংগঠন, হাটবাজার, সরকারি খাস জমি ইত্যাদি দলীয় লোকদের নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। মন্ত্রীসভা প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন হিসেবে ব্যবহৃত 'গণভবন'টিকে শেখ হাসিনার স্থায়ী বাসভবন হিসেবে বরাদ্দ দেয়। শেখ হাসিনা ঘোষণা করেন যতোদিন তিনি রাজনীতি করবেন, ততোদিন গণভবনেই থাকবেন। জাতীয় ঐক্য গড়ার বিপরীত তিনি জাতীয় বিভেদ সৃষ্টির নীতি গ্রহণ করেন। 'স্বাধীনতার পক্ষ' এবং 'স্বাধীনতার বিপক্ষ' শক্তির ধুয়া তুলে তিনি ইসলামী শক্তিকে ঘায়েল করার অপপ্রয়াস চালাতে থাকেন। তাঁর সময়ে বিরোধী দলের ডাকা হরতাল বানচাল করার লক্ষ্যে সরকারী দলের পক্ষ থেকে জংগি মিছিল বের করার সংস্কৃতি চালু হয়। বিচার বিভাগের স্বাধীনতার জন্য শাসন বিভাগের সহযোগিতা প্রয়োজন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সর্বোচ্চ আদালতের প্রতি কটাক্ষ করে বারবার বক্তব্য রেখেছেন। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি অত্যন্ত শালীন ভাষায় তাঁকে সতর্ক করা সত্ত্বেও তিনি সংশোধিত হননি।

ইসলামের প্রতি বিদ্বেষের কারণে শেখ হাসিনার শাসনামলে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন বাংলাদেশে এলে তথ্য মন্ত্রণালয় থেকে 'মৌলবাদীদের উত্থান' বিষয়ক পুস্তিকায় একটি ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরা হয়। তবে মি. ক্লিনটন এর দ্বারা বিভ্রান্ত হননি।

www.pathagar.com

গ্যারান্টি ক্লজবিহীন ফারাক্কা চুক্তির প্রতিবাদ

ফারাক্কা ভারতের অংগরাজ্য পশ্চিম বংগের মুর্শিদাবাদ জিলার রাজমহল ও ভগবানগোলার মাঝে অবস্থিত একটি স্থান। এটি বাংলাদেশের চাপাইনওয়াবগঞ্জ জিলার পশ্চিম সীমানা থেকে ১৮ কিলোমিটার (১১ মাইল) দূরে অবস্থিত। কলকাতা বন্দরের নাব্যতা বৃদ্ধির প্রয়োজনের কথা বলে ভারত সরকার ১৯৬১ সনে ফারাক্কা নামক স্থানে গংগা নদীতে একটি বাঁধ নির্মাণ শুরু করে। এই বাঁধের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয় ১৯৭৪ সনের ডিসেম্বর মাসে।

শেখ মুজিবুর রহমানের সম্মতি নিয়ে ভারত সরকার ৪০ দিনের জন্য পরীক্ষামূলকভাবে বাঁধের সবগুলো গেট খুলে দেয় ১৯৭৫ সনের ২১শে এপ্রিল। কিন্তু প্রতিশ্রুত মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ার পরও গেটগুলো আর কখনো বন্ধ হয়নি।

রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের শাসনামলে গংগার পানির ন্যায্য শেয়ার প্রাপ্তির লক্ষ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরের প্রয়াস চালানো হয়।

রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান জাতিসংঘের ৩১তম অধিবেশনে গংগার পানি বণ্টন ইস্যুটি উত্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। কিন্তু কয়েকটি বন্ধু রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের ফলে ইস্যুটি শেষ পর্যন্ত জাতিসংঘে উত্থাপিত হয়নি।

রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের শাসনামলে ১৯৭৭ সনের ৫ই নবেম্বর গংগার পানি বণ্টন বিষয়ে ভারতের সংগে একটি চুক্তি হয়। ১৯৮৮ সনে চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যায়। কোন চুক্তি ব্যতিরেকেই ভারত ১৯৮৮ সন থেকে ১৯৯৬ সন পর্যন্ত একতরফা পানি প্রত্যাহার করতে থাকে।

১৯৯৬ সনের ১২ই ডিসেম্বর শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকার গংগার পানি বণ্টন বিষয়ে ভারতের সাথে ফারাক্কা চুক্তি নামে একটি চুক্তি সম্পাদন করে।

১৯৭৭ সনের ৫ই নবেম্বর সম্পাদিত ৫ বছর মেয়াদি চুক্তিতে শুকনো

www.pathagar.com

মওসুমে বাংলাদেশ গংগা নদীর ৮০ ভাগ পানি পাওয়ার গ্যারান্টি ক্লজ ও বিরোধ নিরসনে সালিশী ক্লজ সংযোজিত ছিলো। কিন্তু ১৯৯৬ সনের ১২ই ডিসেম্বর স্বাক্ষরিত চুক্তিতে বন্যা ও খরা দেখা দিলে পানি প্রবাহের হার কত হবে তা স্পষ্ট করে উল্লেখ নেই।

একজন নদী বিশেষজ্ঞ বলেন,

> "বাংলাদেশ ভাটির দেশ হিসেবে ভারতের সাথে অভিন্ন নদীসমূহের পানিতে ন্যায়পরায়ণতা ও যৌক্তিকতার নীতি অনুসারে শুষ্ক মৌসুমে চাহিদার নিম্নতম পরিমাণ পানি পাওয়ার অধিকার রাখে। ফলে ফারাক্কা চুক্তিতে গ্যারান্টি ক্লজ না থাকা ভারতকে অসম সুবিধা প্রদান করেছে।
>
> অপরপক্ষে দু'দেশের চুক্তির বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্য নিরপেক্ষ সালিশীর সুবিধা রাখা অপরিহার্য ছিলো। ফারাক্কা চুক্তিতে এই সালিশীর সুবিধা না থাকায় ভারতের কোন অন্যায় আচরণ বা চুক্তির শর্তভংগের কারণে কোথাও নালিশ করার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে বাংলাদেশ।"[৬১]

ফারাক্কা বাঁধের মাধ্যমে গঙ্গা নদীর পানি প্রত্যাহার ও গতিপথ পরিবর্তনের জন্য যে-সব সমস্যার উদ্ভব হয়েছে সংক্ষেপে সেগুলো হলো :

১. গত ৩৪ বছর যাবৎ ফারাক্কা ব্যারেজের মাধ্যমে অবিরত পানি প্রত্যাহারের ফলে পদ্মা নদী বেসিনে অনেকগুলো নদী মরে গেছে। মরা নদীসমূহের মধ্যে গড়াই (কুষ্টিয়া), নরসুন্দা (কিশোরগঞ্জ), ভুবনেশ্বর (রাজবাড়ী, ফরিদপুর), বিবিয়ানা ও শাখাবরাক (হবিগঞ্জ), পালাং (শরীয়তপুর), বুড়ীনদী (কুমিল্লা), হরিহর ও মুক্তেশ্বরী (যশোর), হামকুড়া (খুলনা), মুড়িচাপ (সাতক্ষীরা), বামনী (লক্ষ্মীপুর-নোয়াখালী), মানস (বগুড়া), বড়াল ও চিকনাই (নাটোর-পাবনা), হিশা (কুষ্টিয়া), মুসাখান (রাজবাড়ী ও নাটোর), ভৈরব (কুষ্টিয়া-মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গা-ঝিনাইদহ-যশোর-খুলনা-বাগেরহাট) অন্যতম। যে-সব নদী মরার উপক্রম হয়েছে বা কয়েক বছরের মধ্যেই মরে যাবে সেগুলোর মধ্যে করতোয়া (পঞ্চগড়-নীলফামারী-রংপুর-বগুড়া-সিরাজগঞ্জ), ইছামতি (পাবনা-মানিকগঞ্জ-ঢাকা-মুন্সিগঞ্জ), কালীগঙ্গা (কুষ্টিয়া-ঝিনাইদহ-মাগুরা-নড়াইল-পিরোজপুর), কুমার (কুষ্টিয়া-মাগুরা-ফরিদপুর-ঝিনাইদহ-মাদারীপুর), চিত্রা (নড়াইল-চুয়াডাঙ্গা-ঝিনাইদহ), ভাদ্রা

---

৬১. শেখ ফজলে এলাহী, আন্তর্জাতিক নদী আইন ও বাংলাদেশ-ভারত পানিবিরোধ, পৃষ্ঠা-৬৯।

www.pathagar.com

(যশোর-খুলনা), সোমেশ্বরী (নেত্রকোনা) এবং নবগঙ্গা (নড়াইল) অন্যতম।

২. শুষ্ক মৌসুমে বাংলাদেশের বৃহত্তর সেচপ্রকল্প গঙ্গা-কপোতাক্ষ প্রকল্পের ৩ লাখ একর জমিতে সেচের জন্য পানির দুস্প্রাপ্যতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। তিস্তা নদীর বাঁধের নিকটে শুষ্ক মৌসুমে এখন জেগে উঠেছে বিস্তৃত বালুচর এবং বর্ষায় দেখা দিচ্ছে মারাত্মক প্লাবন ও বন্যা। ফলে যে জায়গায় এক সময় ছিল সবুজ ধানের সমারোহ, সেখানে দেখা দিয়েছে মরুকরণের আলামত।

৩. যখন গঙ্গা বেসিনের উজানে প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটে এবং হিমালয়ের বরফ গলতে থাকে তখন ফারাক্কা ব্যারেজে পানির প্রবল চাপ সৃষ্টি হয়। পানির চাপ এড়ানোর জন্য তখন প্রকল্পের সবকটি (১০১টি) স্লুইস গেট খুলে দেওয়া হয়। ফলে বাংলাদেশে দেখা দেয় অকাল বন্যা।

৪. ফারাক্কা ব্যারেজের প্রভাবে দিন দিন নিচে নেমে যাচ্ছে বাংলাদেশের পানির স্তর। প্রতি বছর পানির স্তর নেমে যাচ্ছে প্রায় ৫ ফুট করে। ভূগর্ভস্থ পানির প্রায় ৮০ ভাগ বন্যার পানি থেকে সঞ্চিত হয়। ফারাক্কার প্রভাবে বাংলাদেশের পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়ার হার ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকলে, কয়েক বছর পরে ইরি-বোরো চাষের জন্য ভূগর্ভস্থ পানি নেমে আসবে শূন্যের কোঠায়।

৫. ফারাক্কায় গঙ্গার পানি প্রত্যাহারের ফলে নদীর স্রোত হ্রাস পাওয়ায় দেশের দক্ষিণ অঞ্চলে লবণাক্ততা বৃদ্ধি পাচ্ছে। শিল্প শহর খুলনা রূপসা নদীতে লবণাক্ততা এতই বৃদ্ধি পেয়েছে যে সেখানে নদীর পানি খাবারের জন্য ব্যবহার করা দূরের কথা কল-কারখানায় ব্যবহারের জন্যই অনুপযুক্ত হয়ে পড়ছে।

৬. গঙ্গা নদীর পানি দ্বারা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পলিমাটি জমির উর্বরা শক্তি বৃদ্ধি করার প্রাকৃতিক পদ্ধতি এখন বিপর্যস্ত। ফলে দিন দিন জমিতে রাসায়নিক সারের চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৭. ইতোমধ্যে ফারাক্কার প্রভাবে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে মরুকরণের লক্ষণ শনাক্ত হয়েছে। এছাড়া লবণাক্ততা বৃদ্ধির ফলে দক্ষিণাঞ্চলের জীববৈচিত্র মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।"[৬২]

জামায়াতে ইসলামী ভারত কর্তৃক গংগা নদীর পানি যথেচ্ছ প্রত্যাহার করার

---

৬২. শেখ ফজলে এলাহী, আন্তর্জাতিক আইন ও বাংলাদেশ-ভারত পানি বিরোধ, পৃষ্ঠা-৬৪-৬৫।

www.pathagar.com

বিরুদ্ধে গোড়া থেকেই প্রতিবাদ করে এসেছে। বিষয়টির ন্যায্য সমাধানের জন্য জাতিসংঘে উত্থাপনের দাবি জানিয়ে এসেছে।

১৯৯৬ সনে স্বাক্ষরিত গ্যারান্টি ক্লজবিহীন ৩০ বছর মেয়াদি চুক্তিও যে বাংলাদেশের জন্য দীর্ঘ মেয়াদি কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে সে সম্পর্কে সব সময়ই বক্তব্য দিয়ে এসেছে।

১৭ দফা দাবি নিয়ে আন্দোলন

১৯৯৭ সনের ১৭ই এপ্রিল জামায়াতে ইসলামী বিভিন্ন ইস্যু সমন্বিত করে জনমত গড়ে তোলার লক্ষ্যে ১৭ দফা দাবি প্রণয়ন করে। দাবিগুলো হচ্ছে–

১। বাংলাদেশকে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করতে হবে।

২। বাংলাদেশের সংবিধানে আল্লাহর সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় সন্নিবেশিত থাকতে হবে।

৩। কুরআন ও সুন্নাহকে আইনের উৎস ঘোষণা করতে হবে। এমন কোন আইন প্রণয়ন করা যাবে না এবং কোন প্রশাসনিক পদক্ষেপ নেয়া যাবে না যা কুরআন-সুন্নাহর পরিপন্থী। পারিবারিক প্রচলিত আইনে কুরআন ও সুন্নাহ বিরোধী যে সব ধারা রয়েছে তা অবিলম্বে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে সংশোধন করতে হবে।

৪। কাদিয়ানিরা যেহেতু হযরত মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে শেষ নবী মানে না এবং শুরু থেকে অনৈসলামী কাজে লিপ্ত, তাদেরকে অমুসলিম ঘোষণা করতে হবে।

৫। সুদ-ঘুষ, মদ-জুয়া, ব্যভিচার উচ্ছেদসহ সকল প্রকার শোষণ এবং যাবতীয় রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক দুর্নীতি বন্ধ করতে হবে।

৬। বাংলাদেশের স্বাধীনতা হিফাযাতের লক্ষ্যে শক্তিশালী সেনাবাহিনী গঠন করতে হবে এবং জনগণ ও সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে ইসলামী চেতনা ও জিহাদী জযবা সৃষ্টি করতে হবে।

৭। (ক) বাংলাদেশের উপর দিয়ে প্রবাহিত গংগাসহ সকল আন্তর্জাতিক নদীর ন্যায্য হিস্যা আদায় করতে হবে। ফারাক্কা বাঁধ চালু করার পর থেকে এ পর্যন্ত সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশের যে ক্ষতি হয়েছে তা

www.pathagar.com

আদায়ের জন্য ভারতের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক আদালতে ক্ষতিপূরণের মামলা দায়ের করতে হবে।

(খ) ভারতকে ট্রানজিটের নামে করিডোর এবং চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহার করতে দেয়া যাবে না। ভারতের স্বার্থ রক্ষার জন্য সার্ককে অকার্যকর করে তথাকথিত উন্নয়ন চতুর্ভুজ বা অন্য নামে উপআঞ্চলিক জোট গঠন করা চলবে না।

৮। ভারতের মদদপুষ্ট তথাকথিত শান্তিবাহিনীর সাথে বাংলাদেশের সংবিধানপরিপন্থী কোন চুক্তি করা যাবে না। পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে কোন অবস্থাতেই সশস্ত্রবাহিনী প্রত্যাহার করা চলবে না।

৯। সরকারের মূল দায়িত্ব হবে সূরা আল হাজ্জের ৪১ নং আয়াত অনুযায়ী;

ক) নামায কায়েমের মাধ্যমে জনগণের চরিত্র গঠন ও আল্লাহভীতি সৃষ্টি।

খ) যাকাত ব্যবস্থা বাস্তবায়নের মাধ্যমে দুঃস্থ ও অসহায় মানুষের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিধান;

গ) সৎকাজ ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা;

ঘ) অসৎ কাজ ও অন্যায়ের প্রতিরোধ।

সরকারের আরো দায়িত্ব হবে ঃ

ঙ) জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল নাগরিকের ভাত-কাপড়, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা তথা মৌলিক মানবীয় প্রয়োজন পূরণ।

চ) সকল নাগরিকের জান-মাল-ইজ্জত আব্রু তথা মানবাধিকারের হিফাযাত, আইনের শাসন কায়েম, সন্ত্রাস নির্মূলকরণ ও গণতান্ত্রিক অধিকার সংরক্ষণ।

ছ) অবিলম্বে বিশেষ ক্ষমতা আইন নামক কালাকানুন বাতিল করণ ইত্যাদি।

কুরআন-সুন্নাহ মুতাবিক মহিলাদের যাবতীয় অধিকার বহাল করে নারীদেরকে মর্যাদার আসনে সমাসীন করতে হবে। যৌতুক প্রথাসহ যাবতীয় নারী নির্যাতন কঠোরভাবে বন্ধ করতে হবে।

www.pathagar.com

১০। মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃস্টান ও উপজাতীয় সকল ধর্মের লোক যাতে স্বীয় ধর্মীয় মতামত ও রীতিনীতি সম্পূর্ণরূপে পালন করতে পারে এর নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।

১১। বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক করে প্রকৃত অর্থে তাকে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ করতে হবে।

১২. এক শ্রেণীর এনজিও-এর মাধ্যমে জাতীয় অর্থনৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধবিরোধী কার্যকলাপ, সুদী ঋণের মাধ্যমে শোষণ ও হয়রানি বন্ধ করতে হবে।

১৩. জাতীয় অর্থনীতির উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দেশকে স্বনির্ভর করার লক্ষ্যে;

ক) ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পূর্ণাঙ্গরূপে চালু করতে হবে;

খ) দেশীয় শিল্প ও বাণিজ্যকে প্রটেকশন দান এবং যথাযথ বিকাশের সুযোগ দেবার উদ্দেশ্যে বাস্তব পদক্ষেপ নিতে হবে।

গ) জনগণের ৮০% কৃষকই অর্থনীতির মেরুদণ্ড। তাদের অর্থনৈতিক উন্নতি ছাড়া দেশের সমৃদ্ধি অসম্ভব। কৃষি উৎপাদন লাভজনক করার উদ্দেশ্যে কৃষকদেরকে সুদবিহীন ঋণদান এবং কৃষি সামগ্রী সার, বীজ ও কীটনাশক সংগ্রহে ভর্তুকি প্রদান করতে হবে;

ঘ। কর্মক্ষম সকল জনশক্তিকে জাতীয় উৎপাদনে অবদান রাখার জন্য যোগ্য হবার সুযোগ দিয়ে বেকার সমস্যার স্থায়ী সমাধান করতে হবে;

ঙ। ইসলামী শ্রমনীতি প্রয়োগ করে সকল শ্রেণীর শ্রমিকদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিরাপত্তা বিধান করতে হবে।

চ। সকল ধরনের পেশাকে সম্মানজক গণ্য করতে হবে;

ছ। পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের সুযোগ দিতে হবে।

১৫. নীতিনৈতিকতাহীন, ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তে যথার্থ ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে হবে। ড. কুদরতে খুদা শিক্ষা

www.pathagar.com

কমিশন ধর্মনিরপেক্ষ ও সমাজতান্ত্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার যে সুপারিশ করেছে, তা দেশের সংবিধানবিরোধী বলে বর্জন করতে হবে। ইসলামী মূল্যবোধের ভিত্তিতে সমাজ গঠন ও জাতীয় উন্নয়নে যোগ্য ভূমিকা পালনের উদ্দেশ্যে মহিলাদেরকে যথাযথ শিক্ষার সুযোগ দিতে হবে।

১৬. জাতীয় প্রচার মাধ্যম ও পত্র-পত্রিকা, রেডিও-টেলিভিশনকে শিক্ষা বিস্তার এবং জাতীয় চরিত্র গঠনের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। বিশেষ করে টি.ভি.-রেডিওসহ সকল মিডিয়াতে চরিত্রবিধ্বংসী নগ্নতা ও বেহায়াপনা এবং অপসংস্কৃতির বিস্তার বন্ধ করতে হবে।

১৭. যাবতীয় সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে ইসলামী আদর্শ, ঐতিহ্য ও মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটাতে হবে। রাষ্ট্রীয়ভাবে শিখা অনির্বান, শিখা চিরন্তন, মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্জলনসহ সকল প্রকার বিজাতীয় ও অপসংস্কৃতি পরিহার করতে হবে।

নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন জনসভায় এই দাবিগুলোর গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে বক্তব্য দিতে থাকেন।

জাতিসংঘের ইসলামবিরোধী প্রস্তাবে সরকারের স্বাক্ষরদানের প্রতিবাদ

১৯৯৭ সনের মাঝামাঝি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার মহিলা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জাতিসংঘের একটি ফোরামে কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক 'শরীয়া আইনকে অপরিবর্তনীয় ও অলংঘনীয় নয়' বলে ঘোষণা করায় বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ যুগপৎ গভীর বিস্ময় ও উদ্বেগ প্রকাশ করে এবং উক্ত ইসলামবিরোধী প্রস্তাবে স্বাক্ষরদানের বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জ্ঞাপন করে।

১৯৯৭ সনের ২রা ডিসেম্বর স্বাক্ষরিত তথাকথিত 'শান্তি চুক্তি'র প্রতিবাদ

বাংলাদেশের এক-দশমাংশ ভূমি জুড়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের (রাংগামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান) অবস্থান। পার্বত্য চট্টগ্রামে চাকমা, গারো, ত্রিপুরা,

www.pathagar.com

মারমা, চাক, খীয়াং, মুরং, পাংখো, তনচংগ্যা, হাজং, মাহাতো, মুন্ডা, ওঁরাও, রাজংশী প্রভৃতি উপজাতি বসবাস করে।

বৃটিশ শাসনামলে পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রথমে চট্টগ্রাম জিলারই অংশ ছিলো। ১৮৬০ সনে পার্বত্য চট্টগ্রাম নামে একটি নতুন জিলা গঠন করা হয়।

১৯০০ সনের ১৭ই জানুয়ারি The Chittagong Hill Tracts Regulation-1900 জারি করা হয় এবং জিলাটিকে একজন ডেপুটি কমিশনারের অধীনে ন্যস্ত করা হয়।

১৯৬৫ সনের ১৮ই জুন মানবেন্দ্র নারায়ন লারমার নেতৃত্বে 'পার্বত্য ছাত্র সমিতি' নামে একটি সংগঠনের জন্ম হয়। পরের বছর অনন্ত বিহারী খীসা এবং জে. বি. লারমার নেতৃত্বে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম উপজাতি (আদিবাসি) কল্যাণ সমিতি' নামে আরো একটি সংগঠনের আত্মপ্রকাশ ঘটে। ক্রমশ উপজাতীয়দের একাংশের মাঝে বিচ্ছিন্নতাবাদী চিন্তার বিকাশ ঘটতে থাকে।

কেউ কেউ বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা প্রকট হয় যখন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান মানবেন্দ্র নারায়ন লারমাকে ধমক দিয়ে বলেছিলেন বিচ্ছিন্নতার পথ পরিহার করে বাঙালী জাতীয়তাবাদের মূল স্রোতে মিশে যেতে। ১৯৭২ সনে শেখ মুজিবুর রহমান ও আওয়ামী লীগ সরকার বাংলাদেশী জাতিসত্তার বদলে বাঙালী জাতিসত্তার বিষয়টিকে একচ্ছত্র প্রতিষ্ঠা দিলে মানবেন্দ্র নারায়ন লারমা (১৯৭২-৭৫ এ স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য) এর প্রতিবাদ করেন, শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে ডেপুটেশন নিয়ে যান, স্মারকলিপি দেন। তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়িদের অসন্তোষ উত্থাপন করে তা সমাধানের দাবি জানান। শেখ মুজিবুর রহমান মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাকে বাঙালি হয়ে যাবার কথা বলেন। তিনি বলেন 'যা বাঙালি হইয়া যা'। শেখ মুজিবের এই প্রস্তাবে নিজেদের ঐতিহ্য ও স্বকীয় জাতিসত্তার ভবিষ্যত সম্পর্কে উপজাতীয়রা বিচলিত বোধ করেন। এখানে উল্লেখ্য যে ১৯৭২ সনের ২৯ জানুয়ারি চারু বিকাশ চাকমার নেতৃত্বে সাত সদস্যের একটি উপজাতীয় প্রতিনিধি দল

www.pathagar.com

পার্বত্য চট্টগ্রামের স্বায়ত্বশাসনের দাবিতে ঢাকায় শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে সাক্ষাৎ করেন। রাজা মং প্রু সাইন চৌধুরীর নেতৃত্বে আরেকটি পার্বত্য প্রতিনিধি দল শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে সাক্ষাতের চেষ্টা করে ব্যর্থ হন, তবে তারা তাদের দাবিগুলো রেখে যান।

মানবেন্দ্র নারায়ন লারমা ১৯৭২ সনের ফেব্রুয়ারি মাসের ১৫ তারিখে শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে সাক্ষাৎ করে উপজাতীয়দের চার দফা দাবি উত্থাপন করেন। দাবিগুলো ছিল-

১। পাবর্ত্য চট্টগ্রামের নিজস্ব আইন পরিষদ সংবলিত আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন। পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি স্বায়ত্বশাসিত অঞ্চল হবে এবং এর একটি নিজস্ব আইন পরিষদ থাকবে।

২। উপজাতীয় জনগণের অধিকার সংরক্ষণের জন্য '১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি'র অনুরূপ সংবিধি বাংলাদেশের সংবিধানে সংযোজন।

৩। উপজাতীয় রাজাদের দফতরগুলো সংরক্ষণ।

৪। সংবিধানে '১৯০০ সালের রেগুলেশনের সংশোধন'-নিরোধ সংক্রান্ত বিধি রাখা এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালি অনুপ্রবেশ বন্ধ কর।

মানবেন্দ্র নারায়ন লারমা শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে যে চার দফা দাবি উত্থাপন করেছিলেন তার একটিও পূরণ না করে তিনি পাহাড়িদের বাঙালী হয়ে যাবার কথা বলায় পাহাড়িরা মারমুখী হয়ে উঠে। মূলত এ কারণেই সংসদ সদস্য হওয়া সত্ত্বেও ১৯৭২ সনে দেশে যে প্রথম সংবিধান প্রণীত হয় মানবেন্দ্র নারায়ন লারমা তাতে সই করেননি।

শেখ মুজিবুর রহমান একদিকে মানবেন্দ্র নারায়ন লারমার দাবিকে উপেক্ষা করেন, অন্যদিকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারী চাকমা রাজা ত্রিদিব রায়কে পাকিস্তান থেকে দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য ত্রিদিব রায়ের মা বিনীতা রায়কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাঠান। ত্রিদিব রায় তখন পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কর্মরত ছিলেন। কিন্তু রাজা ত্রিদিব রায় বাংলাদেশে ফিরে আসতে অস্বীকার করেন। ১৯৭৩ সনে রাঙ্গামাটির এক নির্বাচনী জনসভায় চাকমা রাজার বিরুদ্ধে স্বাধীনতা বিরোধী তৎপরতার

www.pathagar.com

কথা উল্লেখ করে শেখ মুজিবুর রহমান পাহাড়িদের বাঙালি হয়ে যাবার পরামর্শ দেন।...

শেখ মুজিবুর রহমান উপজাতীয়দের চার দফা দাবি প্রত্যাখ্যান করার পর উপজাতীয়রা উপলব্ধি করলো যে বিপ্লবী সংগঠন তৈরি করা ছাড়া তাঁদের উদ্দেশ্য সফল হবে না।

> "... চার দফা দাবি আদায় ও আওয়ামী লীগ সরকারের নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য শেখ মুজিবের আওয়ামী শাসনামলেও আন্ডারগ্রাউন্ডে গিয়ে মানবেন্দ্র নারায়ন লারমার নেতৃত্বাধীন 'জনসংহতি সমিতি' ৭ই জানুয়ারি ১৯৭৩ সালে 'শান্তিবাহিনী' নামে একটি সশস্ত্র উইং গঠন করে। ১৯৭৩ সালে গঠিত হলেও এর কার্যকলাপ ১৯৭৫ সালের অগাস্ট মাসের পর অর্থাৎ শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যুর পর দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পায়। শান্তিবাহিনীর কার্যকলাপ এ সময়ে বৃদ্ধি পাওয়ার অন্যতম কারণ ছিল প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের চাকমা গেরিলাদের সহযোগিতা।"
>
> "... জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র উইং শান্তিবাহিনীর নেতা শন্তু লারমা ও চবরি মারমা ১৯৭৬ সালের কোন এক সময় সেনাবাহিনীর হাতে ধরা পড়েন। ১৯৮১ সাল পর্যন্ত তাদেরকে বন্দি করে রাখা হয়। এ সময় শান্তি বাহিনীর নেতৃত্বে আসেন প্রীতিকুমার চাকমা। ১৯৮১ সালে শান্তি বাহিনীর সাথে সরকারের আলোচনার শর্ত হিসেবে শন্তু লারমা ও চবরি মারমা মুক্তি পেয়ে পাহাড়ে ফিরে আসেন।"[৬৩]

একটি উপদলীয় কোন্দলের ফলে ১৯৮৩ সনের ১০ই নবেম্বর মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা নিহত হন। "শান্তি বাহিনী" লারমা গ্রুপের নেতৃত্ব লাভ করেন জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা ওরফে শন্তু লারমা।

বেগম খালেদা জিয়া প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের প্রয়াস চালান।

১৯৯৬ সনে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসে। শেখ হাসিনা সরকার ১৯৯৭ সনের ২রা ডিসেম্বর শন্তু লারমার নেতৃত্বাধীন জনসংহতি সমিতির সাথে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে। এটি ছিলো একটি

---

৬৩. ড. মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা : স্বরূপ ও সমাধানের উপায়, সেমিনার প্রবন্ধ সংকলন-২০১০, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, পৃষ্ঠা-১৬৮।

www.pathagar.com

অসম চুক্তি। এই চুক্তি স্বাক্ষর করে আওয়ামী লীগ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের ওপর বাংলাদেশ সরকারের নিয়ন্ত্রণ শিথিল করে ফেলে। এই চুক্তি অনুযায়ী উপজাতিগুলোই পার্বত্য চট্টগ্রামের জমির মালিক। সেখানে বসবাসকারী অউপজাতীয় লোকেরা জমির মালিকানা ভোগ করতে পারবে না। আবার গোটা পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন করবে উপজাতির লোকেরাই।

১৯৭৬ সনের ২০শে অকটোবর রাষ্ট্রপতি বিচারপতি এ.এম.এম. সায়েম The Chittagong Hill Tracts Development Board Ordinance 1976 জারি করেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়নের জন্য সরকার বহুমুখি কার্যক্রম হাতে নেয়।

১৯৮৯ সনে "রাংগামাটি পার্বত্য জিলা স্থানীয় সরকার পরিষদ", "খাগড়াছড়ি পার্বত্য জিলা স্থানীয় সরকার পরিষদ" এবং "বান্দরবান পার্বত্য জিলা স্থানীয় সরকার পরিষদ" আইন প্রণীত ও প্রবর্তিত হয়।

এই আইনের ৬৪নং ধারায় বলা হয় 'পার্বত্য জিলার এলাকাধীন কোন জায়গাজমি পরিষদের পূর্ব অনুমোদন ব্যতিরেকে বন্দোবস্ত দেওয়া যাবে না এবং অনুরূপ অনুমোদন ব্যতিরেকে উক্ত রূপ জায়গাজমি উক্ত জিলার বাসিন্দা নন এমন কোন ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর করা যাবে না। তবে শর্ত থাকে যে সংরক্ষিত (protected) ও রক্ষিত (reserved) বনাঞ্চল, রাষ্ট্রীয় জায়গাজমি এবং রাষ্ট্রীয় স্বার্থে প্রয়োজন হতে পারে এইরূপ কোন জায়গাজমি বা বনের শিল্প-কারখানা এলাকা সরকার বা জনস্বার্থের প্রয়োজনে হস্তান্তরিত বা বন্দোবস্তকৃত ক্ষেত্রে এই বিধান প্রযোজ্য হবে না।'

শেখ হাসিনার শাসনামলে ১৯৯৭ সনের ২রা ডিসেম্বর বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির পক্ষে জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। এই চুক্তি অনুযায়ী পার্বত্য জিলার স্থানীয় সরকার গুলোর নাম হয় "রাংগামাটি পার্বত্য জিলা পরিষদ", "খাগড়াছড়ি পার্বত্য জিলা পরিষদ" এবং "বান্দরবান পার্বত্য জিলা পরিষদ"।

পূর্ববর্তী আইনের ৬৪ নাম্বার ধারার পরিবর্তে নিম্নোক্ত ধারাটি সংযোজিত হবে বলে স্থিরিকৃত হয় :

www.pathagar.com

'পার্বত্য জিলার এলাকাধীন বন্দোবস্তযোগ্য খাস জমিসহ কোন জায়গাজমি পরিষদের পূর্ব অনুমোদন ব্যতিরেকে ইজারা প্রদানসহ বন্দোবস্ত, ক্রয় বিক্রয় ও হস্তান্তর করা যাবে না। তবে শর্ত থাকে যে রক্ষিত (reserved) বনাঞ্চল, কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্প, বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ এলাকা, রাষ্ট্রীয় শিল্প-কারখানা ও সরকারের নামে রেকর্ডকৃত ভূমির ক্ষেত্রে এই বিধান প্রযোজ্য হবে না।'

'পার্বত্য জিলা পরিষদের নিয়ন্ত্রণ ও আওতাধীন কোন প্রকারের জমি, পাহাড় ও বনাঞ্চল পরিষদের সাথে আলোচনা ও এর সম্মতি ব্যতিরেকে সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ ও হস্তান্তর করা যাবে না।

তিনটি পার্বত্য জিলা পরিষদ সমন্বয়ে "পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ" গঠনের বিধান রাখা হয় এই চুক্তিতে।

'পার্বত্য জিলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্যদের দ্বারা পরোক্ষভাবে এই পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হবেন যার পদ মর্যাদা একজন প্রতিমন্ত্রীর সমকক্ষ হবে এবং তিনি অবশ্যই উপজাতীয় হবেন।'

'যে সকল অ-উপজাতীয় ও অ-স্থানীয় ব্যক্তিদেরকে রাবার বা অন্যান্য প্লান্টেশনের জন্যে জমি বরাদ্দ করা হয়েছিলো তাদের মধ্যে যারা গত দশ বছরের মধ্যে প্রকল্প গ্রহণ করেননি বা জমির সঠিক ব্যবহার করেননি সে সকল জমির বন্দোবস্ত বাতিল করা হবে।'

'সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে চুক্তি সম্পাদনের পর এবং জনসংহতি সদস্যদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার সাথে সাথে সীমান্ত রক্ষীবাহিনী (বিডিআর) ও স্থায়ী সেনানিবাস (তিন জিলা সদরে তিনটি এবং আলীকদম, রামু ও দীঘিনালা) ব্যতীত সামরিক বাহিনী, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সকল অস্থায়ী ক্যাম্প পার্বত্য চট্টগ্রাম হতে পর্যায়ক্রমে স্থানীয় নিবাসে ফেরত দেওয়া হবে এবং এই লক্ষ্যে সময় নির্ধারণ করা হবে।' ইত্যাদি।

১৯৯৭ সনের ২রা ডিসেম্বর এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এটিকে "শান্তিচুক্তি" বলা হয়।

জামায়াতে ইসলামী এই অবিজ্ঞজনোচিত এবং জাতীয় স্বার্থবিরোধী চুক্তির তীব্র সমালোচনা করে। জামায়াতে ইসলামীর নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন জনসভায় এই চুক্তির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাতে থাকেন।

www.pathagar.com

চারদলীয় জোটের অংশীদার রূপে ভূমিকা পালন

আওয়ামী লীগ সরকার গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ক্ষমতায় এসে স্বৈরশাসনের পথই বেছে নেয়। দেশে এক শাসরুদ্ধকর পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে।

১৯৯৯ সনের ৩০শে নবেম্বর ২৯ মিন্টো রোডে অনুষ্ঠিত বৈঠকে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল, ইসলামী ঐক্যজোট, জাতীয় পার্টি ও জামায়াতে ইসলামী-র শীর্ষ নেতৃবৃন্দ আওয়ামী দুঃশাসন থেকে দেশকে উদ্ধার করার সংকল্প নিয়ে চারদলীয় জোট গঠন করেন এবং একটি ঘোষণাপত্রের মাধ্যমে দেশবাসীকে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানান। নেতৃবৃন্দের এই ঐক্য জনগণের মধ্যে বিপুল সাড়া জাগায়। চার দলীয় জোটের ঘোষণাপত্রটি ছিলো নিম্নরূপ :

"আমরা বাংলাদেশের চারটি রাজনৈতিক দল প্রধান, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি'র চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া, জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের আমীর গোলাম আযম ও ইসলামী ঐক্যজোটের চেয়ারম্যান আজিজুল হক আমাদের নিজ নিজ দল, জোট ও সমমনা অন্যান্য রাজনৈতিক দল এবং আর্থ-সামাজিক সংগঠনগুলোর মধ্যে ব্যাপক আলোচনার ভিত্তিতে সম্মিলিতভাবে দেশবাসীর পক্ষে ঘোষণা দিচ্ছি যে, একের পর এক জনস্বার্থ বিরোধী, রাষ্ট্রঘাতী, সংবিধান বিরোধী, জনগণের ধর্মবিশ্বাস বিরোধী, স্বৈরাচারী ও অমানবিক কর্মকাণ্ড এবং সরকার পরিচালনায় ব্যর্থতার দায়ে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে গঠিত ক্ষমতাসীন সরকার রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার সকল বৈধতা হারিয়েছে।

আমরা সম্মিলিতভাবে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করছি,

- যেহেতু আজ বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব ও ভৌগলিক অখণ্ডতা বিপন্ন, এবং
- যেহেতু এই সরকার প্রতিনিধিত্বমূলক রাজনীতির সুষ্ঠু ও অবাধ পরিবেশ ধ্বংস করে দেশব্যাপী রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ও দলীয় অস্ত্রবাজির এক সংঘাতময় পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে, সকল নাগরিকের জীবন, জীবিকা, সম্পদ এবং নারীর সম্ভ্রম বিপন্ন করেছে, এবং
- যেহেতু সাংবিধানিক ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা আজ চরম হুমকির সম্মুখীন, এবং
- যেহেতু আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির চরম অবনতি ঘটেছে, জনগণের জানমালের নিরাপত্তা বিধানে সরকার সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে এবং রাষ্ট্রক্ষমতার অপব্যবহার, ভয়-ভীতি ও নির্যাতনের মাধ্যমে একদলীয়

www.pathagar.com

ফ্যাসিবাদী কায়দায় রাষ্ট্র পরিচালনা করার জন্য সরকার রাজপথ দখলের নামে সরাসরি সংঘাতের পথ বেছে নিয়েছে, সমগ্র জাতিকে সরকারের মদদপুষ্ট দলীয় লোকদের দ্বারা সৃষ্ট সন্ত্রাসের কাছে জিম্মি করেছে এবং এই সরকারের অত্যাচার-অনাচার, জেল, জুলুম, নির্যাতন, হয়রানি ও মিথ্যা মামলার কারণে মানবাধিকার লংঘন চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে এবং হাজার হাজার বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের কারাবন্দী করা হয়েছে, এবং তিনশোরও বেশী রাজনৈতিক কর্মীকে হত্যা করা হয়েছে, এবং

- যেহেতু শুধু নিরস্ত্র মিছিলের উপরেই নয়, সম্মানিত সংসদ সদস্যদের উপরও পুলিশ লেলিয়ে দিয়ে সরকার গণতান্ত্রিক নীতিবোধের প্রতি চরম অবজ্ঞা প্রদর্শন করেছে, এমনকি সম্মানিত সংসদ সদস্যদের উপর গুলি চালিয়ে হত্যার অপচেষ্টা করতেও সরকার দ্বিধা করেনি, এবং
- যেহেতু এ সরকার তাদের একান্ত বশংবদ প্রধান নির্বাচন কমিশনারের মাধ্যমে নির্বাচন প্রক্রিয়ার পবিত্রতা সম্পূর্ণভাবে কলুষিত করেছে, এ সরকারের আমলে জাতীয় সংসদের উপ-নির্বাচনসহ কোন নির্বাচন সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ হয়নি, ক্ষমতাসীন দল জনগণের ভোটাধিকার ছিনতাই করে নির্বাচনকে কী নিদারুণ প্রহসনে পরিণত করতে পারে লক্ষ্মীপুর, মিরেরসরাই, পাবনা, ফরিদপুর এবং টাঙ্গাইলে অনুষ্ঠিত উপ-নির্বাচন তার সর্বশেষ জঘন্য উদাহরণ। বিরোধী দলসমূহের ৪-দফা দাবী উপেক্ষা করে একদলীয় একতরফা ভোটবিহীন পৌরসভা নির্বাচন করে জনগণকে ভোটের অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে। ভোটার তালিকা প্রণয়ন এবং ভোটার পরিচয়পত্র প্রদান হীনতম দলীয়করণের শিকারে পরিণত করেছে, এবং
- যেহেতু জাতীয় সংসদকে সম্পূর্ণভাবে অকার্যকর করে দেওয়া হয়েছে এবং আইনের শাসনকে আজ দলীয় শাসনে পরিণত করা হয়েছে, এবং
- যেহেতু একটি বিশেষ রাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীল পররাষ্ট্রনীতি ও অর্থনীতি অনুসরণের কারণে আজ আমাদের নিজস্ব জাতীয় অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙ্গে পড়ার দরুণ অর্থনীতি চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন এবং সরকারের আত্মঘাতী নীতির কারণে দেশে জাতীয় এবং বিদেশী নতুন পুঁজি বিনিয়োগ স্থবির হয়ে গেছে, এবং
- যেহেতু ব্যাংক এবং অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠাসমূহে নৈরাজ্য সৃষ্টি করা হয়েছে, এবং
- যেহেতু সরকারের প্রভু-তোষণ নীতির ফলে বাংলাদেশ ভারতীয় পণ্যের চোরাবাজারে পরিণত হওয়ায় দেশের অধিকাংশ শিল্পখাতে

www.pathagar.com

একের পর এক কলকারখানা বন্ধ হচ্ছে আর বিপুল সংখ্যক শ্রমিক-কর্মচারী বেকার হয়েছে, এবং

- যেহেতু সরকার নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি নিয়ন্ত্রণে এবং বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস সরবরাহ ও ব্যবস্থাপনায় চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে, এবং
- যেহেতু একদিকে সার, বিদ্যুৎ ও কীটনাশক ওষুধসহ সকল কৃষি উপকরণের মূল্য বৃদ্ধি এবং অন্যদিকে উৎপাদিত কৃষিপণ্যের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত না করার ফলে কৃষক সমাজ এবং কৃষি খাত আজ এক চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন এবং গ্রামের মানুষ অপুষ্টি, অভাব ও আয়ের অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে দিন যাপন করছে, এবং
- যেহেতু আজ তিন কোটি কর্মক্ষম বেকার যুবকের জন্য সরকার কর্মসংস্থানের জন্য কোন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি, এবং
- যেহেতু শ্রমিকের ন্যায্য অধিকার ও প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করার নানা অপচেষ্টায় সরকারের যোগসাজসে সুস্পষ্ট, এবং মজুরী কমিশনের সুপারিশ প্রণয়ন ও শ্রমিকদের সাথে স্বাক্ষরিত চুক্তি বাস্তবায়নে সরকারের কোনই উদ্যোগ নেই, এবং
- যেহেতু সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি, তাদের প্রতিনিধিদের ভয়ভীতি প্রদর্শন, চাকুরীচ্যুত ও জেলে পুরে সরকার তাদের ন্যায্য দাবী থেকে বঞ্চিত করছে, এবং তিন বছর ধরে পে-কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নে কর্মচারীদের সাথে শঠতা করছে, এবং
- যেহেতু ক্ষমতায় এসেই এ সরকার শেয়ার মার্কেটে ফটকাবাজারীর সুযোগ ও ব্যবস্থা করে দিয়েছে। ক্ষমতাসীনদের দেশীয় দোসর ও বিদেশী মহাজনরা সাধারণ মধ্যবিত্ত হাজার হাজার পরিবারের আজীবনের সঞ্চয় লুণ্ঠন করে নিয়েছে। পুঁজি বাজারের সংকটে শিল্পোন্নতির সম্ভাবনা তিরোহিত হয়েছে, এবং
- যেহেতু এই সরকার রাষ্ট্রঘাতী লক্ষ্যে আমাদের জাতিগঠনমূলক সকল প্রতিষ্ঠান যথা বিচার বিভাগ, প্রশাসন, পুলিশ, প্রতিরক্ষাবাহিনী, শিল্প ও বাণিজ্যিক কাঠামোসমূহকে একে একে পঙ্গু করে দেওয়ার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে, এবং
- যেহেতু সরকার উচ্চ আদালতকে আক্রমণের লক্ষ্যে পরিণত করেছে। বিচারকদের জবাবদিহিতার ভুয়া প্রশ্ন তুলে বিচারকগণকে তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন ও মর্যাদাহীন করতে চাইছে, এবং
- যেহেতু সংবাদপত্রকে নিয়ন্ত্রণে রাখার উদ্দেশ্যে সরকার সংবাদপত্রের জবাবদিহিতার ধুয়া তুলে পর্দার অন্তরালে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা

www.pathagar.com

হরণের অপচেষ্টা করছে। সমালোচনাকারী সাংবাদিকদের বেছে বেছে জীবননাশের হুমকি দেওয়া হচ্ছে, তাদের মিথ্যা মামলায় জড়ানো হচ্ছে, আর যেসব সংবাদপত্র সরকারের দুর্নীতির কাহিনী প্রকাশ করছে ও সরকারের ব্যর্থতা তুলে ধরছে তাদের বিজ্ঞাপনের প্রাপ্য কোটা থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে এবং

- যেহেতু জাতীয় রেডিও এবং টেলিভিশনকে সরকার দলীয় প্রচার, বিরোধীদলের চরিত্র হনন ও নির্লজ্জ মিথ্যাচারে অন্যায়ভাবে ব্যবহার করছে, এবং
- যেহেতু পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির মাধ্যমে সরকার সংবিধান লংঘন করে নাগরিকদের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি ও নতুন অশান্তির বীজ বপন করেছে এবং দেশের এক দশমাংশ ভূখণ্ড রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত করার ষড়যন্ত্রের অংশীদার হয়েছে, এবং
- যেহেতু তথাকথিত পানি চুক্তিতে গঙ্গার পানির হিস্যার গ্যারান্টি বা নিশ্চয়তার কোন বিধান এবং চুক্তি ভঙ্গের বিষয়ে কোন সালিশের ব্যবস্থা না রেখে সরকার বাংলাদেশের স্বার্থ রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছে, এবং
- যেহেতু দলীয়করণ ও সন্ত্রাসের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার মান ও পরিবেশ ধ্বংস করা হয়েছে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে সন্ত্রাস, দুর্নীতি, অসহায় মানুষকে জিম্মি এবং ছাত্রীদের সম্ভ্রমহানির হীন ক্ষেত্রে পরিণত করা হয়েছে, এবং
- যেহেতু সরকার ইসলামী মূল্যবোধ এবং সকল ধর্ম বিশ্বাস, আচার-আচরণ ও আলেম সমাজের উপর ক্রমাগত আঘাত হেনে চলেছে এবং দেশের ঐতিহ্যবাহী মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধ করে দেওয়ার অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়েছে, এবং
- যেহেতু সরকারের মন্ত্রী, এম.পি, উপদেষ্টা, দলীয় মদদপুষ্ট দালাল এবং অসৎ ব্যক্তিদের সীমাহীন দুর্নীতি ও অস্ত্রধারীদের চাঁদাবাজি দেশের আর্থ-সামাজিক পরিবেশ বিপন্ন ও দু:সহ করে তুলেছে, এবং
- যেহেতু ট্রান্সশিপমেন্টের নামে বাংলাদেশের উপর দিয়ে ভারতকে করিডোর দেওয়ার উদ্যোগ নিয়ে সরকার জাতীয় স্বার্থ ও অস্তিত্বের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, এবং
- যেহেতু সরকার আমাদের সীমান্তে ভারতীয় সেনাদের আক্রমণ, বিডিআর সদস্য ও নাগরিকদের হত্যা, জমি এবং সম্পদ দখলের প্রক্রিয়াকে বন্ধ করতে ব্যর্থ হয়েছে;

* সেহেতু আজ সকল বিরোধী রাজনৈতিক দল, পেশাজীবী, বুদ্ধিজীবী,

www.pathagar.com

কৃষিজীবী, প্রকৌশলী, শিক্ষক, আলেম-উলামা, ডাক্তার, আইনজীবী, ছাত্র-যুবক, শ্রমিক, মহিলা, সংস্কৃতিসেবী ও অন্যান্য সকল শ্রেণীর জনসাধারণের একটি মাত্র দাবী। আর তা হলো, বর্তমান সরকারকে অবিলম্বে পদত্যাগ করে সাংবিধানিক নিয়ম মোতাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে দ্রুততম সময়ের মধ্যে সর্বাগ্রে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে হবে।

আমাদের স্বাধীনতা, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা ও জাতীয় অর্থনীতি, আমাদের বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ রক্ষার এটাই আজ একমাত্র শান্তিপূর্ণ সাংবিধানিক পথ। একবিংশ শতাব্দীর দ্বারপ্রান্তে এসে আমরা এক বিরাট চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। ন্যূনতম পর্যায়ের উন্নয়নশীল দেশ হিসাবে জাতি গঠন প্রক্রিয়াকে সমুন্নত রেখে ও জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করে আমাদের বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় শামিল হতে হবে। তাই আমাদের চার দলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা এই যে, যথাসত্বর ব্যাপক ঐক্যের ভিত্তিতে একটি দেশপ্রেমিক ও সংবিধানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল শক্তিশালী সরকার গঠন করে একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করা।

এই ভবিষ্যত সরকারের দায়িত্ব ও কর্তব্য হবে "সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস, জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচার"- সংবিধানের এই মূলনীতি সংরক্ষণ ও বাস্তবায়ন; কঠোর হস্তে দুর্নীতি দমন; প্রশাসনিক শৃংখলার পুনরুদ্ধার; সর্বস্তরে মেধা ও যোগ্যতার স্বীকৃতি; অস্ত্রধারী চাঁদাবাজ দমন ও সকল নাগরিকের জানমালের নিরাপত্তা বিধান; আইনের শাসন পুনরুদ্ধার ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষা; বিশেষ ক্ষমতা আইন বাতিল; শিক্ষার মান ও পরিবেশ পুনরুদ্ধার; সাম্প্রদায়িক শান্তি ও সহনশীলতা প্রতিষ্ঠা; রেডিও টেলিভিশনের স্বায়ত্বশাসন প্রদান; দেশীয় শিল্পের বিকাশ ও চোরাচালান নিয়ন্ত্রণ; সর্বক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক মান ও শৃংখলা প্রতিষ্ঠা; মানবসম্পদ উন্নয়ন; সংবিধানে সার্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণা ও বহুদলীয় গণতন্ত্রের মূলনীতিগুলির বাস্তবায়ন ও সুরক্ষা; কৃষক শ্রমিকের ভাগ্যোন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন; বিপুল বেকার যুবসমাজের জন্য পর্যাপ্ত কর্মসংস্থান, মুদ্রাস্ফীতি ও দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে রেখে সকল জনগণের সঞ্চয় ও জীবন মানের সুরক্ষা; নারী সমাজের অধিকার, মর্যাদা ও ক্ষমতায়ণ প্রক্রিয়া এবং শিশুদের সুন্দরতম জীবন বিকাশের সুযোগ নিশ্চিতকরণ, জাতীয় সংস্কৃতি সংরক্ষণ, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ ও বহুমুখী শক্তি সঞ্চয়; প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্ব্যবহার ও সুনিয়ন্ত্রণ; সংবিধানের মূলনীতি পরিপন্থী সকল আইন সংশোধন; সর্বসম্প্রদায়ের নাগরিকের জন্য আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তা বিধান; এবং জাতীয় স্বার্থের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ গতিশীল পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করা।

www.pathagar.com

আমাদের সমগ্র জনগণ আজ ঐক্যবদ্ধ। আমাদের অপ্রতিরোধ্য আন্দোলনের জয় হবেই, ইনশাআল্লাহ।

সরকারের মনে রাখা উচিত জনগণের ইচ্ছা প্রতিফলনের মধ্যে দিয়েই সামাজিক শান্তি ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত হতে হবে। সংঘাতের পথ বিপর্যয়ই ডেকে আনে। এটাই ইতিহাসের শিক্ষা।

আমরা সম্মিলিতভাবে ঘোষণা করছি, চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত চলমান এক দফা আন্দোলন তীব্র থেকে তীব্রতর হবে। চক্রান্ত যত কুটিলই হোক, নির্যাতন হত বর্বরই হোক, জনজোয়ার কখনও স্তব্ধ হয় না।

আমরা দেশের সকল জাতীয়তাবাদী, গণতন্ত্রকামী, ইসলামী দল, গ্রুপ, কৃষক-শ্রমিক-ছাত্র, সকল পেশাজীবী, সংস্কৃতিসেবী সংগঠন ও ব্যক্তিকে চলমান গণআন্দোলনে শামিল হবার উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি।

আমাদের আন্দোলনের বিজয় ত্বরান্বিত করার জন্য আমরা দেশ জুড়ে সকল মহল্লায়, গ্রামে, শহরে ও বন্দরে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোলার আহ্বান জানাচ্ছি।

বেগম খালেদা জিয়া	হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ	গোলাম আযম	আজিজুল হক
চেয়ারপার্সন	চেয়ারম্যান	আমীর	চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল	জাতীয় পার্টি	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	ইসলামী ঐক্যজোট"

মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী আমীরে জামায়াত নির্বাচিত হন

২০০০ সনের জুলাই মাসে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার অধিবেশনে অধ্যাপক গোলাম আযম স্বাস্থ্যগত কারণে আমীরপদ থেকে অব্যাহতি লাভের জন্য আবেদন করেন। দীর্ঘ আলোচনার পর কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা তাঁর আবেদন গ্রহণ করে।

জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন আমীরে জামায়াত নির্বাচনের প্রক্রিয়া শুরু করে। যথাসময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

২০শে অকটোবর নির্বাচনের ফল ঘোষণা করা হয়।

২০০১-২০০৩ কার্যকালের জন্য আমীরে জামায়াত নির্বাচিত হন মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী।

www.pathagar.com

২০০১ সনের ১লা অকটোবর অনুষ্ঠিত অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ

২০০১ সনের ১লা অকটোবর অনুষ্ঠিত হয় অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচন।

এই নির্বাচনকালে রাষ্ট্রপতি ছিলেন বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদ।

কেয়ারটেকার প্রধান ছিলেন বিচারপতি লতিফুর রহমান। অন্যান্য উপদেষ্টা ছিলেন বিচারপতি বি.কে.রায় চৌধুরী, রোকেয়া আফজাল রহমান, মেজর জেনারেল (অব) মইনুল ইসলাম চৌধুরী, সৈয়দ মঞ্জুর ইলাহী, এম. হাফিজুদ্দিন খান, এ.কে.এম. আমানুল ইসলাম চৌধুরী, সৈয়দ ইশতিয়াক আহমদ, ব্রিগেডিয়ার (অব) আবদুল মালিক, আবদুল মুয়ীদ চৌধুরী এবং এ.এস.এম. শাহজাহান।

শেখ হাসিনা ক্ষমতা ত্যাগ করার পূর্বে প্রশাসন, পুলিশ ও নির্বাচন কমিশনে তাঁর পছন্দের ব্যক্তিদেরকেই বসিয়ে যান।

২০০১ সনের ১লা অকটোবরের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাত্র কয়েকদিন আগে হুসেইন মুহাম্মাদ এরশাদ আকস্মিকভাবে চারদলীয় জোট ত্যাগ করেন। তবে নাজিউর রহমান মঞ্জুর নেতৃত্বে জাতীয় পার্টির একটি অংশ চারদলীয় জোটে থেকে যায়।

রাষ্ট্রপতি শাহাবুদ্দীন আহমদ এবং কেয়ারটেকার প্রধান বিচারপতি লতিফুর রহমান দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে এমন এক নির্বাচন অনুষ্ঠিত করেন যা পূর্ববর্তী দুইটি কেয়ারটেকার সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের চেয়েও অধিকতর সুষ্ঠু হয়েছিলো।

এই নির্বাচনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল ১৯৩টি আসন, আওয়ামী লীগ ৬২টি আসন এবং জামায়াতে ইসলামী ১৭টি আসন লাভ করে।

জামায়াতে ইসলামী থেকে নির্বাচিত সদস্যগণ হচ্ছেন-

মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী (পাবনা), মাওলানা আবদুস সুবহান (পাবনা), অধ্যাপক আবদুল্লাহিল কাফী (দিনাজপুর), আযিযুর রহমান চৌধুরী (দিনাজপুর), মিযানুর রহমান চৌধুরী (নিলফামারী), মাওলানা আবদুল আযিয (গাইবান্ধা), মুফতী আবদুস সাত্তার (বাগেরহাট), মিয়া গোলাম পারওয়ার (খুলনা), শাহ মুহাম্মাদ রুহুল কুদ্দুস (খুলনা), আবু সাঈদ মুহাম্মাদ শাহাদাত হোসেন (যশোর), মাওলানা আবদুল খালেক

www.pathagar.com

মন্ডল (সাতক্ষিরা), রিয়াছাত আলী বিশ্বাস (সাতক্ষিরা), গাজী নজরুল ইসলাম (সাতক্ষিরা), মাওলানা দেলাওয়ার হোসেন সাঈদী (পিরোজপুর), ফরিদুদ্দীন চৌধুরী (সিলেট), ডা. সৈয়দ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ তাহের (কুমিল্লা), শাহজাহান চৌধুরী (চট্টগ্রাম)।

সংসদের মহিলা আসনগুলো থেকে জামায়াতে ইসলামী ৪টি আসন লাভ করে। জামায়াতে ইসলামী থেকে নির্বাচিত মহিলা সদস্যগণ হচ্ছেন- ডা. আমেনা বেগম, শাহানারা বেগম, সুলতানা রাজিয়া ও রোকেয়া বেগম।

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে জামায়াতে ইসলামীর এটি পঞ্চম উপস্থিতি।

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া আমীরে জামায়াত মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীকে কৃষিমন্ত্রী এবং সেক্রেটারী জেনারেল আলী আহসান মুহাম্মাদ মুজাহিদকে সমাজকল্যাণমন্ত্রী নিযুক্ত করেন।

এই নির্বাচনে পরাজিত হয়ে আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা বেসামাল হয়ে পড়েন। সচেতন ভোটারগণ তাঁর সাজানো বাগান তছনছ করে দেওয়ায় তিনি ভীষণ ক্ষুব্ধ হন।

তিনি নির্বাচনের ফল প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি রাষ্ট্রপতি, কেয়ারটেকার সরকারপ্রধান, নির্বাচন কমিশন এবং প্রশাসনকে পক্ষপাতিত্ব করার অভিযোগে অভিযুক্ত করেন।

অথচ বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদ আওয়ামী লীগ সংসদ সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি ছিলেন। কেয়ারটেকার সরকার প্রধান বিচারপতি লতিফুর রহমান ছাত্র জীবনে বাম ছাত্র রাজনীতির সাথে যুক্ত ছিলেন। শেখ হাসিনার পরামর্শে প্রধান নির্বাচন কমিশনার নিযুক্ত হয়েছিলেন জনাব এম.এ.সাঈদ। তাঁর বিশ্বস্ত ব্যক্তি লে. জেনারেল হারুনুর রশীদই নির্বাচনকালে সেনাপ্রধান ছিলেন।

তিনি ঘোষণা করেন যে তাঁর দলের সদস্যগণ জাতীয় সংসদের সদস্য হিসেবে শপথ নেবেন না। অবশ্য পরে তিনি ও তাঁর দলের সদস্যগণ শপথ নেন। কিন্তু তাঁরা সংসদের অধিবেশনে যোগদান করা থেকে বিরত থাকেন।

চারদলীয় জোট সরকার কায়েম হওয়ার পর শেখ হাসিনা আমেরিকা সফরে গিয়ে দুইটি অপবাদ ব্যাপকভাবে প্রচার করেন।

www.pathagar.com

এক. চারদলীয় জোটের দুইটি দলই মৌলবাদী। যেই কারণে আফগানিস্তানের তালেবান সরকারকে উৎখাত করা জরুরী ছিলো, একই কারণে বাংলাদেশের জোট সরকার উৎখাত করা প্রয়োজন।

দুই. ইসলামপন্থীরা সাম্প্রদায়িক ও সন্ত্রাসী। তারা হিন্দুদের ওপর নির্যাতন চালায় এবং হিন্দুদের সম্পত্তি দখল করে। আর বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল এইসব কুকর্মে তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করে। অতএব জোট সরকার উৎখাত করা অত্যাবশ্যক।

সুখের বিষয়, আমেরিকা এবং ইউরোপের সরকারগুলো এই অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হয়নি। এই দেশে অবস্থানকারী তাদের রাষ্ট্রদূতগণ হিন্দুদের বা সংখ্যালঘুদের নির্যাতনের কোন সত্যতা খুঁজে পাননি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন দায়িত্বশীল ব্যক্তি বাংলাদেশ সফর করে এই দেশকে 'উদার মুসলিম রাষ্ট্র' বলে মন্তব্য করেছেন এবং এই দেশে বিরাজমান সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রশংসা করেছেন।

সংসদে না গেলেও আওয়ামী লীগ রাজপথে থেকে জোট সরকারের বিরুদ্ধে বিষোদগার করতে থাকে। দলটি জোট সরকারকে সাম্প্রদায়িক সরকার, মৌলবাদী সরকার ইত্যাদি বলতে থাকে। আওয়ামী লীগ জোট সরকার বাংলাদেশকে একটি ব্যর্থ রাষ্ট্রে পরিণত করেছে বলে অপপ্রচার চালাতে থাকে। এই অপপ্রচার কোন বিদেশী শক্তিকে বাংলাদেশে হস্তক্ষেপ করার জন্য আহ্বানেরই শামিল ছিলো।

উল্লেখ্য, এই সময় ভারতের বেশ কয়েকটি পত্রিকা এবং কয়েকজন কলামিস্ট আওয়ামী লীগের বক্তব্যের প্রতি জোরালো সমর্থন জানাতে থাকে।

'বাংলাদেশ সংখ্যালঘু সমিতি'-র অভিনন্দন

২০০১ সনের ১৩ই অকটোবর 'বাংলাদেশ সংখ্যালঘু সমিতি'-র একটি ডেলিগেশন জামায়াতে ইসলামী থেকে নিযুক্ত দুইজন মন্ত্রীকে অভিনন্দন জানাবার জন্য জামায়াতে ইসলামীর অফিসে আসে। এই ডেলিগেশনে ছিলেন সমিতির সম্মানিত সভাপতি এডভোকেট সমরেন্দ্র নাথ গোস্বামী,

www.pathagar.com

প্রধান উপদেষ্টা এডভোকেট মনোরঞ্জন দাস, সেক্রেটারী জেনারেল এডভোকেট গোবিন্দ চন্দ্র প্রামাণিক, সদস্য দিলীপ দাসগুপ্ত, এডভোকেট সুনীল বিশ্বাস, ডা. নির্মল চৌধুরী, শ্যামল চন্দ্র মজুমদার, দেবাশীষ শিকদার, আরাধন সরকার, শংকর মিত্র, এডভোকেট অং সুই থুই, সুকুমার রায়, নরেশ চন্দ্র সাহা, ইঞ্জিনিয়ার আশুতোষ ভৌমিক, এডভোকেট অশোক কুমার বিশ্বাস, এডভোকেট বিনয় কুমার পোদ্দার প্রমুখ।

অত্যন্ত আন্তরিকতাপূর্ণ পরিবেশে দীর্ঘক্ষণ আলাপ-আলোচনা হয়।

পল্টন ময়দানে জামায়াতে ইসলামী আয়োজিত 'জাতীয় উলামা সম্মেলন'

২০০৬ সনের ১১ই ফেব্রুয়ারি ঢাকাস্থ পল্টন ময়দানে জামায়াতে ইসলামী একটি জাতীয় উলামা সম্মেলনের আয়োজন করে। হাজার হাজার উলামা এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। এই সম্মেলনে আমীরে জামায়াত মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী একটি গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য প্রদান করেন। বক্তব্যে তিনি বলেন,

> "তথাকথিত ইসলামী জংগিবাদের নামে বাংলাদেশকে ধর্মীয় উগ্রবাদী, মৌলবাদীদের আখড়া প্রমাণ করে- এদেশের আলিম-উলামা এবং ইসলামের বিরুদ্ধে যেই জগণ্য ষড়যন্ত্র করা হয়েছিলো, তার একটি লক্ষ্য ছিলো ইসলামকে কুৎসিত রূপে মানুষের কাছে তুলে ধরা, আলিম-উলামা এবং ইসলামী দল ও প্রতিষ্ঠানকে উগ্রবাদী, জংগিবাদী হিসেবে চিহ্নিত করে ধ্বংস করা। প্রয়োজনে বিদেশী হস্তক্ষেপের অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি করা।"
>
> "আলহামদুলিল্লাহ, চারদলীয় জোট সরকার শক্ত হাতে এর মুকাবিলা করেছে। এই চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র মুকাবিলায় সরকারকে সবচেয়ে বেশি শক্তি যুগিয়েছেন এই দেশের উলামায়ে কিরাম। তাঁরা ঐক্যমতের ভিত্তিতে ঘোষণা করেছেন, ইসলামের সাথে জংগিবাদের কোন সম্পর্ক নেই। প্রতিটি মাসজিদ থেকে এই আওয়াজ তুলে ঘোষণা করা হয়েছে ইসলামের নাম ব্যবহার করে যারা বোমাবাজি করেছে তাদের সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই। দেশের ভেতরে বাইরে এই কথাটি তাঁরা প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সেই সাথে যারা ইসলামের দুশমনদের ক্রীড়নক হিসেবে ঐ জঘন্য কাজে ব্যবহৃত হচ্ছিলো তারা জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং মনস্তাত্বিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে। মাত্র দু'মাসের মধ্যে তাদের ইসলামের নামে বোমাবাজি কার্যক্রমের নেটওয়ার্ক ভেংগে পড়ে। তাদের এই জঘন্য তৎপরতা চালাবার আর কোন

www.pathagar.com

সুযোগ থাকে না। এই জন্য আমি বিশেষ করে বাংলাদেশের দলমত নির্বিশেষে সকল স্তরের উলামায়ে কিরামকে অভিনন্দন জানাই, কৃতজ্ঞতা জানাই।"

"আজকের এই সময়টি শুধু বাংলাদেশের নয়, দুনিয়াব্যাপী মুসলিম উম্মাহর জন্য একটি সংকটকাল, একটি দুঃসময়। দুনিয়াব্যাপী ইসলামের জাগরণ ঠেকানোর জন্য বিশ্ব জনমত বিভ্রান্ত করার লক্ষ্যে মুসলিমদের চির দুশমন জায়নবাদী ইহুদীগোষ্ঠী নিজেরাই জংগিবাদী প্রতিষ্ঠানের জন্ম দিয়েছে, লালন করছে, তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ব্যবহার করছে। আর তথ্য সন্ত্রাসের মাধ্যমে তাদের অপকর্ম, তাদের দোসরদের দায়দায়িত্ব ইসলামের উপর, ইসলামী সংগঠন, প্রতিষ্ঠান এবং আলিম-উলামার উপর চাপাবার অপকৌশল, অপচেষ্টা চালাচ্ছে।"

"ইসলামের সম্ভাবনা নষ্ট করার জন্য, ইসলামকে অসহিষ্ণু, উগ্রবাদী, সন্ত্রাসী, গণতন্ত্রবিরোধী একটি আদর্শ হিসেবে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করার দুনিয়াব্যাপী যেই জঘন্য ষড়যন্ত্র চলছে বাংলাদেশে এটা আমরা ব্যর্থ করতে সক্ষম হয়েছি। কিন্তু তারা এক ফ্রন্টে বিজয়ী হতে না পারলে আরো ফ্রন্ট খুলতে পারে। অতএব, ভবিষ্যতে যাতে ইসলামের নাম নিয়ে বাংলাদেশের মাটিতে কোন মহল এই ধরনের ন্যাক্কারজনক ভূমিকা পালন করতে না পারে, সে জন্য মুসলিমদের অভিভাবক হিসেবে, মুসলিম উম্মাহর গার্ডিয়ান হিসেবে উলামায়ে কিরাম জনগণকে, দেশবাসীকে সতর্ক সাবধান হওয়ার জন্য, সচেতন রাখার জন্য আরো জোরালো ভূমিকা পালন করবেন, এটাই সময়ের দাবি।"

"দুনিয়াব্যাপী জিহাদ সম্পর্কে কিছু ব্যক্তির অপব্যাখ্যাকে কেন্দ্র করে বিভ্রান্তি সৃষ্টির একটি সুযোগ তারা পেয়েছে। জিহাদ মানেই যুদ্ধ নয়, জিহাদ একটি ব্যাপক বিষয়। ইসলাম কায়েমের জন্য, মানব সমাজে শান্তি, কল্যাণ, ন্যায়-ইনসাফ প্রতিষ্ঠার জন্য; অন্যায় অনাচার, দুরাচার পাপাচারমুক্ত এবং শোষণমুক্ত সমাজ গড়ার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টার নাম জিহাদ। এক শ্রেণীর বিভ্রান্ত ব্যক্তি, অল্প শিক্ষিত-অশিক্ষিত ব্যক্তি, জিহাদকে কিতাল নামে অভিহিত করছে। জিহাদ আর কিতালের পার্থক্য উলামায়ে কিরামকে মানুষের কাছে পরিষ্কার করতে হবে।"

"ইসলামের ব্যাপারে নারী সমাজকেও বিভ্রান্ত করা হচ্ছে। নারী অধিকার ইত্যাদি নাকি ইসলামে নেই। ইসলামের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে হলে আধুনিক শিক্ষিত ব্যক্তিদের মন থেকে ইসলামের ব্যাপারে ভয়ভীতি দূর করার জন্য যেমন যুক্তিগ্রাহ্য বক্তব্য দিতে হবে, তেমনি এদেশের নারী সমাজের কাছেও ইসলামের সঠিক শিক্ষা, সঠিক ব্যাখ্যা, সঠিক পরিচয় তুলে ধরতে হবে। নারী সমাজকে প্রকৃত মর্যাদা ইসলামই দিয়েছে। আজকের দিনে নারীর

www.pathagar.com

ক্ষমতায়নের নামে, নারী অধিকারের নামে দুনিয়াব্যাপী নারী সমাজকে এক শ্রেণীর মতলববাজের ভোগের সামগ্রী হিসেবে ব্যবহারের চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র চলছে। তা থেকে মুক্তি দেওয়ার একমাত্র উপায় ইসলাম, ইসলাম এবং ইসলাম। মানুষের যেই অধিকার ইসলাম দিয়েছে, বিশেষ করে নারী সমাজকে দিয়েছে, উলামায়ে কিরামের বক্তব্যে এই বিষয়টিও আসতে হবে।"

"এই উলামা সম্মেলন সার্থক ও সফল হওয়ায় মহান আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের দরবারে শুকরিয়া জানাই, আপনাদের সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। এই সম্মেলনকে কেন্দ্র করে কালেমায় বিশ্বাসী সকল মানুষের ঐক্য গড়ে উঠুক, ইখলাছের সাথে দীনের জন্য যাঁরা কাজ করছেন এই জাতীয় উলামা সম্মেলন তাদের সকলের সাথে সংহতির একটি মাইলফলক হোক, এই আশাবাদ ব্যক্ত করে, সকল শ্রেণীর উলামায়ে কিরামের কাছে আমার মনের এই আকুতি পৌঁছে দেওয়ার জন্য দায়িত্ব গ্রহণের জন্য আপনাদের প্রতি আবেদন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।"

আওয়ামী লীগের অপরাজনীতির কারণে অনিশ্চিত হয়ে পড়ে নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন

নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ঘনিয়ে আসতে থাকে। আওয়ামী লীগ চার দলীয় জোট সরকারের পতন ঘটাবার জন্য বহু চেষ্টা করেও সফল হতে পারেনি।

আওয়ামী লীগ জোট বেশ কয়েকটি দাবি নিয়ে মাঠ গরম করার চেষ্টা করে। তাদের একটি দাবি ছিলো সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি কে. এম. হাসানকে কেয়ারটেকার সরকারপ্রধান করা চলবে না। বিশ বছর পূর্বে আইনজীবী থাকা কালে তিনি নাকি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের সাথে যুক্ত ছিলেন।

তাদের আরেকটি বড়ো দাবি ছিলো প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি এম. এ. আযিযসহ নির্বাচন কমিশনের সকল কমিশনারকে পদত্যাগ করিয়ে নতুন নির্বাচন কমিশন গঠন করতে হবে।

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া জাতীয় সংসদে ভাষণ দিতে গিয়ে উত্থাপিত ইস্যুগুলো নিয়ে সরকার ও বিরোধী দলের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করে সংলাপ অনুষ্ঠানের আহ্বান জানান। আওয়ামী লীগ ৫ সদস্যের একটি

www.pathagar.com

তালিকা বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের মহাসচিবের নিকট পাঠায়। চার দলের পক্ষ থেকে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল থেকে দুইজন এবং বাকি তিন শরিক দল থেকে একজন করে নাম দেয়া হয়। আওয়ামী লীগ থেকে বলা হলো, কমিটিতে জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ঐক্যজোটের কেউ থাকলে তারা সংলাপে বসবে না। এটি ছিলো আওয়ামী লীগের একটি অযৌক্তিক দাবি। তারপর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবদুল জলিল এবং বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের মহাসচিব আবদুল মান্নান ভূঁইয়ার মধ্যে সংলাপ চলে। কিন্তু প্রধান উপদেষ্টা ও নির্বাচন কমিশন বিষয়ে মতানৈক্যের কারণে দুই সপ্তাহের দীর্ঘ সংলাপ ব্যর্থ হয়ে যায়।

তখনকার রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে তদানীন্তন সেনাপ্রধান জেনারেল মইন ইউ আহমেদের কিছু বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। এই লেখায় তাঁর বক্তব্যের কিছু অংশ উদ্ধৃত করা হচ্ছে।

> "মূলত ২৩ অকটোবর, ২০০৬ তারিখই ছিলো জোট সরকারের শেষ কার্যদিবস। কেননা এরপর পবিত্র ঈদ-উল-ফিতরের ছুটি। ছুটি শেষে প্রথম কর্মদিবস ২৮ অকটোবর, ২০০৬ তারিখ সরকারের শেষ দিন। এদিনকে সামনে রেখে দু'দলই মাঠ দখলে রাখার অভিপ্রায়ে শক্তি প্রদর্শনে তৎপর হলে সারাদেশ জুড়ে উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠার এক ধরনের ভীতি ছড়িয়ে পড়ে। ২৭ অকটোবর, ২০০৬ তারিখ সন্ধ্যায় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া জাতির উদ্দেশ্যে দেয়া ভাষণে সংবিধান সমুন্নত রেখে সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচনের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। ভাষণ শেষ হতেই চারদিকে হামলা, ভাংচুর আর লুঠতরাজের সংবাদ আসতে থাকলো। চট্টগ্রামে ২৯ অকটোবর থেকে লাগাতার হরতালের কর্মসূচি ঘোষণা করা হলো। ঢাকার রাজপথ দখলে দুই দলের মারমুখী কর্মীরা থেকে থেকে সংঘর্ষে লিপ্ত হলো।
>
> এমতাবস্থায় দেশের প্রতি গভীর মমত্ব বোধ দেখিয়ে সাবেক প্রধান বিচারপতি কে.এম.হাসান প্রধান উপদেষ্টার পদ গ্রহণে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন, "কোনো বিশেষ মহল বা ব্যক্তি বিশেষের দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ ও এদেশের নাগরিকদের স্বার্থের কথা ভেবেই আমি এ সিদ্ধান্ত নিয়েছি।" তাঁর এ সিদ্ধান্ত তাৎক্ষণিকভাবে দেশকে গৃহযুদ্ধের হাত থেকে রক্ষা করলেও সাংবিধানিক সংকট তখন শুরু হয়েছে মাত্র।[৬৪]

উল্লেখ্য ২৮শে অকটোবর ২০০৬ তারিখে বাইতুল মুকাররামের উত্তর গেটে

---

৬৪. জেনারেল মইন ইউ আহমেদ, শান্তির স্বপ্নে, পৃষ্ঠা-৩১৩।

www.pathagar.com

জামায়াতে ইসলামীর পূর্ব ঘোষিত সমাবেশের আয়োজন চলছিলো। সমাবেশ শুরু হওয়ার কথা বিকেল তিনটায়। দুপুরের আগেই আওয়ামী লীগের লগি বৈঠাধারীরা জামায়াতে ইসলামীর স্বেচ্ছাসেবকদের ওপর হামলা চালায়। সমাবেশে আসার পথে লোকদেরকে লগি-বৈঠা দিয়ে পিটাতে থাকে। কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ সভাস্থলে পৌঁছার পরও হামলাকারীগণ হামলা চালাতে থাকে। জামায়াতে ইসলামীর স্বেচ্ছাসেবকগণ দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত হামলাকারীদেরকে প্রতিহত করে চলেন। হামলাকারীদের লগি-বৈঠার আঘাতে ৬ জন স্বেচ্ছাসেবক শাহাদাত বরণ করেন। আহত হন শত শত জন। শাহাদাত বরণকারীগণ হচ্ছেন– হুসাইন মুহাম্মাদ মুজাহিদুল ইসলাম, হাফিয গোলাম কিবরিয়া শিপন, সাইফুল্লাহ মুহাম্মাদ মাসুম, মুহাম্মাদ হাবিবুর রহমান, মুহাম্মাদ জসিম (১) এবং মুহাম্মাদ জসিম (২)।

হত্যার পর হামলাকারীরা লাসের ওপর নেচে নেচে উল্লাস করতে থাকে। সন্ত্রাসীরা এমন জঘণ্য তান্ডব চালালো কিন্তু পুলিশকে কোন ভূমিকা পালন করতে দেখা গেলো না।

"২৮ অকটোবর, ২০০৬ তারিখে পুরো দেশ যেন রণক্ষেত্রে পরিণত হলো। ঢাকা, চট্টগ্রামসহ সারাদেশই সেদিন বস্তুত অচল হয়ে পড়েছিলো। বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষে দেশের বিভিন্ন জায়গায় ঝরে গিয়েছিলো অনেকগুলো তাজা প্রাণ। শুধু রাজনৈতিক বিশ্বাসের কারণে মানুষ এতো হিংস্র হতে পারে, নিজ চোখে না দেখলে তা বিশ্বাস করা কঠিন। প্রকাশ্য দিবালোকে বিভিন্ন চ্যানেলে টেলিভিশন ক্যামেরার সামনে এসব নৃশংস ঘটনা ঘটলো। রাতে নির্মম এসব হত্যাকাণ্ডের দৃশ্য টেলিভিশনের পর্দায় দেখে আমি অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছি।"

"সাবেক প্রধান বিচারপতি কে.এম. হাসান প্রধান উপদেষ্টার পদ গ্রহণে অসম্মতি জানানোর সাথে সাথে বিচারপতি হামিদুল হকও সেই পথে হাঁটলেন। বিচারপতি এম.এ. আজিজও একটি সাংবিধানিক পদে কর্মরত থাকায় অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিদের ভেতর থেকে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগের সংবিধাননির্দেশিত আর কোনো উপায় থাকলো না।"

"১৪ দলীয় জোট বিচারপতি মাহমুদুল হকের ব্যাপারে আগ্রহী হলে চার দলীয় জোট তাদের অনিচ্ছা প্রকাশ করে।"

"প্রেসিডেন্ট প্রধান উপদেষ্টা ইস্যুতে ২৮ অকটোবর, ২০০৬ তারিখ বিকেলে সর্বদলীয় বৈঠক আহ্বান করেন। সেখানেও বিষয়টি সুরাহা না হলে মহামান্য প্রেসিডেন্ট সংবিধানের ৫৮ (গ) ৬-এর অনুচ্ছেদ মোতাবিক স্বীয় দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসেবে নির্দলীয় তত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব

www.pathagar.com

পালনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। প্রেসিডেন্টের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের প্রস্তাব চার দলীয় জোট স্বাগত জানালেও ১৪ দলীয় জোট সংবিধানপ্রদত্ত সকল পন্থা প্রয়োগ না করেই সর্বশেষ পন্থা অনুসরণ করায় বিষয়টির সমালোচনা করে এবং এ ব্যাপারে তাদের অসম্মতি জানায়।"

"২৯ অকটোবর, ২০০৬ তারিখ বিকেলে বঙ্গভবনে মহামান্য প্রেসিডেন্ট প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে চারদলীয় জোট উপস্থিত থাকলেও ১৪ দলীয় জোট অনুপস্থিত ছিলো।"

"৩১ অকটোবর, ২০০৬ তারিখ সন্ধ্যায় দশজন উপদেষ্টাকে নিয়ে উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হলো। এ দশজন উপদেষ্টা হলেন বিচারপতি মো. ফজলুল হক, ড. আকবর আলী খান, লে. জেনারেল (অব.) হাসান মশহুদ চৌধুরী, সি.এম.শফি সামি, ধীরাজ কুমার নাথ, এম. আজিজুল হক, মাহবুবুল আলম, ডা. সুফিয়া রহমান, বেগম ইয়াসমীন মুরশেদ ও বেগম সুলতানা কামাল।"

"দেশকে স্থিতিশীল করে বিশ্বাসযোগ্য একটি সুষ্ঠু নির্বাচন উপহার দিতে নতুন তত্বাবধায়ক সরকার কাজ শুরু করলো। ২ নবেম্বর ২০০৬ তারিখ উপদেষ্টা পরিষদ নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো। প্রশাসনেও অনেক রদবদল করা হলো। র‍্যাবের মহাপরিচালকসহ অনেকের চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ বাতিল করা হলো। পুলিশের উচ্চ পর্যায়ে রদবদল করা হলো। নতুন আইজি ও ডিএমপি কমিশনার হিসেবে যথাক্রমে মো. খোদাবকস ও এ.বি.এম. বজলুর রহমানকে নিয়োগ দেওয়া হলো। কিন্তু এসব কার্যক্রম আন্দোলনকারী দলসমূহকে আশ্বস্ত করতে পারলো না।"[৬৫]

"সরকারের উচ্চ পর্যায়ে সমন্বয়হীনতা ও টানাপোড়েনের চূড়ান্ত বহি:প্রকাশ হিসেবে সরকারের চার উপদেষ্টা লে. জেনারেল (অব.) হাসান মশহুদ, ড. আকবর আলী খান, সি.এম. শফি সামি এবং বেগম সুলতানা কামাল ১১ ডিসেম্বর, ২০০৬ তারিখে একযোগে পদত্যাগ করেন।"

"তত্বাবধায়ক সরকার অতি দ্রুতই তাদের শূন্যস্থান পূরণে উদ্যোগী হয়। ১২ ডিসেম্বর, ২০০৬ তারিখে ড. শোয়েব আহমেদ, প্রফেসর মইনউদ্দিন খান, মেজর জেনারেল রুহুল আমিন চৌধুরী এবং শফিকুল হক চৌধুরী নতুন উপদেষ্টা হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। উপদেষ্টা পরিষদের হঠাৎ এ পরিবর্তনের কারণে ২২ জানুয়ারির নির্বাচনের ব্যাপারে ধীরে ধীরে শঙ্কা বাড়তে থাকে। ১৪ দলীয় জোট তখনো নির্বাচনের 'লেভেল প্লেইং ফিল্ড" তৈরি হয়নি বলে চাপ অব্যাহত রাখে, অন্য দিকে চারদলীয় জোট নির্ধারিত সময়ে নির্বাচনের জন্য চাপ সৃষ্টি করে।"

"১৮ ডিসেম্বর, ২০০৬ তারিখে পল্টন ময়দানে ১৪ দলের সমাবেশে জাতীয়

---

৬৫. জেনারেল মইন ইউ আহমেদ, শান্তির স্বপ্নে, পৃষ্ঠা : ৩১৩-৩১৫।

www.pathagar.com

পার্টি ও এল.ডি.পি (ডা. বদরুদ্দোজা চৌধুরী) যোগ দিলে ১৪ দলের পরিকল্পিত নির্বাচনী মহাজোট গঠিত হয়।

২০ ডিসেম্বর রাজনৈতিক দলের দাবি অনুযায়ী ২২ জানুয়ারি নির্বাচনের তারিখ সঠিক রেখে সকল দলের অংশগ্রহণের সুবিধার্থে মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় পিছিয়ে দেয়া হয়।"

"৩ জানুয়ারি, ২০০৭ তারিখে হোটেল শেরাটনে জনাকীর্ণ এক সংবাদসম্মেলনে মহাজোট প্রেসিডেন্টের প্রধান উপদেষ্টার পদ আঁকড়ে থাকা, ভোটার লিস্টের ত্রুটি ও 'লেভেল প্লেইং ফিল্ড' তৈরি হয়নি বলে ২২ জানুয়ারি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে না বলে ঘোষণা দেয়। তারা ৭ ও ৮ জানুয়ারি সারাদেশে অবরোধ কর্মসূচি ঘোষণা করে তাদের সকল প্রার্থীকে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের নির্দেশ দেয়। ফলে এতোদিন ধরে চলমান সমঝোতা প্রক্রিয়া এবং দেশকে ভয়াবহ এক সংঘর্ষ থেকে বাঁচানোর যে চেষ্টা চলছিলো তা এক মুহূর্তে ফিকে হয়ে যায়।"

"দিনে দিনে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি তখন চূড়ান্ত সংঘর্ষের দিকে মোড় নিচ্ছিলো। ৭-৯ জানুয়ারি সারাদেশে অবরোধ পালিত হলো। ভাংচুর, বিক্ষোভ, মিছিল আর বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষে পুরো দেশ অচল হয়ে পড়লো।

মহাজোট ঘোষণা করলো, সরকার যদি নির্বাচনী কর্মকাণ্ড নিয়ে এগিয়ে যায় তাহলে ১৪ জানুয়ারি থেকে ১৮ জানুয়ারি পর্যন্ত সারাদেশে অবরোধ ও বঙ্গভবন ঘেরাও কর্মসূচি পালিত হবে। ২১ ও ২২ জানুয়ারি দেশব্যাপী সর্বাত্মক হরতাল। তাতেও কাজ না হলে এরপর থেকে শুরু হবে লাগাতার কর্মসূচি। মহাজোটের এরকম কঠোর হুঁশিয়ারি সত্বেও সরকার তার অবস্থানে অনড় থাকলো। সংবিধানে উল্লিখিত নব্বই দিনের মধ্যে নির্বাচনের বাধ্যবাধকতা অবলম্বন করে চারদলীয় জোটও নির্বাচনের পক্ষে অনড় থাকলো।"

"এসময় ক্ষমতাধর কয়েকটি দেশের প্রতিনিধি আমার সাথে দেখা করে জানালো, সব দলের অংশগ্রহণ ব্যতিরেকে নির্বাচন অনুষ্ঠানে সেনাবাহিনী সহায়তা করলে জাতিসংঘ শান্তি মিশন থেকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে প্রত্যাহারের জন্য তারা জাতিসংঘকে অনুরোধ করবে। প্রচ্ছন্ন এ হুমকির অবশ্যম্ভাবী পরিণতি অনুধাবন করতে আমার অসুবিধা হলো না।"

"(১১ জানুয়ারি) প্রথমে খবর ও পরে জাতিসংঘ সদর দপ্তর থেকে টেলিফোন পেলাম। আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল মি. গুইহিনো কোনোরকম ভনিতা না করেই জানালো, সব দলের অংশগ্রহণ ব্যতীত নির্বাচন তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। এরকম একটি নির্বাচন অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী যদি ভূমিকা রাখে তাহলে জাতিসংঘ শান্তি মিশন থেকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে প্রত্যাহার করার বিষয়টি গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করা হবে।"

www.pathagar.com

"দেশের সার্বিক পরিস্থিতি ও জাতিসংঘের মনোভাব নিয়ে আমি নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনী প্রধানের সাথেও কথা বললাম। তারাও একমত হলো, রাষ্ট্রের এ পরিস্থিতি মহামান্য প্রেসিডেন্টকে অবগত করে তাঁর দিক-নির্দেশনা চাওয়া প্রয়োজন। আমরা প্রসিডেন্টের সাথে কথা বলার জন্য সময় চাইলাম।"...

"দীর্ঘ নীরবতা ভেঙে প্রেসিডেন্ট এক সময় সারা দেশে জরুরি অবস্থা জারির পক্ষে মত দিলেন। সিদ্ধান্ত হলো বর্তমান উপদেষ্টা পরিষদ তিনি ভেঙে দেবেন এবং প্রধান উপদেষ্টার পদ থেকে পদত্যাগ করবেন। দেশের আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতির আশঙ্কায় রাত এগারোটা থেকে সান্ধ্য আইন জারি করা হবে। প্রেসিডেন্ট রাতে জাতির উদ্দেশ্যে জরুরি অবস্থার প্রেক্ষাপট বর্ণনা করে ভাষণ দেবেন।"

"মহামান্য রাষ্ট্রপতি সম্ভাব্য প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে ড. ইউনুস অথবা ড. ফখরুদ্দিনের নাম প্রস্তাব করেছিলেন। ... কিন্তু তিনি (ড. ইউনুস) প্রধান উপদেষ্টা হতে আগ্রহী হলেন না।"

"ড. ইউনুস অস্বীকৃতি জানানোর পর ড. ফখরুদ্দিনের নাম উঠে আসে। মেজর জেনারেল মাসুদউদ্দিন চৌধুরী ড. ফখরুদ্দিনের বাসায় যান এবং রাষ্ট্রপতির পক্ষ থেকে প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব নেয়ার জন্য তাঁকে অনুরোধ করেন।... প্রায় আধঘণ্টা পর তাঁর স্ত্রী ফোন করে তাঁর সম্মতির কথা জানালেন।"[৬৬]

অসাংবিধানিক কেয়ারটেকার সরকার

রাষ্ট্রপতি ড. ইয়াজউদ্দীন আহমদ ২০০৭ সনের ১১ই জানুয়ারি জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেন এবং নির্বাচন মুলতবী করেন।

২০০৭ সনের ১২ই জানুয়ারি বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্ণর ড. ফখরুদ্দিন আহমদ প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন।

অন্যান্য উপদেষ্টাগণ ১৩, ১৬ ও ১৮ তারিখে শপথ গ্রহণ করেন। অন্যান্য উপদেষ্টা হচ্ছেন– ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন, ড. এ. বি. মির্জা আজিজুল ইসলাম, মে. জে. এম. এ. মতিন বিপি (অব.), তপন চৌধুরী, গীতিআরা সাফিয়া চৌধুরী, ড. ইফতেখার আহমদ চৌধুরী, আইয়ূব কাদরী, মে. জে. ডা. এ. এস. এম. মতিউর রহমান (অব.), মো. আনোয়ারুল ইকবাল, ড. চৌধুরী সাজ্জাদুল করিম, ড. এ. এম. এম. শওকত আলী, এ. এফ. হাসান

---

৬৬. জেনারেল মইন ইউ আহমেদ, শান্তির স্বপ্নে, পৃষ্ঠা- ৩১৮, ৩১৯, ৩২১, ৩২২, ৩২৩, ৩২৭, ৩২৮, ৩২৯।

www.pathagar.com

আরিফ, মে. জে. গোলাম কাদের (অব.), বেগম রাশেদা কে. চৌধুরী, হোসেন জিল্লুর রহমান, রাজা দেবাশীষ রায়, ব্রি. জে. এম. এ. মালেক (অব.), অধ্যাপক ম. তামিম, মাহবুব জামিল ও মানিক লাল সমদ্দার।

এই সরকার সংবিধানসম্মত সরকার ছিলো না। মহামান্য রাষ্ট্রপতির সমর্থন এবং সশস্ত্রবাহিনীর পৃষ্ঠপোষকতাই ছিলো সরকারের পক্ষে sanction বা অনুমোদন।

সংবিধান অনুযায়ী কেয়ারটেকার সরকারের প্রধান দায়িত্ব ৯০ দিনের মধ্যে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য নির্বাচন কমিশনকে সহযোগিতা প্রদান।

এই সরকার অনেকগুলো সংস্কারমূলক কাজে হাত দেয়। সংবিধান কেয়ারটেকার সরকারকে এইসব কাজের দায়িত্ব দেয়নি। পরবর্তী জাতীয় সংসদ এই সরকারের কার্যাবলিকে বৈধতা দিলে তবেই এই সরকার সংবিধানসম্মত সরকার বলে গণ্য হবে।

> "১৪ জানুয়ারি, ২০০৭ তারিখে উপদেষ্টা পষিদের প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো। বৈঠকের পর ঘোষণা করা হলো তত্বাবধায়ক সরকার নির্ভুল ভোটার তালিকা ও স্বচ্ছ বাক্সে নির্বাচন করার মতো গুরুত্বপূর্ণ কিছু সিদ্ধান্ত নিয়েছে। নতুন তত্বাবধায়ক সরকারের প্রথম বৈঠকেই দেশকে একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচন উপহার দিতে তাদের দৃঢ় সংকল্প দেশবাসীকে আশ্বস্ত করলো। একটি সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজন তত্বাবধায়ক সরকারের একমাত্র কাজ হলেও নির্বাচনের পরিবেশ সৃষ্টি পূর্বশর্ত হিসেবে অনেকগুলো কাজ সরকারের সামনে এসে পড়লো। এর ভেতরে দুর্নীতি দমন ও দুর্নীতিবাজদের প্রচলিত আইনে বিচারের সম্মুখীন করা ছিলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।"
>
> "নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ দাবি ছিলো দীর্ঘ দিনের। অতীতের সরকার তাদের নির্বাচনী অঙ্গীকারে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণের প্রতিশ্রুতি দিলেও বিভিন্নভাবে তা বিলম্বিত করা হয়েছে।...
>
> সর্বশেষে ১০ জানুয়ারি ২০০৭ সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ আলাদা করার জন্য সাত দিন সময় দিয়ে রুল জারি করে। নতুন তত্বাবধায়ক সরকার এ সময় শেষ হওয়ার আগেই প্রয়োজনীয় প্রজ্ঞাপন জারি করে নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে আলাদা করার ঘোষণা দিয়ে চূড়ান্ত প্রক্রিয়ার সূচনা করে। ফলে ১ নভেম্বর, ২০০৭ তারিখে বিচার বিভাগ আনুষ্ঠানিকভাবে নির্বাহী বিভাগ থেকে আলাদা হয়ে যায়।"[৬৭]

---

৬৭. জেনারেল মইন ইউ আহমেদ, শান্তির স্বপ্নে, পৃষ্ঠা- ৩৩৩, ৩৩৪

www.pathagar.com

নতুন নির্বাচন কমিশন গঠন

২০০৭ সনের ৫ই ফেব্রুয়ারি সাবেক সচিব ড. এ.টি.এম. শামসুল হুদা প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং সাবেক যুগ্ম সচিব ছহুল হোসেন নির্বাচন কমিশনার নিযুক্ত হন। ১৪ই ফেব্রুয়ারি নির্বাচন কমিশনের অন্তর্ভুক্ত হন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) এম. সাখাওয়াত হোসেন।

২০০৭ সনের ৫ই এপ্রিল নির্বাচন কমিশন নির্বাচন আইন সংস্কার বিষয়ে খসড়া সুপারিশমালা প্রকাশ করে।

অতপর জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকবৃন্দ, সুশীল সমাজ এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের সাথে মত বিনিময়ের উদ্যোগ গ্রহণ করে।

'মাইনাস টু ফর্মুলা' বাস্তবায়ন প্রয়াস

অসাংবিধানিক কেয়ারটেকার সরকার ক্ষমতা গ্রহণের দুই মাস পর ২০০৭ সনের ১৫ই মার্চ শেখ হাসিনা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশ্যে ঢাকা ছাড়েন এবং এপ্রিল মাসের ভেতরে দেশে ফিরবেন বলে জানান।

২০০৭ সনের ১৮ই এপ্রিল সরকার একটি প্রেসনোট জারি করে তাঁর দেশে ফেরার পথে বাধা সৃষ্টি করে। শেখ হাসিন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে লন্ডন এসে পৌঁছেন। ব্রিটিশ ওয়ারওয়েজের কনফার্মড টিকিট থাকা সত্বেও তিনি হিথ্রো বিমান বন্দরে বোডিং পাস পাননি। শেখ হাসিনার দেশের ফেরার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে প্রদত্ত প্রেসনোটে বলা হয় :

> "নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে সরকার অবগত হয়েছে যে, যুক্তরাষ্ট সফররত আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা ২৩ এপ্রিল, ২০০৭ তারিখে দেশে প্রত্যাবর্তন করতে পারেন। উল্লেখ্য, সাম্প্রতিক অতীতে তাঁর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের দায়িত্বহীন লাগাতার আন্দোলন ও কর্মকাণ্ডের কারণে সৃষ্ট অরাজক পরিস্থিতিতে দেশের জনশৃংখলা বিপর্যস্ত এবং নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক জীবন বিপন্ন হয়ে পড়ে এবং ফলশ্রুতিতে অনিবার্যভাবেই জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতে হয়েছে। সম্প্রতি তিনি বিদেশে অবস্থানকালেও বিভিন্ন সভা সমাবেশ এবং দেশি ও আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় প্রদত্ত বক্তব্যের মাধ্যমে বর্তমান তত্বাবধায়ক সরকার ও আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী সম্পর্কে বিভিন্ন উসকানি ও বিদ্বেষমূলক বক্তব্য রেখেছেন। এমতাবস্থায় শেখ হাসিনা এ সময় দেশে প্রত্যাবর্তন করলে আগের ন্যায়

www.pathagar.com

উসকানিমূলক বক্তব্য প্রদান এবং জনশৃংখলাবিরোধী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে জনমনে বিদ্বেষ ও বিভ্রান্তি সৃষ্টির প্রয়াস চালাতে পারেন। এতে দেশের আইনশৃংখলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটার এবং বিরাজমান স্থিতিশীলতা বিঘ্নিত এবং জননিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক জীবন বিপন্ন হওয়ার আশংকা রয়েছে।

আরও উল্লেখ্য যে, শেখ হাসিনা নিজেও তাঁর ব্যক্তিগত নিরাপত্তার বিষয়ে উদ্বিগ্ন এবং তাঁর দলের মাধ্যমে সরকারের কাছে বিশেষ নিরাপত্তা সুবিধার আবেদন করেছেন। উল্লিখিত কারণে সরকার জনস্বার্থে বর্তমান অবস্থায় শেখ হাসিনার দেশে প্রত্যাবর্তন বিষয়ে বিশেষ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। গৃহীত এই ব্যবস্থা সাময়িক।"[৬৮]

২০০৭ সনের ২৪শে এপ্রিল এই নিষেধাজ্ঞা চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে রিট দাখিল করা হয়।

২৫শে এপ্রিল সরকার নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নেয়।

২০০৭ সনের ৭ই মে শেখ হাসিনা দেশে ফিরে আসেন।

২০০৭ সনের ১৬ই জুলাই অসাংবিধানিক কেয়ারটেকার সরকার রাজধানীর গুলশান থানায় দায়েরকৃত তিন কোটি টাকার একটি চাঁদাবাজির মামলায় শেখ হাসিনাকে গ্রেফতার করে। আদালত তাঁর জামিনের আবেদন নামঞ্জুর করে তাঁকে সংসদভবন এলাকায় স্থাপিত বিশেষ সাবজেলে প্রেরণ করে।

শেখ হাসিনার মুক্তি দাবি করে বেগম খালেদা জিয়া একটি বিবৃতি দেন। বিবৃতিতে তিনি বলেন,

"শেখ হাসিনার সাম্প্রতিক গ্রেফতার এবং তাঁকে আদালতে আনা নেওয়ার সময় তাঁর মর্যাদা রক্ষায় প্রশাসনিক ব্যর্থতা আমাকে বেদনাহত করেছে। একটি দলের প্রধান, একজন জাতীয় নেতার কন্যা, সাবেক একজন প্রধানমন্ত্রী, একজন প্রবীণ নারী, সর্বোপরি দেশের একজন সম্মানিত নাগরিক হিসাবে আদালত প্রাঙ্গনে তাঁকে যে ধরনের অসম্মানজনক ও অশোভন পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে হয়েছে তাতে আমি গভীরভাবে মর্মাহত। আমার ধারণা, বিবেকবান নাগরিকদের অনুভূতি এতে আহত হয়েছে এবং দেশে বিদেশে ক্ষুণ্ন হয়েছে সরকারের ভাবমর্যাদা। সরকার আরও সচেতন থাকলে এ ধরনের পরিস্থিতি এড়ানো সম্ভব হতো।

শেখ হাসিনা বিভিন্ন সময়ে আমাদের সরকার ও দলের সমালোচনার গণ্ডি পেরিয়ে আমাদের পরিবার এবং ব্যক্তিগতভাবে আমার বিরুদ্ধেও নানান রকম অযৌক্তিক, অরাজনৈতিক ও অসৌজন্যমূলক উক্তি করেছেন। তাতে আমি

---

৬৮. দৈনিক প্রথম আলো, ১৯শে এপ্রিল, ২০০৭।

www.pathagar.com

যেমন কষ্ট পেয়েছি, ঠিক একই রকম দুঃখবোধ করছি তাঁকে অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণের শিকার হতে দেখে। মানুষ হিসেবে আমরা কেউই ভুল-ভ্রান্তি ও ত্রুটিবিচ্যুতির ঊর্ধ্বে নই। সমস্যাজর্জরিত একটি দেশে যিনি যত বড় দায়িত্ব পালন করেন তাঁর তত বেশি ভুলত্রুটির আশংকা থাকে। তাছাড়া এদেশে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যর্থতার পাশাপাশি রাজনীতিকদের সাফল্যকেও খাটো করে দেখা উচিত নয়। তবে আমরা কেউ আইনের ঊর্ধ্বে নই। ইচ্ছাকৃত আইনভঙ্গ এবং দেশ ও সমাজের জন্য ক্ষতিকর তৎপরতায় লিপ্ত হলে সবার বিরুদ্ধেই আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া যায়। কিন্তু এক্ষেত্রে দুটি বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এক. অভিযুক্ত মাত্রই অপরাধী নয়। কাজেই তাদের যথাযথ সম্মান ও মর্যাদা সুরক্ষা করা সরকার ও প্রশাসনের কর্তব্য। এবং দুই. সকল অভিযুক্ত যাতে সন্দেহাতীতভাবে ন্যায়বিচার পায় এবং তাদের মানবাধিকার পুরোপুরি বজায় থাকে সেই লক্ষ্যে আত্মপক্ষ সমর্থন ও আইনগত সহায়ত লাভের সুযোগের পরিপূর্ণ নিশ্চয়তা থাকতে হবে। শেখ হাসিনার ক্ষেত্রেও আমি এ দুটি বিষয়ে নজর রাখার আহ্বান জানাচ্ছি।...."[৬৯]

২০০৭ সনের ৩ রা সেপ্টেম্বর গ্লোবাল এগ্রো ট্রেড কম্পেনি (গ্যাটকো) মামলায় বেগম খালেদা জিয়া এবং তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র আরাফাত রহমানকে গ্রেফতার করা হয়। এই মামলার অভিযোগে বলা হয় প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে বেগম খালেদা জিয়া চট্টগ্রাম বন্দর ও কমলাপুর কন্টেইনার ডেপোর কাজ পাইয়ে দিতে উক্ত কম্পেনিকে সহায়তা করেন। এতে সরকারের এক হাজার কোটি টাকা ক্ষতি হয়। চিফ মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে অনুমতি নিয়ে বেগম খালেদা জিয়া একটি বক্তব্য দেন। বক্তব্যে তিনি বলেন,

"বাংলাদেশকে নিয়ে বিরাট ষড়যন্ত্র চলছে। এ ষড়যন্ত্রের অংশ হিসাবেই বিএনপি ভাঙ্গার ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে এবং আমাকে রাজনীতি থেকে সরিয়ে দেয়ার অপচেষ্টা করা হচ্ছে। ইতোপূর্বে আমাকে দেশ থেকে বাইরে পাঠিয়ে দেবার ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল। এখন আমাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আমি বাইরে চলে গেলে আজ আমাকে এভাবে গ্রেফতার করা হতো না। আমি বলতে চাই এ দেশের মাটি ছাড়া আমার ও আমার পরিবারের কোন ঠিকানা নেই। এই দেশ আমার ঠিকানা। এই দেশেই আমি মরব।

আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা ও ভিত্তিহীন অভিযোগ এনে এ মামলা করা হয়েছে। এই মামলা ষড়যন্ত্রের মামলা। বিএনপি পাঁচবার এ দেশের রাষ্ট্রক্ষমতায় ছিল।

---

৬৯. মুহাম্মদ ইয়াহইয়া আখতার, অভিনব সরকার ব্যতিক্রমি নির্বাচন, পরিশিষ্ট-২১, পৃষ্ঠা-৪১২।

www.pathagar.com

বাংলাদেশের উন্নয়ন আর কল্যাণে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান, আমার ও বিএনপির গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। এ দেশের জন্য আমরা নিবেদিতভাবে কাজ করেছি। আমার, আমার পরিবারের বা আমার ছেলেদের অর্থের কোন লোভ নেই, অর্থের কোন প্রয়োজন নেই। এ দেশের জনগণের ভালবাসা ও সমর্থন আমরা সব সময় পেয়েছি ও পাচ্ছি। এটাই আমাদের সবচেয়ে বড় পাওয়া। আমরা সব সময় দেশপ্রেমের পরিচয় দিয়েছি। আমার প্রিয় দেশেবাসীকে বিনীতভাবে জানাতে চাই, আমি এবং আমার পরিবার সম্পূর্ণভাবে নির্দোষ। মহামান্য আদালতকে সবিনয়ে জানাতে চাই, আমরা সম্পূর্ণ নির্দোষ। তাই এই মামলা থেকে সুবিচার চাই। শুধু আমি নই, যে কোন নেতা নেত্রীর বিরুদ্ধেই মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করা হোক।....."[৭০]

শুনানী শেষে আদালত বেগম খালেদা জিয়ার জামিন নামঞ্জুর করে সংসদ ভবন এলাকায় একটি বিশেষ সাবজেলে তাঁকে প্রেরণ করে। আর তাঁর পুত্র আরাফাত রহমানের সাত দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করে।

"শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে এ সরকারের আমলে দায়েরকৃত কতিপয় চাঁদাবাজি মামলাসহ যেসব মামলা ছিল সেগুলো হলো ঃ ২০০৭-এর ডিসেম্বর ব্যবসায়ী আজম জে চৌধুরীর দায়ের করা চাঁদাবাজির মামলা, নাইকো দুর্নীতি মামলা, ফ্রিগেট ক্রয়ে দুর্নীতির মামলা, বেপজায় পরামর্শক নিয়োগে দুর্নীতির মামলা, মেঘনাঘাট বিদ্যুৎ কেন্দ্র দুর্নীতির মামলা, ব্যবসায়ী তাজুল ইসলাম ফারুক ও নূর আলীর দায়ের করা দুটি পৃথক চাঁদাবাজির মামলা। এ ছাড়া তাঁর বিরুদ্ধে ছিল বার্জ মাউন্টেড বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপনে দুর্নীতির মামলা এবং মিগ-২৯ যুদ্ধবিমান ক্রয়ে দুর্নীতির মামলা।

অন্যদিকে খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত এ সরকারের আমলে যেসব মামলা হয় সেইগুলো হলো ঃ নাইকো দুর্নীতি মামলা, গ্যাটকো দুর্নীতি মামলা, বড় পুকুরিয়া কয়লা খনিতে ঠিকাদার নিয়োগে দুর্নীতি মামলা এবং জিয়া অরফানেজ ট্রাস্টের অর্থ আত্মসাৎ মামলা।

এইসব মামলা সাধারণ আইনে হলে দুই নেত্রীই আইনি প্রক্রিয়ায় জামিন পেতেন। কিন্তু মামলাগুলো জরুরী বিধিতে হওয়ায় এবং দুই নেত্রী বিশেষ কারাগারে আটক থাকায় এসব মামলা ভিন্ন মাত্রা পেয়ে দুই নেত্রীর মুক্তি প্রক্রিয়া বিলম্বিত হয়।"[৭১]

---

৭০. মুহাম্মদ ইয়াহইয়া আখতার, অভিনব সরকার ব্যতিক্রমি নির্বাচন, পরিশিষ্ট-২৩, পৃষ্ঠা-৪১৪।

৭১. মুহাম্মদ ইয়াহইয়া আখতার, অভিনব সরকার ব্যতিক্রমি নির্বাচন, পৃষ্ঠা-১৭৪।

www.pathagar.com

রাজনীতিবিদ গ্রেফতার অভিযান

'জরুরী অবস্থা ঘোষণার পর দেশের জাতীয় রাজনীতিতে শুরু হয় সিডরের মতো ঘূর্ণিঝড়। সন্দেহভাজন দুর্নীতিবাজ হিসেবে জাতীয় রাজনীতির মূলস্রোতের রাজনীতিবিদরা পাইকারী হারে গ্রেফতার হতে থাকেন। ২০০৭ সালে মাত্র এক বছরে দুই সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনা, বিএনপি-র সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব তারেক রহমান ও আরাফাত রহমান কোকোসহ ৭৯ জন প্রভাবশালী রাজনীতিক গ্রেফতার হন। এছাড়া দুর্নীতি দমন কমিশনের পক্ষ থেকে ১৪১ জন সাবেক মন্ত্রী ও এমপির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়।

[উল্লেখ্য, তারেক রহমান গ্রেফতার হন ২০০৭ সনের ৭ই মার্চ রাত ১টা ১০মিনিটে।]

গ্রেফতার অভিযান শুরুর আগে ৪২০ জনের নামের একটি তালিকা প্রস্তুত করা হয়। প্রথম কিস্তিতে ৫০ জন সন্দেহভাজন ব্যক্তির নামের তালিকা প্রকাশ করা হয়। তাদের মধ্যে বিএনপি-র সাবেক এমপি ও মন্ত্রীর সংখ্যা ছিল ২৬ জন, আওয়ামী লীগের ১৮ জন, ইসলামী ঐক্যজোটের একজন এবং জামায়াতে ইসলামীর দুইজন।

জামায়াতে ইসলামীর সাবেক এমপি শাহজাহান চৌধুরী এবং সাবেক এমপি আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ তাহেরের নামও ছিল এই তালিকায়।..... দ্বিতীয় তালিকায় জামায়াতে ইসলামীর সাবেক এমপি গাজী নজরুল ইসলামের নাম ছিল।'[৭২]

২০০৮ সনে জামায়াতে ইসলামীর গণস্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযান

অসাংবিধানিক কেয়ারটেকার সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার কিছুকাল পরই রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিতে শুরু করে। বিপুল

---

৭২. সাহাদত হোসেন খান, কেন এলো জরুরি অবস্থা, পৃষ্ঠা ১৪১, ১৪২, ১৪৩।

www.pathagar.com

সংখ্যক রাজনৈতিক নেতার বিরুদ্ধে দুর্নীতির মামলা দায়ের হতে থাকে। শীর্ষ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করা হয়।

রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করার পাশাপাশি বড়ো বড়ো দলগুলো থেকে কিছু 'সংস্কারবাদী' নেতা আবিষ্কার করে দল ভাংগার প্রচেষ্টা শুরু হয়। সাবেক দুই প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনাও গ্রেফতার হন। বড়ো দুই দলের নেতা গ্রেফতার করা হলো, কিন্তু জামায়াতে ইসলামীর নেতাকে গ্রেফতার করা হলো না, তাতো হতে পারে না। সেই জন্য ২০০৮ সনের ১৮ই মে গ্যাটকো মামলায় আমীরে জামায়াত মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীকেও গ্রেফতার করা হয়।

জামায়াতে ইসলামী অসাংবিধানিক কেয়ারটেকার সরকারের ইখতিয়ার বহির্ভূত এই সব কার্যক্রমের বিরুদ্ধে জনমতের প্রতিফলন ঘটাবার জন্য ২০০৮ সনের ১লা জুন থেকে ১৫ জুন পর্যন্ত গণস্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযান পরিচালনা করে।

নিম্নোক্ত দাবিগুলোর পক্ষে গণমানুষের স্বাক্ষর সংগ্রহ করা হয় ঃ

(১) অবিলম্বে জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার,

(২) জামায়াতে ইসলামীর আমীর ও সাবেক মন্ত্রী মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী এবং চারদলীয় জোটনেত্রী ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াসহ সকল রাজবন্দির নিঃশর্ত মুক্তি,

(৩) রাজনৈতিক হয়রানিমূলক গ্যাটকো ও বড় পুকুরিয়া মামলাসহ সকল মিথ্যা মামলা অবিলম্বে প্রত্যাহার,

(৪) ২০০৮ এর অকটোবরে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং

(৫) চাল, ডাল, আটা, ভোজ্য তৈল ইত্যাদি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য জনগণের ক্রয় সীমার মধ্যে নিয়ে আসার জন্য সর্বোচ্চ ভর্তুকি প্রদান।

এইসব দাবির প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করে ১ কোটি ৪৯ লক্ষ ৮৪ হাজার ৯শত ৯৪ জন স্বাক্ষর করেন।

২০০৮ সনের ১লা জুলাই প্রায় দেড় কোটি মানুষের স্বাক্ষর সম্বলিত বিশাল বিশাল বান্ডিলগুলো ট্রাকে বোঝাই করে সেক্রেটারি জেনারেল আলী

www.pathagar.com

আহসান মুহাম্মাদ মুজাহিদ তেজগাঁও কার্যালয়ে প্রধান উপদেষ্টার সমীপে পেশ করেন। সমবেত সাংবাদিকদের সম্মুখে তিনি বলেন,

"জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ এই দেশের সর্ব বৃহৎ ইসলামী দল। জামায়াতে ইসলামী একদিকে ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠার কাজ করছে, অন্যদিকে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ এই দেশের তৃতীয় বৃহত্তম দল। ২০০১ সনের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জয় লাভ করার পর জামায়াতে ইসলামী চারদলীয় জোট সরকারের মন্ত্রীসভায় যোগদান করে এবং সংগঠনের আমীর মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী ও সেক্রেটারী জেনারেল আলী আহসান মুহাম্মাদ মুজাহিদ মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁরা পাঁচ বছর দক্ষতা, যোগ্যতা ও সততার সাথে মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করে এই দেশের ইতিহাসে একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ-এর আমীর ও সাবেক মন্ত্রী মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীকে মিথ্যা মামলায় গ্রেফতার করে কারারুদ্ধ করা হয়েছে। এটি তাঁর ওপর এক বড়ো ধরনের যুলম। জামায়াতে ইসলামীর নেতা কর্মীরা তো বটেই, দেশের জনগণও এই জন্য বিক্ষুব্ধ। তারা কিছুতেই এই যুলম-নির্যাতন মেনে নিতে পারছে না।"

"আইনানুগ নিয়মতান্ত্রিক দল জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে আমরা এই ব্যাপারে জনগণের দ্বারস্থ হয়েছি। দেশ, জাতি ও গণতন্ত্রের স্বার্থে আমরা জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে জাতির সামনে ৫-দফা দাবি পেশ করেছি।"

"আমরা ১লা জুন থেকে ১৫ই জুন পর্যন্ত ৫-দফা দাবির পক্ষে সারাদেশে গণ স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযান পরিচালনা করেছি। দেশের ১ কোটি ৪৯ লক্ষ ৮৪ হাজার ৯ শত ৯৪ জন লোক ৫-দফা দাবির সমর্থনে স্বাক্ষর প্রদান করেছেন। এ থেকে স্পষ্টভাবে বুঝা যাচ্ছে যে দেশের জনগণ ৫-দফা দাবির পক্ষে রয়েছেন। সাংবিধানিক, গণতান্ত্রিক ও গঠনমূলক রাজনীতির বিচারে এর মূল্য অত্যধিক। যেই কোন গণতন্ত্রমনা ব্যক্তি এটিকে গুরুত্ব না দিয়ে পারেন না। এই বিশ্বাস নিয়েই আমরা আজ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার সমীপে আমাদের সংগৃহীত গণস্বাক্ষরগুলো পেশ করলাম।"

আমরা আশা করি সরকার জনমতের প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শন করবেন এবং জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে উত্থাপিত ৫-দফা গণদাবি মেনে নেবেন।"

উপরে উল্লেখিত দাবিগুলোর প্রতি প্রায় দেড় কোটি মানুষের সমর্থন জ্ঞাপন নিশ্চয়ই একটি বড়ো বিষয় ছিলো।

উপদেষ্টা পরিষদের চিন্তাধারা পরিবর্তনে বিষয়টি নিশ্চয়ই প্রভাব বিস্তার করে থাকবে।

www.pathagar.com

অভিযুক্ত রাজনীতিবিদগণ আইনী লড়াই শুরু করেন

২০০৮ সনে আটককৃত রাজনীবিদগণ একের পর এক জামিনে মুক্ত হতে থাকেন।

ফলে দুই নেত্রীর মুক্তির দাবিও জোরদার হতে থাকে।

'শেখ হাসিনার কানের চিকিৎসা দেশে সম্ভব নয় বলে ডাক্তারদের অভিমত তাঁর মুক্তির দাবি অধিকতর জোরালো করে। ২০০৮ সনের ১১ই জুন সরকার নির্বাহী আদেশে শেখ হাসিনাকে আট সপ্তাহের জন্য প্যারোলে মুক্তি দিয়ে চিকিৎসার জন্য আমেরিকা যাওয়ার অনুমতি দেয়। কারোই বুঝতে অসুবিধা হয়নি যে শেখ হাসিনার সংগে সরকারের একটি অঘোষিত সমঝোতা হয়েছে।'

'একই সময় বেগম খালেদা জিয়াকেও মুক্তি দেওয়া হবে বলা হলেও প্রাই দুই মাস সময় চলে যায়। বেগম খালেদা জিয়া দেশের বাইরে যেতে বা আগামী পাঁচ বছর রাজনীতি না করতে রাজি না হওয়ায় এবং তারেক রহমান আগামী পাঁচ বছর নির্বাচনে দাঁড়াতে পারবেন না বা রাজনীতি করতে পারবেন না– এমন শর্তে রাজি না হওয়ায় সরকার এদের মুক্ত করতে রাজি হয়নি।'[৭৩]

বেগম খালেদা জিয়ার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেতে থাকে। তদুপরি বাংলাদেশ জাতীয়তাবদী দল তাঁর ও তারেক রহমানের মুক্তির দাবিতে আন্দোলনে নামার সিদ্ধান্ত নেয়।

তদুপরি শেখ হাসিনাকে মুক্তি দেওয়ার পর সরকারের পক্ষে বেগম খালেদা জিয়া ও তারেক রহমানের ব্যাপারে হার্ডলাইনে থাকা অসম্ভব হয়ে ওঠে।

এমতাবস্থায় ২০০৮ সনের ৩রা সেপ্টেম্বর তারেক রহমান এবং ১১ই সেপ্টেম্বর বেগম খালেদা জিয়া সব মামলায় জামিন পেয়ে জেল থেকে মুক্তি লাভ করেন।

উল্লেখ্য, আমীরে জামায়াত মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী ২০০৮ সনের ১৫ই জুলাই জামিনে মুক্তি লাভ করেন।

---

৭৩. মুহাম্মদ ইয়াহইয়া আখতার, অভিনব সরকার ব্যতিক্রমি নির্বাচন, পৃষ্ঠা-১৭৪, ১৭৫।

www.pathagar.com

রাজনৈতিক দল সংস্কার প্রয়াস

অসাংবিধানিক কেয়ারটেকার সরকারের একটি অনাকাঙ্ক্ষিত কাজ ছিলো, রাজনৈতিক দলের গঠনতন্ত্র সংস্কারের ধুয়া তুলে দুইটি প্রধান দলকে রক্ষণশীল ও সংস্কারপন্থী হিসেবে বিভক্ত করার চেষ্টা। আওয়ামী লীগ এবং বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের সিনিয়ার নেতাদের মধ্যে কিছু সংস্কারপন্থী নেতা পাওয়া গেলো। কিন্তু সরকার শেখ হাসিনাকে গ্রেফতার করার পর আওয়ামী লীগের সংস্কারপন্থী নেতারা বেশি দূর এগুতে পারেননি। সরকার ও নবগঠিত নির্বাচন কমিশন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের সংস্কারপন্থীদেরকে সহযোগিতা প্রদান করে আসল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলটিকে মাইনাস করার প্রয়াস চালায়। কারাগারে অবস্থানরত বেগম খালেদা জিয়ার দৃঢ়তা এবং তাঁর প্রতি মাঠকর্মীদের আনুগত্য সংস্কারপন্থীদেরকে কোণঠাসা করে ফেলে। বেগম খালেদা জিয়া কারাগার থেকে বেরিয়ে আসার পর সংস্কারপন্থী নেতৃবৃন্দ তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করেন।

এইভাবে সরকারের অনাকাঙ্ক্ষিত প্রয়াসটি ব্যর্থ হয়ে যায়।

উল্লেখ্য, রাজনৈতিক দলগুলোর সংস্কারের কথা ওঠলে জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারী জেনারেল আলী আহসান মুহাম্মাদ মুজাহিদ বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেন, যেইসব বিষয়ে সংস্কারের কথা বলা হচ্ছে সূচনালগ্ন থেকেই জামায়াতে ইসলামীতে সেইগুলো প্রচলিত রয়েছে।

জামায়াতে ইসলামীর নিবন্ধন ঠেকাবার অপপ্রয়াস

২০০৭ সনের ৮ই সেপ্টেম্বর থেকে শুধু রাজধানীতে সীমিত আকারে ঘরোয়া রাজনীতির অনুমতি দেয় সরকার। নির্বাচন কমিশন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সাথে নির্বাচন আইন সংস্কার বিষয়ে সংলাপ করার সিদ্ধান্ত নেয়।

স্বাধীনতার পর থেকে এই পর্যন্ত অনুষ্ঠিত আটটি সংসদ নির্বাচনে অন্তত একটি আসন পেয়েছে কিংবা যেই কোন একটি নির্বাচনে অন্তত পক্ষে শতকরা দুই ভাগ ভোট পেয়েছে এমন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে নির্বাচন কমিশন আলোচনার সিদ্ধান্ত নেয়। প্রথম পর্বে ডাক পায় ইসলামী ঐক্যজোট, কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ, গণতন্ত্রী পার্টি, জাতীয় পার্টি (মঞ্জু),

www.pathagar.com

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (ইনু), জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (রব), জামায়াতে ইসলামী, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মোজাফফর), বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টি, বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি (নাজিউর), বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল, বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি এবং বাংলাদেশ সাম্যবাদী দল।

জামায়াতে ইসলামীর সাথে নির্বাচন কমিশনের বৈঠক হয় তিনবার। প্রথম দফা আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় ২০০৭ সনের ২৫শে অকটোবর। সেক্রেটারী জেনারেল আলী আহসান মুহাম্মাদ মুজাহিদের নেতৃত্বে দশ সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধি দল এই আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে একটি লিখিত বক্তব্য পেশ করা হয়। বক্তব্যে বলা হয়, বাংলাদেশের জনগণের প্রায় ৯০ ভাগ মুসলিম। গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে এই দেশের রাজনীতিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের বিশ্বাস ও চিন্তাচেতনার প্রতিফলন ঘটবেই। এই ব্যাপারে কারো আপত্তি থাকা উচিত নয়। বক্তব্যে আরো বলা হয়, ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। এতে নামায, রোযা, যাকাতের মতো ইসলামী রাজনীতি ও ইসলামী অর্থনীতি প্রতিপালন করাও মুসলিমদের কর্তব্য। রাজনৈতিক দলগুলোর নিবন্ধনের ব্যাপারে জামায়াতে ইসলামী উদার নীতি অনুসরণের সুপারিশ করে। যারাই আবেদন করবে তাদেরকে শর্তাবলি পূরণের জন্য আরো এক বছর সময় দেওয়া প্রয়োজন বলে অভিমত ব্যক্ত করে। উপজিলা পরিষদ নির্বাচন জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পরেই হওয়া উচিত বলে মত প্রকাশ করে। ইত্যাদি।

জামায়াতে ইসলামীর সাথে নির্বাচন কমিশনের দ্বিতীয় দফা আলোচনা হয় ২০০৮ সনের ২৬শে ফেব্রুয়ারি। এক দশমাংশের কম ভোট পাওয়া বিভিন্ন বাম দলকে ডাকা হলেও বেশ কয়েকটি ইসলামী দলকে সংলাপে না ডাকা সঠিক কাজ নয় বলে জামায়াতে ইসলামী অভিমত ব্যক্ত করে। কোন রাজনৈতিক দলে 'ধর্ম-বর্ণ ও লিঙ্গভেদে বৈষম্য' থাকলে তা নিবন্ধনের জন্য অযোগ্য হবে বলে প্রস্তাবনা বাদ দেওয়ার জন্য বলা হয়।

www.pathagar.com

জামায়াতে ইসলামীর সাথে নির্বাচন কমিশনের তৃতীয় দফা আলোচনা হয় ২০০৮ সনের ২০শে সেপ্টেম্বর। জামায়াতে ইসলামীর ডেলিগেশন বলে যে, আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে যেই সময় আছে এই সময়ের মধ্যে নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করা সম্ভব নয়। ডেলিগেশন সংশোধিত গণপ্রতিধিত্ব অধ্যাদেশ প্রত্যাহার, সর্বাগ্রে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণ স্থগিত রেখে পুরনো এলাকা ভিত্তিক নির্বাচনের দাবি জানায়।

নির্বাচন কমিশনের সাথে সংলাপকালে কয়েকটি বাম দল বাংলাদেশের স্বাধীনতাবিরোধী অবস্থানের অভিযোগ তুলে জামায়াতে ইসলামীকে নিবন্ধিত না করার সুপারিশ পেশ করে।

জামায়াতে ইসলামীর সাথে সংলাপের পরে ৪ঠা নবেম্বর থেকে আওয়ামী লীগের সাথে নির্বাচন কমিশনের আলোচনা শুরু হয়। আওয়ামী লীগ 'ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করার' এবং তথাকথিত 'যুদ্ধাপরাধী ও কলাবোরেটারদেরকে নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার' সুযোগ দানের বিপক্ষে মত প্রকাশ করে।

এটি ছিলো কৌশলে জামায়াতে ইসলামীকে কার্যত একটি বেআইনী দলে পরিণত করার অপপ্রয়াস।

বাম দলগুলো এবং আওয়ামী লীগ নির্বাচন কমিশনের মাধ্যমে জামায়াতে ইসলামীকে নিবন্ধনের বাইরে রেখে রাজনৈতিক ময়দান থেকে আউট করার অপপ্রয়াস চালায়। নিবন্ধন লাভের প্রয়োজনে জামায়াতে ইসলামী এই সময় মূল ভাবধারা ও বক্তব্য অক্ষুণ্ন রেখে গঠনতন্ত্রে বেশ কয়েকটি সংশোধনী আনতে বাধ্য হয়। এই সময়টিতেই 'জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ' নাম পরিবর্তন করে 'বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী' রাখা হয়।

নির্বাচন কমিশন জামায়াতে ইসলামীকে নিবন্ধিত না করার কোন যুক্তিসংগত কারণ খুঁজে পায়নি।

ইসলামবিদ্বেষী দলগুলোর অপপ্রয়াস ব্যর্থ হয়ে যায়। জামায়াতে ইসলামী

www.pathagar.com

একটি নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।
২০০৮ সনের ৪ঠা নবেম্বর বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী একটি নিবন্ধিত দল হিসেবে সার্টিফিকেট লাভ করে। এর নিবন্ধন নাম্বার-০১৪।

প্রশ্নবিদ্ধ নির্বাচন কমিশন

এটা প্রত্যাশিত যে নির্বাচন কমিশন হবে সম্পূর্ণরূপে একটি নিরপেক্ষ ইনস্টিটিউশন। প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারগণ তাঁদের কর্মকাণ্ডে সম্পূর্ণরূপে দলনিরপেক্ষ হবেন। সকল রাজনৈতিক দলের সাথে তাঁরা একই রূপ আচরণ করবেন।
কিন্তু নির্বাচনি আইন সংস্কার বিষয়ে সংলাপ করতে গিয়ে নির্বাচন কমিশন নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে ব্যর্থ হয়। আওয়ামী লীগের সাথে সংলাপে এই দলটির প্রতি নির্বাচন কমিশনের দুর্বলতা প্রকাশ পায়। সংলাপ উদ্বোধনকালে প্রধান নির্বাচন কমিশনার আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দকে সম্বোধন করে বলেন, "আজকের কেয়ারটেকার সরকার ও বর্তমান নির্বাচন কমিশন আপনাদেরই আন্দোলনের ফসল। আপনারা স্বাধীনতা আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন, বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করেছেন আপনারা। আওয়ামী লীগ কেবল একটি রাজনৈতিক দল নয়, এ দেশের উন্নয়ন এবং সংহতি অনেকাংশে আপনাদের ওপর স্থাপিত হয়েছে।"[৭৪]
২০০৭ সনের ২৮শে অকটোবর ডিসিদের সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণে প্রধান নির্বাচন কমিশনার ড. এ.টি. এম. শামসুল হুদা বলেন, তিনি জাতিকে ১৯৭০ সনের নির্বাচনের মতো একটি নির্বাচন উপহার দিতে চান। কারোই বুঝতে অসুবিধা হলো না যে তিনি আওয়ামী লীগকে ক্ষমতাসীন করার চিন্তাভাবনা করছেন। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থেকে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের বিরুদ্ধে বক্তব্য আসতে থাকে। জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল আলী আহসান মুহাম্মাদ মুজাহিদ প্রধান নির্বাচন

৭৪. মুহাম্মদ ইয়াহইয়া আখতার, অভিনব সরকার ব্যতিক্রমি নির্বাচন, পৃষ্ঠা-২৩৪।

www.pathagar.com

কমিশনার আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় বসানোর জন্য কাজ করছেন বলে অভিযোগ করেন।

২০০৮ সনের ২৯শে ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ

অসাংবিধানিক কেয়াটেকার সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলটিকে দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। ফলে এই সরকারের সাথে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের বিরাট মনস্তাত্বিক ফারাক সৃষ্টি হয়। পক্ষান্তরে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা এই সরকারকে তাঁর 'আন্দোলনের ফসল' ঘোষণা করে মনস্তাত্বিকভাবে এই সরকারকে কাছে টেনে নেওয়ার কৌশল অবলম্বন করেন। অসাংবিধানিক কেয়ারটেকার সরকারের একটি দুশিন্তার কারণ ছিলো, এই সরকার এখতিয়ার বহির্ভূতভাবে যেইসব কাজ করেছে সেইগুলো পরবর্তী নির্বাচিত সরকার অনুমোদন দেবে কিনা। আওয়ামী লীগ সভানেত্রী আমেরিকা যাওয়ার প্রাক্কালে ঘোষণা করলেন, তাঁর দল ক্ষমতায় এলে এই সরকারের যাবতীয় কর্মকাণ্ড অনুমোদন করবে। এতে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসুক, এটি চাওয়াই অসাংবিধানিক কেয়ারটেকার সরকারের পক্ষে স্বাভাবিক ছিলো।

নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ঊনচল্লিশ দিন পূর্বে আমেরিকার বিখ্যাত জার্নাল "হার্ভার্ড ইন্টারন্যাশনাল রিভিউ"-তে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার পুত্র সজীব ওয়াজেদ জয় এবং এক সময় ইরাকে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনকারী মার্কিন মিলিটারি অফিসার কার্ল সিওভাককো-র "Stemming the Rise of Islamic Extremism in Bangladesh" শীর্ষক একটি তাৎপর্যপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

প্রবন্ধের ভূমিকায় বলা হয়,

> "Bangladesh has been a secular Muslim state since its independence from Pakistan and founding by Shaikh Mujibur Rahman in 1971. While its short history has been full of military coup d'etats, it has always returned

www.pathagar.com

to its roots as a secular democratic state. There are however, new signs of a shift towards a growing Islamism that could jeopardize the sanctity of secularism in the country. While the governing construct's legitimacy is suffering politically from the past two years of emergency military rule, Islamism may be the biggest threat to the country's constitution and secular underpinnings. As elections are scheduled for December 18th and the major two political parties jostle over the country's future, each party's vision for the proper mix of Islam and government will be at forefront. Rahman's Awami League has long been the standard bearer of secularism and if elected it could roll back the growing tide of Islamism in Bangladesh. The Awami League must, however, implement certain changes to pro-actively check this Islamism if it hopes to secure long lasting secularism and democracy. If successful, an Awami League-led Bangladesh could be the global example of secular governance in a Muslim country."[৭৫]

অর্থাৎ '১৯৭১ সন হতে পাকিস্তান থেকে স্বাধীনতা প্রাপ্ত ও শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ একটি ধর্মনিরপেক্ষ মুসলিম রাষ্ট্রই ছিলো। এর সংক্ষিপ্ত ইতিহাসে বারবার সামরিক অভ্যুত্থান হলেও সবসময়ই একটি ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে এর মূল অবস্থায় ফিরে এসেছে। অবশ্য ইসলামী মতবাদের দিকে ঝুঁকে যাওয়ার নতুন ঝামেলার আলামত দেখা যাচ্ছে, যা দেশটিতে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের পবিত্রতাকে বিপদগ্রস্ত করতে পারে। যদিও গত দুই বছরের সামরিক শাসন ও জরুরী অবস্থার দরুন দেশটির শাসন কাঠামোর বৈধতা রাজনৈতিকভাবে বিপন্ন, ইসলামী মতবাদ দেশটির শাসনতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষ ভিত্তির জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি হয়ে দাঁড়াতে পারে। যেহেতু ডিসেম্বরের ১৮ তারিখ নির্বাচনের জন্য ধার্য হয়েছে, দেশের ভবিষ্যত সম্পর্কে দুই প্রধান দলের ধাক্কাধাক্কি ইসলাম ও সরকারের সংমিশ্রণের বিষয়টি প্রত্যেক দলের দৃষ্টিভংগিতে প্রাধান্য পাবে। রহমানের

৭৫. হার্ভার্ড ইন্টারন্যাশনাল রিভিউ, ১৯শে নবেম্বর, ২০০৮।

www.pathagar.com

আওয়ামী লীগ দীর্ঘকাল থেকে ধর্মনিরপেক্ষতার পতাকাবাহী। বিজয়ী হলে দলটি বাংলাদেশে ইসলামী মতবাদের অগ্রসরমান স্রোতকে ঠেকাতে পারবে। যদি আওয়ামী লীগ দীর্ঘস্থায়ী ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও গণতন্ত্র নিশ্চিত করতে চায় তাহলে এটিকে অবশ্যই এমন কিছু পরিবর্তন আনতে হবে, যাতে ইসলামকে কার্যকরভাবে প্রতিহত করা যায়। যদি এতে দলটি সফল হয় তাহলে আওয়ামী লীগ মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর জন্য পৃথিবীব্যাপী ধর্মনিরপেক্ষ শাসনের আদর্শ নমুনা হতে পারে।'

প্রবন্ধের ভূমিকায় যেই মেসেজ দেওয়া হয়েছে তা হচ্ছে আওয়ামী লীগ ধর্মনিরপেক্ষতার পতাকাবাহী একটি দল এবং বিজয়ী হলে দলটি বাংলাদেশে ইসলামী মতবাদের অগ্রসরমান স্রোতকে ঠেকাতে পারবে।

এই মেসেজ প্রদানের মাধ্যমে প্রবন্ধকারদ্বয় মূলত বাংলাদেশে অগ্রসরমান ইসলামী স্রোতকে ঠেকাবার জন্য সারা দুনিয়ার ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী ব্যক্তি, সংস্থা ও সরকারগুলোর সমর্থন ও সহযোগিতা কামনা করেছেন।

"বাংলাদেশ নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন আসন্ন হলে এ নির্বাচনের ওপর বিদেশীদের নগ্ন প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এ দেশের নির্বাচন সম্বন্ধে বিদেশী কূটনীতিক, মন্ত্রী এবং রাজনীতিকরা যেভাবে মন্তব্য করা শুরু করেন, সরকার কোন রকম সহায়তা না চাওয়া সত্ত্বেও তারা নির্বাচনে কারিগরি সহায়তা দিতে যেভাবে মরিয়া হয়ে ওঠেন এবং যেভাবে তারা এ নির্বাচন প্রক্রিয়ায় নিজেদেরকে জড়িত করতে চান তাতে মনে হয় যে এ দেশের নির্বাচন নিয়ে বিদেশিদের আগ্রহ বাংলাদেশিদের চেয়ে অনেক বেশি।"[৭৬]

এই প্রেক্ষাপটেই অনুষ্ঠিত হয় নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন।

২০০৮ সনের ১৭ই ডিসেম্বর জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার করা হয়।

২০০৮ সনের ২৯শে ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হয় নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন।

এই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ২৩০টি আসনে, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলী ৩০টি আসনে, জাতীয় পার্টি (এরশাদ) ২৭টি আসনে, জাসদ ৩টি আসনে, ওয়ার্কার্স পার্টি ২টি আসনে, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ২টি

৭৬. মুহাম্মদ ইয়াহইয়া আখতার, অভিনব সরকার ব্যতিক্রমি নির্বাচন, পৃষ্ঠা-২৭২।

www.pathagar.com

আসনে, বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি ১টি আসনে, লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি ১টি আসনে এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী ৪টি আসনে বিজয়ী হয়।

জামায়াতে ইসলামী থেকে নির্বাচিত দুইজন সংসদ সদস্য হচ্ছেন মাওলানা শামসুল ইসলাম (চট্টগ্রাম) এবং এ.এইচ.এম. হামিদুর রহমান আযাদ (কক্সবাজার)।

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে এটি জামায়াতে ইসলামীর ষষ্ঠ উপস্থিতি।

বলাই বাহুল্য, এই নির্বাচনে জনমতের সঠিক প্রতিফলন ঘটেনি।

> "নির্বাচনের ফলাফল হয় অপ্রত্যাশিত। নির্বাচনে মহাজোট বেশি আসন পাবে এমন ধারণা ভোটারদের মধ্যে লক্ষ্য করা গেলেও নির্বাচনি প্রচারে বেগম জিয়া ব্যাপক গণসাড়া জাগাবার পর নির্বাচনে তীব্র লড়াই হবে বলে সবাই ভাবেন। কোন জোটই সহজে একতরফাভাবে জিতবে এমনটা কেউ ধারণা করেননি। প্রাক-নির্বাচনি জরিপগুলোতে দুই প্রধান জোটের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতার তথ্য পরিবেশিত হলেও কোন জরিপের ফলাফলই প্রকৃত ফলাফলের কাছাকাছি যেতে পারেনি। ৮৭ শতাংশের বেশি ভোট পড়া এবং ৮৫টি আসনে ৯০ থেকে ৯৫.৪৩ শতাংশ ভোট পড়ায় নির্বাচন বিশ্লেষকদের মধ্যে সৃষ্টি হয় মিশ্র প্রতিক্রিয়া। একটি ভোট দিতে একজন ভোটারের যেখানে ২/৩ মিনিট সময় লাগার কথা, সেখানে প্রায় প্রতি মিনিটে একটি ভোট দেয়া সম্ভব কিনা সে প্রশ্ন উত্থাপন করে ভোট কারসাজির প্রতি ইঙ্গিত করেন কতিপয় নির্বাচন বিশ্লেষক। নির্বাচনি ফলাফলে বিএনপির ৮ শতাংশ ভোট কমে আওয়ামী লীগের ৮ শতাংশ বাড়লেও দু'দলের আসন প্রাপ্তির হ্রাসবৃদ্ধি (আওয়ামী লীগের ২৩০ আসনের বিপরীতে বিএনপি'র মাত্র ৩০ আসন) ছিল প্রায় অবিশাস্য।"[৭৭]

এই নির্বাচনের ফলাফল বিশ্লেষণ করে একজন বিদগ্ধ বিশ্লেষক বলেন,

> "গড় পড়তা ভোট দিতে সময় লেগেছে ৭০ সেকেন্ডের মতো। পাটিগণিতের হিসাব ভুল হতে পারে না। যুক্তিশীল মানুষের কাছে ভোট প্রদানের এই গড় সময়টি মোটেও বিশ্বাসযোগ্য হচ্ছে না। তাই বলা হচ্ছে, ভোটে বড় রকমের কারচুপি হয়েছে। একেবারেই ডিজিটাল কারচুপি।"[৭৮]

---

৭৭. মুহাম্মদ ইয়াহইয়া আখতার, অভিনব সরকার ব্যতিক্রমি নির্বাচন, পৃষ্ঠা-৩৭৪।

৭৮. ড. মাহবুবউল্লাহ, বাংলাদেশকে ব্যর্থ রাষ্ট্র করার রিহার্সাল, আমারদেশ, ১০ই জানুয়ারি, ২০০৯।

www.pathagar.com

এই নির্বাচনের ফলাফল বিশ্লেষণ করতে গিয়ে, প্রখ্যাত কলম সৈনিক মাহমুদুর রহমান বলেন,

> "....১৯৭৩ সালে একই প্রকৃতির একটি নির্বাচন প্রত্যক্ষ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে। সেই নির্বাচনে বিরোধীদলের যে ছিঁটেফোটা দু'একজন শত প্রতিকূলতার মধ্যেও নির্বাচিত হয়েছিলেন তাদের মধ্য থেকেও বাছাই করে নির্বাচনের বেসরকারি ফল ঘোষণার পরও বাদ দেয়া হয়েছিল। নির্বাচনে বিজয় লাভ করার পরও প্রশাসনিক নির্দেশে যাদের বাদ দেয়া হয়েছিল তাদের মধ্যে বরিশালের মরহুম মেজর জলিল, কুমিল্লার মরহুম রশীদ ইঞ্জিনিয়ার এবং টাংগাইলের মরহুম আলিম আর রাজির নাম মনে পড়ছে।"[৭৯]

নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের এই ফলকে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল 'দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রের বাস্তবায়ন' বলে অভিহিত করে।

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমীর মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী এই ফলকে "অবিশ্বাস্য" ও "বিস্ময়কর" বলে অভিহিত করেন এবং তদন্তের মাধ্যমে ৮০ থেকে ৯৫ শতাংশ ভোট পড়ার রহস্যটি উদঘাটন করার দাবি জানান।

———— ০ ————

৭৯. মাহমুদুর রহমান, ১/১১ থেকে ডিজিটাল, পৃষ্ঠা-২০১।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

রাজনীতিতে জামায়াতে ইসলামী

এ. কে. এম. নাজির আহমদ

দি ইন্ডিপেনডেন্ট স্টাডি ফোরাম
ঢাকা